মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ

ইরফান হাবিব • বিবেকানন্দ ঝা

মৌর্যযুগের ভারতবর্ষ
(MAURYAN INDIA)

ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস - ৪

মৌর্যযুগের ভারতবর্ষ

(MAURYAN INDIA)

ইরফান হাবিব

বিবেকানন্দ ঝা

ভাষান্তর

কাবেরী বসু

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

Bengali Translation of Mauryan India
Mouryayuger Bharatbarsha
written by : Irfan Habib/Vivekananda Jha

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৯

ISBN : 81-7626-190-4

প্রচ্ছদ
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১ এ পি সি রোড
(ফেডারেশন হল, তৃতীয় তল)
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

দাম : ৬৫ টাকা

টীকা

মুদ্রিত ক্রমতালিকার সাযুজ্য রক্ষায় 'ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস' এই গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড হিসাবে 'মৌর্যযুগের ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থমালা প্রকাশনার পরিকল্পনা অনুসারে এই গ্রন্থটি আদৌ 'চতুর্থ' নয়, কালের নিরিখে এর পূর্বে রয়েছে 'বৌদ্ধ যুগ' অবশ্য এই পর্বটি এখনো অপ্রকাশিত।

অতএব প্রকাশনার প্রকৃত ক্রমপর্যায় উপেক্ষা করে আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে পর্বগুলির নামাঙ্করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে কারণে 'বৌদ্ধ যুগ' প্রকাশিত হলে, সেই পর্বের ক্রমসংখ্যা হবে ৩(ক)।

সূচি

মুখবন্ধ

১ আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ১৩

১.১ আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সময়কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ ১৩
১.২ আলেকজান্ডারের আক্রমণ ১৭
১.৩ নন্দ-বংশ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উত্থান ২৫
১.৪ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্ব (খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৪ অব্দ ক্যা.) ২৮
১.৫ বিন্দুসার এবং অশোকের প্রথম পর্যায় (খ্রিস্টপূর্ব ২৬২ অব্দ c. পর্যন্ত) ৩৪
১.৬ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৩৮

নিষ্কর্ষ

১.১ নন্দবংশ এবং মৌর্যবংশ: পূরাণের অংশবিশেষ ৫৫
১.২ চন্দ্রগুপ্তের উত্থান : জাস্টিন ৫৬
১.৩ পাটলিপুত্রের পৌরশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের বিবরণ ৫৭
১.৪ অশোকের প্রস্তর অনুশাসন XIII ৫৭

টীকা

১.১ মৌর্য কালপঞ্জি ৫৯
১.২ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ৬২
১.৩ গ্রন্থপঞ্জি ৬৭

২ অশোক এবং তাঁর পরবর্তী সময়কালের মৌর্য সাম্রাজ্য ৭০

২.১ অশোকের শিলালিপি ৭০
২.২ অশোকের ধম্ম ৮০
২.৩ অশোকের রাজ্যশাসন ৮৯

২.৪ অশোকের উত্তরাধিকারীবৃন্দ এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ১০৪
২.৫ দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা ১১১

নিষ্কর্ষ

২.১ ধম্ম সূত্র-সংগ্রহ ১১৮
২.২ সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা ১১৯
২.৩ ধম্ম-মহামাত্য নিযুক্তি ১১৯
২.৪ ধর্মিয় সহাবস্থান ১২০
২.৫ অশোক এবং সরকারের আচরণবিধি ১২১
২.৬ শাসন, বিচার এবং শাস্তি ১২১
২.৭ কৃতির ঘোষণা ১২২

টীকা

২.১ উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞান ১২৪
২.২ গ্রন্থপঞ্জি ১৩০

৩ **অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতি** ১৩২

৩.১ অর্থনীতি ১৩২
৩.২ সমাজ ১৫৩
৩.৩ ধর্ম ১৬১
৩.৪ লেখন, ভাষাসমূহ, শিক্ষা সাহিত্য ১৭০
৩.৫ শিল্প এবং স্থাপত্য ১৮৪

নিষ্কর্ষ

৩.১ সপ্তবর্ণ ১৯৩
৩.২ জাত ধর্ম ১৯৫
৩.৩ বুদ্ধের জন্মস্থান তীর্থযাত্রা ১৯৬

টীকা

৩.১ অশোকের সময়কালের প্রাকৃতের বাচনভঙ্গি ১৯৬
৩.২ গ্রন্থপঞ্জি ১৯৯

সারণি, মানচিত্র ও চিত্র

সারণি

১.১ কালপঞ্জী ৫৪
২.১ ধম্ম-এর রীতি ৮৩
২.২ কালপঞ্জী ১১৭
২.৩ অশোকের ব্রাহ্মী লিপি ১২৮
৩.১ শস্য তালিকা, বপন ও কর্ষণের ঋতুপর্ব ১৩৭
৩.২ কালপঞ্জী ১৯৩

মানচিত্র

১.১ উত্তরপশ্চিম-ভারত খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ : আলোকজাণ্ডারের বিজয়-অভিযান ১৯
১.২ মৌর্য সাম্রাজ্য : খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দ (c) ৪০
২.১ মৌর্য সাম্রাজ্য : পূর্ব ৭৩
২.২ মৌর্য সাম্রাজ্য : উত্তর ৭৪
২.৩ মৌর্য সাম্রাজ্য : দক্ষিণ ৭৫
২.৪ মৌর্য সাম্রাজ্য : পশ্চিম ৭৬
২.৫ দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-১০০ (c) ১১৩
৩.১ অর্থনীতি ১৪৩
৩.২ বিবিধ ভাষা এবং অশোকের প্রাকৃত বাগধারাসমূহ ১৭৬

চিত্র

১.১ আলেকজাণ্ডারের পদক, ব্যাবিলন, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ (c) ২১
১.২ সোফিটেসের রৌপ্যমুদ্রা ৩১
১.৩ (ক) অশ্বপৃষ্ঠে রাজকুমার, উত্তর-তোরণ, ১নং স্তূপ, সাঁচী খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক। অশ্বের রেকাব ও জিনের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়
(খ) অশ্বের বল্লা, পশ্চিম-তোরণ ৪৩
৪ রথ, উত্তর-তোরণ, ১নং স্তূপ সাঁচী ৪৪

১.৫	সোহগৌরা তাম্রফলকে প্রদর্শিত শস্যাগার নীচে বয়ানের একটি বাক্য	৫৩
২.১	রুম্মিনদেই স্তম্ভ-লিপি (V. A. Smith)-এর অবিকল প্রতিরূপ: তৎসহ ভাষান্তরণ (E. Hultzsch)	৭৮
২.২	রামগ্রামের স্তূপে অশোকের আগমন : ১ নং স্তুপের দক্ষিণ-তোরণে অশোকবন্দনার কাহিনীটি রিলিফে পরিস্ফুট : সাঁচী, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক	৯১
৩.১	আত্রাঞ্জিখেরায় প্রাপ্ত লোহার কাস্তে, NBP পর্ব	১৩৪
৩.২	জলচক্রের অন্তিম রূপ, মান্দোর প্রাচীর-চিত্র, দ্বাদশ শতাব্দী	১৩৫
৩.৩	তক্ষশিলায় প্রাপ্ত লোহার যন্ত্রপাতি	১৪৫
৩.৪	ভূমি থেকে একটি দশচক্রযান অবধি দড়ি এবং কাছিগুটানোর যন্ত্রের সাহায্যে অশোকস্তম্ভটি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে	১৪৮
৩.৫	'৬ (খ) পংক্তিমালা'-র ছিদ্রযুক্ত মৌর্য মুদ্রা	১৫২
৩.৬	'মাতৃদেবীগণ' পোড়ামাটির মূর্তি, বীর স্তূপ, দ্বিতীয় স্তর, তক্ষশিলা	১৬৫
৩.৭	শিলালিপি, যোগীমারা গুহা, রামগড় পর্বত	১৭৪
৩.৮	অশোক-স্তম্ভ, লৌরিয়া নন্দনগড়	১৮৫
৩.৯	লোমশ ঋষি গুহা, বারাবার পর্বত	১৮৮
৩.১০	(ক) পাথর কেটে নির্মিত হাতি, ধৌলি (খ) প্রস্তরে উৎকীর্ণ হাতি, কলসি	১৮৯
৩.১১	সিংহ-শীর্ষ, সারনাথ	১৯০
৩.১২	যক্ষী, দিদারগঞ্জ, পাটনা, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক	১৯১
৩.১৩	পোড়ামাটির ফলকে যুগল মূর্তি এবং মূর্তিটি ঢালাই করার ছাঁচ, বীর স্তূপ, দ্বিতীয় স্তর, তক্ষশিলা	১৯২

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থটি 'ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস' এই গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড। এই গ্রন্থমালার প্রকাশিত তিনটি খণ্ডে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যে বিশিষ্ট রচনাশৈলী এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছিল, বর্তমান খণ্ডেও আমরা সেই ধারা অনুসরণের চেষ্টা করেছি। অবশ্য কয়েকটি কারণে পূর্বসূরিদের তুলনায় বর্তমান খণ্ডটি যথেষ্ট দীর্ঘতর হয়েছে। বস্তুত, আমাদের বেশ কয়েকজন পাঠক এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, প্রকাশিত খণ্ডগুলি কখনো কখনো একটু বেশি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। সে কারণে এই পর্বে আর একটু সুবিধাজনক পন্থা অনুসরণের চেষ্টায় বিশ্লেষণাত্মক বিবৃতি যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে, এমনকি স্থানে স্থানে বিভিন্ন বিষয়ের কিছুটা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। গ্রন্থটি স্বভাবতই কলেবরে তুলনামূলকভাবে স্ফীত হয়েছে। তদুপরি, বিগত সার্ধ শত বছরে অধীত যে বিপুল তথ্যসম্ভারে আমরা সমৃদ্ধ, তাদের সংক্ষিপ্ত-করা সহজ কাজ নয়। এছাড়া নানান সূত্র থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিতে বেশ অনেকখানি পরিসর প্রয়োজন হয়েছে— এদের মধ্যেই রয়েছে অশোকের দশটি অনুশাসনের অনুবাদ— এরাও আয়তনে তেমন সংক্ষিপ্ত নয়। মানচিত্র এবং অন্যান্য চিত্রসমূহ এ গ্রন্থে উপস্থাপিত তথ্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক হয়ে উঠবে এই প্রত্যয়ী ভাবনায় এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মৌর্য কালপঞ্জী, আর্যশাস্ত্রের রচনাকাল, লিপি-পাঠ-বিজ্ঞান এবং অশোকের বাগধারা সম্পর্কে পৃথকভাবে টীকা রয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে যে, এই সমস্ত প্রাযুক্তিক অথবা বিতর্কিত বিষয় বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

'বৈদিক যুগ'-এর সাদৃশ্যে, এবারেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অনুসৃত বর্ণান্তকরণের ভঙ্গিটি কিছু পরিমাণে প্রচলিত পন্থাচ্যুত হয়েছে : 'c' এবং 'ch'-এর স্থলে এসেছে 'ch' এবং 'chh'; 'ś' এবং 'ṣ' স্থলে 'sh' এবং sh ;'ṛ'-এর পরিবর্তে 'ri'। অশোকের প্রাকৃত শব্দগুলিকে সংস্কৃতে পরিবর্তিত করার প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করা হয়নি। প্রাকৃত শব্দের রূপ যেহেতু বাগধারা অনুযায়ী ভিন্ন, সে কারণে, শিলালিপিতে আবিষ্কৃত অশোকের মগধী রূপটি সাধারণভাবে বাছাই করা হয়েছে; তবে 'ল' স্থলে এসেছে 'র'। অবশ্য সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত বা অন্যান্য বাগধারার যে সমস্ত শব্দরূপে এ জাতীয় পরিবর্তনের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতএব সুবিধার দাবী স্বীকার করেও যে এর বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে, এ বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

স্থানাভাবে, ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থ এবং সাময়িকীর বিশদ উল্লেখ সম্ভব না হলেও, প্রায়শই মূল পাঠের অধ্যায় তথা যুক্তির সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন মুদ্রিত পাঠ এবং অনুবাদে এই সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি সহজেই সনাক্ত করা যাবে। অশোকের অনুশাসনসমূহ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনে পাঠকের অসুবিধার উদ্রেক না করে প্রচলিত বিশিষ্টতায় উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য, গ্রন্থপঞ্জীতে বিশেষ কয়েকটি নির্বাচিত গ্রন্থ রয়েছে এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

শ্রী জহুর আলি খানের সঙ্গে একত্রে শ্রী ফয়েজ হাবিব সমস্ত মানচিত্র এঁকেছেন। আমাদের প্রয়োজনে মূল আলোকচিত্রকে শ্রী গৌতম মুজতবা পুনরায় লেন্সবন্দী করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম লৌরিয়া নন্দনগড়ের স্তম্ভটি। এই আলোকচিত্রটি আমাদের দিয়েছেন শ্রী শামিম আখতার। শ্রী পি. এন. সহায় প্রয়োজনীয় সূচিপত্রটি গ্রথিত করেছেন।

সমগ্র পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী মুনীরুদ্দিন খান। এ বাবদে শ্রী আরশাদ আলি সমস্ত লেখা-লেখির দেখাশোনা করেছেন। আর একাধারে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিন প্রতিলিপি ও 'বাহক-পরিষেবা'-র দায়িত্ব সামাল দিয়েছেন শ্রী ঈদ্রিস বেগ।

আলিগড়ের সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি এবং নতুন দিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, উভয় সংস্থার পাঠাগারের নিকটে আমরা প্রভূত পরিমাণে ঋণী। প্রয়োজনে যে কোন গ্রন্থ এবং সাময়িকী আমাদের ব্যবহারের অনুমতি দানে তাঁরা সদা তৎপর ছিলেন।

আলিগড় হিস্টোরিয়ান সোসাইটির সম্পাদক অধ্যাপিকা শিরীন মুসভির হাতে আমাদের পাণ্ডুলিপি, এমনকি তার একাংশও পৌঁছবামাত্রই তিনি দ্রুত পরবর্তী কাজ সমাধা করেছেন। তুলিকা বুকস্-এর শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং ইন্দিরা চন্দ্রশেখর— এঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং সহায়তায় অবিরত এই অনুভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি যে, তাঁদের চিন্তনে এই গ্রন্থমালা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ইরফান হাবিব

ডিসেম্বর ২০০৪ বিবেকানন্দ ঝা

১

আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

১.১ আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সময়কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ

আলেকজান্ডারের যুদ্ধাভিযানের অ্যাডমিরাল নিয়ারখুশ-এর একটি প্রতিবেদন ব্যতিরেকে, তাঁর ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং সে-সংক্রান্ত বিবিধ ঘটনাবলীর কোনো সমসাময়িক বিবরণই কালবিবর্তনে টিকে থাকেনি। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে (c.) গ্রিক ঐতিহাসিক আরিয়ান তাঁর Anabasis গ্রন্থে, আলেকজান্ডারের কর্মজীবনের ক্রমোন্নতির একটি বিশদ এবং সযত্ন বিবরণ সংকলিত করেন। এই বিজয়ী বীরের পার্ষদ এবং সভাসদগণের (প্রধানত টলেমি) রেখে-যাওয়া নানান লিখিত তথ্যের সাহায্যেই গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন এবং সেখানে এই তথ্যগুলি স্থানে স্থানে উদ্ধৃতও হয়েছে। আরিয়ানের অ্যানাবাশিস এবং ইন্ডিকা, যেখানে নিয়ারখুশের প্রতিবেদনটিও স্থান পেয়েছে, সে দু'টিতে অন্যান্য অনেক লেখক [যেমন, দিয়োদোরাস, খ্রিস্টপূর্ব ২১ (c.); স্ট্রাবো, ২৩ খ্রিস্টাব্দ (c.) এবং প্লুতার্ক, ১১৯ খ্রিস্টাব্দ (c.)] নানান বিষয় সংযোজনা করেছেন এবং কখনো কখনো সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সব নানাবিধ বিবরণ থেকে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে সিন্ধু উপত্যকা এবং তার সীমান্তপ্রদেশে বসবাসকারী মানুষজনের সংস্কৃতি এবং জীবনের তৎকালীন অবস্থার একটি চিত্র পুনরায় নির্মাণ করা যায়।

যদিও গ্রিক বিবরণে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রায়শই বর্বর অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে, তবু আক্রমণকারীরা যে কোনো অবস্থাতেই তাদের আদিম মানুষ ভাবত না সেটি অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রামে বসবাসকারী এইসব মানুষেরা অসংখ্য, উৎকৃষ্ট গবাদি পশুর সাহায্যে জমি কর্ষণ করত। কথিত আছে যে, সোয়াট উপত্যকায় আলেকজান্ডার এইরকম ২৩০,০০০ (!) ষাঁড় দখল করেছিলেন। এদের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট সেগুলিকে তিনি নিজ দেশ মাসেডোনিয়ার (গ্রিসের উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে) ভূমিতে কাজে লাগাবার জন্য সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ষাঁড়ের কুঁজ থাকায় (জেবু) সেগুলি সম্ভবত তাঁর দেশ মাসেডোনিয়ার ষাঁড়ের চেয়ে লাঙল টানার কাজে আরো দক্ষ হবে— এটাই প্রত্যাশিত। স্ট্রাবো (XV. ১.১৮) আমাদের বলছেন

যে, নিয়ারখুশ এবং অ্যারিস্টোবুলুস, যারা আলেকজান্ডারের সঙ্গে এদেশেও এসেছিলেন, উভয়েই লক্ষ্য করেছিলেন যে, সিন্ধু অববাহিকায় অধিকাংশ কৃষিই বন্যার ওপর নির্ভরশীল। অ্যারিস্টোবুলুস আরো লিখেছেন যে, সংলগ্ন নদীবক্ষে যেখানে জল জমে থাকে, তারই মধ্যে ধানের বীজ বপন করা হয়। আলেকজান্ডারের অনুগামী আরেকজন লেখক, ওনেসিক্রিটাস, গমের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ভারতবর্ষের এক অদ্ভুত শস্যকে 'bosmoran' নামে উল্লেখ করেছেন— এটি সম্ভবত বাজরা। নিয়ারখুশ যখন মধু উৎপাদনকারী নলখাগড়ার উল্লেখ করেন, তখন তিনি অবশ্যই আখের কথাই বলতে চান। তাঁর লেখা থেকে পুনরায় একটি বিবৃতি (স্ট্রাবো XV. ১.২০; আরিয়ান, Indica, XVI) উদ্ধৃত করা যায়— ভারতীয়রা বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত সুতোয় তাদের পরিচ্ছদ তৈরি করে; অতএব কার্পাস তখনও বর্ষজীবী উদ্ভিদ, বার্ষিক উদ্ভিদের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। হেরোডোটাসের কাল থেকে জনপ্রিয় সেই প্রাচীন ধারণা যে ভারতবর্ষে প্রচুর সোনা উৎপন্ন হয়, সেটিও তখন আর পুনরাবৃত্ত হয়নি। বিপরীতে, লবণাক্ত এলাকার খননকার্যে পাওয়া লবণ-শিলার উল্লেখ রয়েছে এবং সম্ভবত বাণিজ্যের মাধ্যমে এগুলিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর বিষয়টিও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির সমায়তনিক বিস্তারে কোনো নাগরিক অর্থনীতির বেঁচে-থাকার জন্য কৃষি এবং বাণিজ্য উভয়কেই যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হতে হয়। প্রায়শই নগরী এবং দুর্গনগরীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি বেশ সুপরিচিত, যেমন তক্ষশিলা— বিশিষ্ট এক নগরী। তক্ষশিলার বীর স্তূপের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে যে তথ্য প্রকাশিত হয় সেটি কার্বন-তারিখের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। এই নগরী খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের (c.) পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই স্থানের রৌপ্যদণ্ডে, পঞ্চ লাঞ্ছিত মুদ্রায় আকামেনিদীয় প্রভাবের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের পালিশ করা কালো রঙের সামগ্রীর অনুকরণে প্রস্তুত সে স্থানের সামগ্রীতে গাঙ্গেয় প্রভাবও চোখে পড়ে। পুরুকে পরাজিত করে আলেকজান্ডার চেনাবের তীর বরাবর পূর্বমুখে এগিয়ে চললেন এবং সাঁইত্রিশটি নগরী দখল করলেন। আরিয়ানের বর্ণনা অনুসারে সবচেয়ে ছোট নগরীর 'জনসংখ্যা ৫০০০-এর কম নয় এবং এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই অধিবাসীদের সংখ্যা এর দ্বিগুণ।'

বসতি এলাকায় সীমান্ত বরাবর, অরণ্যে এবং মরুভূমিতে, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়, নিঃসন্দেহে এমন কয়েকটি জনগোষ্ঠী ছিল যারা তখনও 'সংগ্রাহক' এবং সে কারণেই কিছুটা আদিম পর্যায়েই তাদের অবস্থান। নিয়ারখুশ এক অসাধারণ বিবরণীতে বেলুচিস্তানের সমুদ্র-তট বরাবর তাঁর অভিযানের কাহিনী আমাদের বলেন— ভারতবর্ষের আরবীয় জাতিগোষ্ঠী ছাড়াও সেখানে আরবিস (পোলারিস) নদীর সমতলভূমিতে তিনি সেইসব মানুষজনের দেখা পেয়েছিলেন, যাদের

জীবনপ্রবাহ তখন পর্যন্ত প্রস্তর যুগেই রয়ে গিয়েছিল (যেহেতু তাদেব লোহা ছিল না।)[৮] একটি মরসুমী খরস্রোতা, যার নাম— তোমেরোস (আধুনিক নাম হিঙ্গল) তারই মোহানায় মৎস্য শিকারই তাদের জীবিকা। যে কোনো বস্তু ছেঁড়া বা কাটার কাজে তাদের অস্ত্র হলো আঙুলের নখ এবং পাথর। একেবারে বিচ্ছিন্ন এক জনগোষ্ঠী, মূলত তারা 'Oritae', কিন্তু ভারতীয় না হলেও পোশাক পরিচ্ছদ আর ব্যবহৃত অস্ত্রও (খুব সম্ভবত লোহার) সেইরকম অর্থাৎ ভারতীয়।

সিন্ধু উপত্যকায়, বেশিরভাগ রাজ্যই অদ্ভুত এক উপজাতির শাসনাধীন ছিল। প্রায়শই রাজা কিংবা গোষ্ঠী প্রধান জাতির গোত্রনামই ব্যবহার করত। পুরু এবং আবরেসের ক্ষেত্রে (পুরু এবং অভিসর) যেমন ঘটেছিল। রাজপদ বংশানুক্রমিক হওয়ায় এইসব জাতি-গোষ্ঠীর প্রাচীন আত্মীয়তার বাঁধন ক্রমশ অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠছিল। পুরুদের ক্ষেত্রে তেমন ঘটলেও মাল্লোই (মল্ল)-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি অন্যরকম— সেখানে একের পর এক নানান গোষ্ঠী-প্রধানের নিয়োগে ক্ষমতার অংশীদার ছিল অনেক। এই সমগ্র অঞ্চলে প্রাচীন আকামেনিদীয় সার্বভৌম রাজত্বের কোনো চিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং মনে হয় তখনও পরিস্থিতি সেরকমই ছিল।

আলেকজান্ডারের আক্রমণের কোনো বিবরণেই সরাসরি বর্ণভেদের প্রশ্নটি স্পর্শ করা হয়নি। অবশ্য এমনও হতে পারে, যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা শাসক-গোত্রের মানুষজন এবং সে কারণেই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশালী ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; অবশ্য সর্বদাই যে তারা খুব পরিচিত ছিল এমন নয়। ব্রাহ্মণদের (ব্রাখমেন) বিষয়ে কিন্তু বেশ স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা ছিল 'ভারতবর্ষীয় দর্শনের শিক্ষক' এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার রাজপুত্রদের পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করত। সিন্ধ অঞ্চলে এমনই একটি দলকে আলেকজান্ডার ফাঁসি দিয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা স্থানীয় দুই শাসক মুশিকান এবং সম্বুকে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করেছিল।

এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে দাসত্বপ্রথা বহাল ছিল। সিন্ধ প্রদেশে মুশিকানদের এলাকায় ওনেসিক্রিটাস এটি লক্ষ করেছিলেন (স্ট্রাবো, XV ১.৫৪); এবং তক্ষশিলায় অ্যারিস্টোবুলুস দেখেছিলেন যে, দরিদ্র মানুষেরা তাদের কন্যাদের প্রকাশ্য স্থানে বিক্রয় করছে (স্ট্রাবো, XV. ১.৬২)।

বিধবাদের পুড়িয়ে মারার প্রাচীনতম প্রথার সাক্ষ্যও আমরা এখানে পাই। অ্যারিস্টোবুলুস তক্ষশিলায় এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন; রাভি এবং বিতস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ক্যাথেই (কাথি? ক্ষত্রী)-দের মধ্যে এর ব্যাপকতার প্রসঙ্গটি লিপিবদ্ধ করেছেন দিয়োদোরাস। তিনি অবশ্য আমাদের একথাও বলেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩১৬ অব্দে গাবিয়েনের প্রথম যুদ্ধে (ইরানে ইস্পাহানের নিকটে) একজন ভারতবর্ষীয় সেনাপতি কেতেউস নিহত হবার পর তাঁর তরুণী-পত্নী স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় প্রাণ

বিসর্জন দিয়েছিলেন। আমাদের পরিচিত পরবর্তীকালের সতীদাহ-প্রথার সঙ্গে তাঁর বিশদ বর্ণনায় চিত্রিত ঘটনার সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরানের পার্শী (এবং জরথুষ্ট্রীয়) পুরোহিতদের প্রাচীন প্রথার অনুসরণে মৃতদেহকে উন্মুক্ত স্থানে শকুনির খাদ্য হিসাবে ফেলে যাবার রীতিও সে সময় তক্ষশিলায় প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষীয়দের লেখনপদ্ধতি ব্যবহারের কোনো উল্লেখ এইসব বিবরণে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টি স্ট্রাবো (XV. ১.৬৭) লক্ষ করেছিলেন। তিনি আমাদের এ কথাও জানিয়েছেন, ভারতবর্ষের মানুষ যে "ঘন বুনটের লিনেন (সুতীর) কাপড়"-এর ওপরে তাদের অক্ষরগুলি লিখতো, সেটি নিয়ারখুশের চোখে পড়েছিল (তাঁর বিবরণের এই অংশটি এখন আর পাওয়া যায় না)। আকেমেনিদীয় শাসনে ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে আরমীয় লিপির যথেষ্ট পরিচয় ঘটার সম্ভাবনা প্রবল এবং আরেমিক থেকে সৃষ্ট খরোষ্টি লিপির ব্যবহার ইতিমধ্যেই প্রচলিত। অবশ্য অশোকের শিলালিপির পূর্বে খরোষ্ঠী লিপির আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। ভাষার ক্ষেত্রে, নিয়ারখুশ তাঁর বেলুচিস্তানের সমুদ্র-তটবর্তী অঞ্চলের বিবরণে, সাধারণভাবে 'ভাষা এবং প্রথা'-র নিরিখে ভারতবর্ষের মানুষজনের মধ্যে একটি জাতি-গোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য আলেকজান্ডারের অধীনস্থ ভারতবর্ষের গোষ্ঠীগুলি একই ভাষায় কথা বলতো, উপরের মন্তব্যের এমন অর্থ বিচার অনুচিত। হাটে-বাজারে, আধিকারিকদের ব্যবহৃত একটি কথ্য বাচনভঙ্গির সার্বিক উপস্থিতি বেশ মনোরম বাকচাতুর্যে উল্লিখিত। এই কথ্য ভাষা সম্ভবত উত্তর পশ্চিমী অথবা গান্ধারী প্রাকৃত হতে পারে, অশোকের অনুশাসন এবং সাহেবগড়ী শিলালিপিতে যেটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রিক ভাষায় ব্যবহৃত তক্সিলা (তক্ষশিলা) এবং সান্দ্রাকোট্টাস জাতীয় নামগুলি সংস্কৃত (তক্ষশিলা এবং চন্দ্রগুপ্ত) থেকে নয়, নিশ্চিতরূপেই তখশিলা এবং চন্দগুত্ত (গান্ধারী* চন্দ্রগুত্ত) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়টিও লক্ষণীয়।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে কেবলমাত্র ওষুধের কথা বলা হয়েছে। নিয়ারখুশ (অ্যারিয়ানের উদ্ধৃত, ইন্ডিকা, XV) বলছেন যে, গ্রিক চিকিৎসকেরা সর্প-দংশনের নিরাময়ে ব্যর্থ হওয়ায় আলেকজান্ডার ভারতীয় ওঝাদের ডেকে এনেছিলেন এবং "সেইসব লোকেরা অন্যান্য রোগ-ব্যাধি এবং যন্ত্রণার উপশমও করতে পেরেছিল।" এটিই মনে হয়, বিদেশে আয়ুর্বেদের স্বীকৃতির প্রথম ঘটনা।

ধর্ম সংক্রান্ত বিবরণে সাধারণভাবে দেবমূর্তি এবং মন্দিরের (আলেকজান্ডারের ইজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া এবং ইরান আক্রমণের বিবরণে যার প্রায়শ উল্লেখ চোখে পড়ে) কোনো উল্লেখ না থাকা অবশ্যই কিছু কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আপাতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত পৌরোহিত্য প্রথায় এর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। ব্রাহ্মণদের দার্শনিক মনে করা হতো; দিয়োদোরাস সিন্ধু প্রদেশের একজন ব্রাহ্মণের কথা বলেছেন যিনি আপন মহিমায় বেঁচে থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা, উভয়ের

প্রয়োজনীয়তাব কথা বলেছেন— এই চিন্তাব সামান্য একটু পরিবর্তন করলেই এখনকার পণ্ডিতদের ভগবদগীতার বাণীর কথা স্মরণ হতে পারে। আরেকটি ঘটনায় জৈন তপস্বীদের উল্লেখ মেলে। তক্ষশিলায় এমন কয়েকজন নগ্ন পদব্রজী তপস্বীর কথা বলা হয়েছে। তাদের নেতা দান্দামিস (অথবা মান্দানিস) আলেকজান্ডারের কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কেননা তিনি তাঁর পার্থিব শরীর যেটি তাঁর ভাষায় 'আমার অশোভন গৃহসঙ্গী', সেটিকে পরিত্যাগ করতে উদগ্রীব ছিলেন। অপর একজন দার্শনিক, ক্যালানুস (কল্যাণ?) ইরানের পার্সেপোলিসে আলেকজান্ডারের ফিরতি-যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন। সেখানে প্রকাশ্য স্থানে সর্বজনসমক্ষে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তিনিও সম্ভবত জৈন অথবা অজীবিক সন্ন্যাসী ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অব্দে মগধে সংগঠিত ধর্মীয় বিপ্লব এইভাবে তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষেও মানুষের সমর্থন লাভ করছে। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম যে কীভাবে এইসব গ্রিক বিবরণকারীর দৃষ্টি অগোচর রইল, সেটি বেশ কৌতূহলের বিষয়।

১.২ আলেকজান্ডারের আক্রমণ

আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রিক সভ্যতা তথা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম এবং চতুর্থ অব্দের মহান দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং নাট্যকারদের, শিল্প এবং যৌক্তিক উদ্দীপনা ও জিজ্ঞাসা, এককথায় মানব সভ্যতার অন্যতম মহান আরব্ধের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয় সম্পর্কে যুক্ত হল ভারতবর্ষ। গ্রিক-ভাষী এইসব মানুষজন ('হেলাস') আধুনিক গ্রিক, পশ্চিম তুর্কীস্তান এবং ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করত। এশীয় তুর্কীর পশ্চিম অংশের নাম ছিল আয়োনীয়া (যার থেকে প্রাকৃত 'ইয়োনা' এবং এর সংস্কৃত রূপ 'যবন' শব্দটি গ্রিক অর্থে ব্যবহৃত)। রাজনৈতিকভাবে গ্রিক জাতি ছিল বহুধাবিভক্ত: ইরানের আকেমেনিদীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল আয়োনীয় নগরগুলি এবং রাজধানীসমূহ, আর ইউরোপীয় গ্রিক (বিশাল দাস-জন-সমষ্টি সহ) নগর-রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিরত দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থাকত।

গ্রিসের উত্তরে মাসেডোনিয়া— বিবিধ গোষ্ঠী ও বিবিধ গোত্রের মানুষ বাস করত সেখানে— কথা বলত যে যার নিজস্ব বাচনে। স্থানীয় অভিজাত এবং কৃষকদের নিয়ে একটি নতুন রকমের সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন দ্বিতীয় ফিলিপ (রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৯-৩৩৬ অব্দ)। আত্মরক্ষাকারী বর্ম এবং দীর্ঘ বর্শায় তারা সুসজ্জিত ছিল। সৈন্যেরা ব্যূহ অর্থাৎ ঘনসন্নিবিষ্ট আকারে, চতুঃষ্কোণ এবং অন্যান্য আকারে বিন্যস্ত হতে পারত। দ্রুত ব্যূহ উন্মুক্ত করা কিংবা বন্ধ করা বা আকার পরিবর্তন করা— এসবেই সুশিক্ষিত ছিল তারা। হাল্কা অশ্বারোহী বাহিনীতে সুসজ্জিত ছিল সেই সেনাদল— এমন সব ঘোড়সওয়ার (অশ্বারোহী তীরন্দাজ সহ) যারা জিন, রেকাব কিংবা লোহার জুতো ব্যতিরেকেই অশ্ব চালনা করতে পারতো।

এরই সঙ্গে আক্রান্তদের নির্বিচারে হত্যা করতে, তাদের দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পাথরের গুলি ছোঁড়ার জন্য কাঠের দীর্ঘ গুলতির মতো অস্ত্র, চলমান কাষ্ঠদণ্ড, প্রাচীর চূর্ণ করার জন্য ঢেঁকি জাতীয় অস্ত্র— এসব হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে সেই সেনাবাহিনী তাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল। ফিলিপ তাঁর সেনাবাহিনীতে এমন উচ্চমাত্রায় যুদ্ধকালীন শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন সামরিক দক্ষতার-প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করেছিলেন যে, অন্যান্য প্রাচীনতর সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বাহিনীর সম্মুখে নিছক একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পর্যবসিত হতো। এ বিষয়টিও সমপরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধবিগ্রহে এই বিপ্লবের ফলাফল হলো নাটকীয়। সমগ্র গ্রিসের প্রভু হয়ে উঠলেন ফিলিপ; আর তাঁর পুত্র মহান আলেকজান্ডার (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩ অব্দ) এশিয়ার মাইনর অতিক্রম করে ইজিপ্ট থেকে ট্রানসোক্সিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আকামেনিদীয় সাম্রাজ্যকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন। বিশাল তিনটি যুদ্ধ— যাদের মধ্যে দুটি যুদ্ধে ভাগ্য-বিড়ম্বিত সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩৩০ অব্দ) স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন— এই তিন যুদ্ধের পরিণতিতে সমগ্র আকামেনিদীয় সাম্রাজ্য এই আক্রমণকারীর সম্মুখে নতজানু হলো।

এই পরাজিত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে আলেকজান্ডারের অভিযান শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে। আরিয়া (হিরাট) দখল করে আফগানিস্তানে পদার্পণ করলেন তিনি; তারপর এগিয়ে চললেন দক্ষিণে ঝারাঙ্গিয়া (ঝারাং বা সেস্তান) অভিমুখে। হেলমন্দ উপত্যকা পর্যন্ত তাঁর সেনাবাহিনীকে চালনা করে তিনি দখল করে নিলেন আরাকোশিয়া (হরখবৈতি বা আর্ঘান্দাব উপত্যকা)। এরপর থেকেই এর রাজধানী কান্দাহারে গ্রিক এবং ইরানীয় উভয় জাতিকেই দেখা গেল। কেননা, ভারতীয় সম্রাট অশোক কান্দাহারে আরমীয় ভাষার শিলালিপি স্থাপন করেছিলেন। এই ভাষাটি গ্রিক এবং আকামেনিদীয় উভয়েরই রাজভাষা। বৃত্তাকার অথচ সহজতর পথ অনুসরণ করে আলেকজান্ডার পৌঁছলেন কাবুল নদী-উপত্যকায়। সেখানে বেগ্রামের নিকটে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নামে আর একটি নগরী স্থাপন করলেন। এরপর হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে, বাকট্রিয়ার (বলখ্) শাসক বেসাস যিনি পলায়নপর দারিয়ুসকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে বিতাড়িত করলেন আলেকজান্ডার। এবার বেসাসের পশ্চাদ্ধাবনে শুরু হলো তাঁর ট্রানসোক্সিনিয়া বিজয় অভিযান (মানচিত্র ১.১)।

সমগ্র গ্রিসের একচ্ছত্র শাসক হিসাবে ক্ষুদ্র মাসেডোনিয়ার দাবিসনদ ঊর্ধ্বে স্থাপিত করলেও আলেকজান্ডার কিন্তু গ্রিক সংস্কৃতির একজন প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। ইরানীদের আঘাতে বারবার নিগৃহীত হয়েছিল গ্রিস। সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি। এখন ইরানের মূলভূমির শাসক হবার পর, আর এক উচ্চাশার হাতছানিতে তিনি বিবশ হলেন— তাঁকে হতে হবে 'মহান রাজা', আকামেনিদীয় ঐতিহ্যের একজন উত্তরসুরি। ইরানী সাম্রাজ্যের সামগ্রিক কাঠামো প্রায় অবিকল গ্রহণ

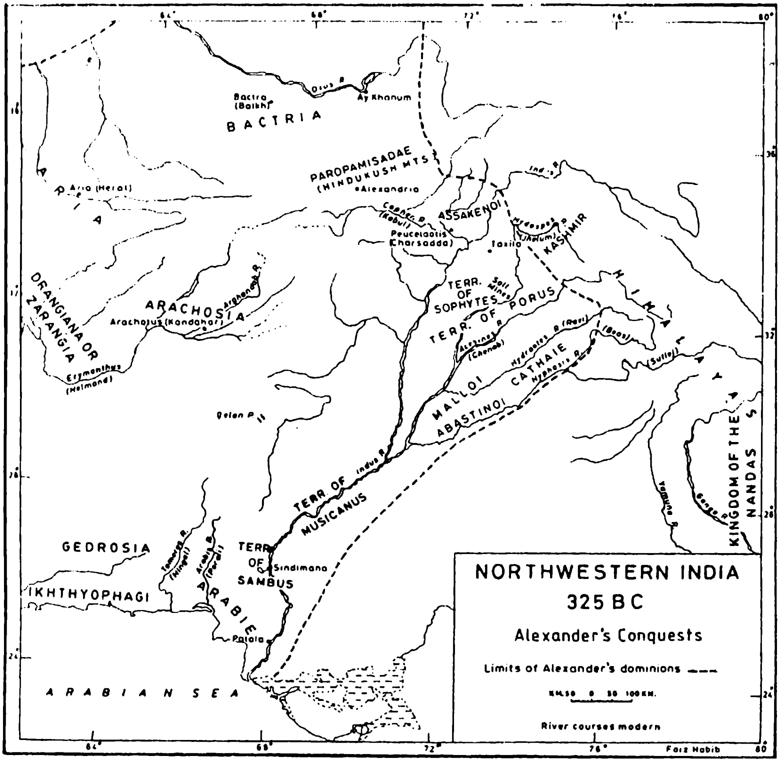

মানচিত্র ১.১ উত্তরপশ্চিম-ভারত খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ: আলোকজাণ্ডারের বিজয়-অভিযান

করা হলো। রাজকীয় উপাধি এবং প্রথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রইল। প্রাদেশিক শাসকের ইরানী উপাধি খত্রপ (ওয়ান) তার গ্রিক পরিচয়ে 'সত্রপ' রূপে প্রকাশিত হলো। সাধারণত শাসনকার্যে যদিও মাসেডোনীয়দেরই নিয়োগ করা হতো, তবু ইরানী অভিজাতদের কয়েকজনও এ কার্যে নিযুক্ত হলেন। মাসেডোনিয়া এবং গ্রিস থেকে অবিরত নতুন নতুন সেনা-প্রবাহ অব্যাহত রইল, তথাপি আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীতে একইসঙ্গে ইরানী জাতিগোষ্ঠীর সৈন্য ও সেনাপ্রধানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে লাগল। এদের মধ্যে এমনকি উত্তর-অক্সাস থেকে আসা অর্ধ-নোমাডিক শক (স্কিথিয়ান) অশ্বারোহীও ছিল। এই নব নিযুক্ত সৈন্যেরা দ্রুত মাসেডোনিয় এবং সেইসঙ্গে গ্রিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার কৌশলে শিক্ষিত হয়ে উঠল।

এইরকম বিচিত্র অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ এক সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে, আলেকজান্ডার তাঁর মধ্য এশিয়ার বিজয়-অভিযান সমাপ্ত করে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দের বসন্তকালে, ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। পশ্চাতে পড়ে রইল বাকট্রিয়া (উত্তর

আফগানিস্তান): অতিক্রম করলেন তিনি হিন্দুকুশ পর্বতমালা (পারোপামিসাদাই); মাসেডোনীয় এবং গ্রিক মানুষজনের নতুন গৃহস্থালিতে শক্তিশালী হয়ে উঠল বেগ্রামে প্রতিষ্ঠিত তাঁর 'আলেকজান্দ্রিয়া' নগরী। কাবুল (কোফেন) নদী তীর বরাবর অগ্রসর হয়ে তাঁর বাহিনী পেশোয়ারের উত্তরে পিউসেলাওটিস (চারসাদ্দা ?) ধ্বংস করল। সম্ভবত তাঁর বাহিনীর বাম প্রান্তটি সুরক্ষিত করতে তিনি সোয়াট উপত্যকা অভিমুখে ধাবিত হলেন, সে স্থানের বহুল-প্রশংসিত গবাদি পশুপাল দখল করে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করলেন। প্রধানত যে প্রাচীন জনজাতিকে পদানত করার প্রভূত প্রয়োজন ছিল তারা হলো আস্‌সাকেনৌ (আসাকেনীয়) জাতি-গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর গোত্রনামানুসারে গোষ্ঠীপ্রধান আসাকেনুস নামে পরিচিত ছিল। প্রবল উদ্দীপ্ত প্রতিরোধের পর তাদের প্রধান শহর মাসাগা (স্থানটির সন্ধান মেলেনি) আলেকজান্ডারের অবরোধী কৌশলের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করল। আপাতভাবে মনে হয় 'আওর্নাস' (বর্ণ?) পাহাড়টি কোনো বিশেষ কৌশলগত মূল্য বিচার না করে নিছকই দুঃসাহসিক অভিযানের মেজাজেই অবরোধ করা হয়েছিল; এই স্থানটির যে ভৌগোলিক পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেটির সাহায্যে এর অবস্থান নির্ণয়ের সমস্যাটির কোনো সন্তোষজনক সমাধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

গ্রিক দেবতা দিওনিসুস-এর সঙ্গে যে শহরটির নামকরণের যোগসূত্র রয়েছে এমন দাবি করা হয়, সেই 'নিসা' শহর আত্মসমর্পণ করার পর, আলেকজান্ডার সম্ভবত পরপর সজ্জিত নৌকা-সেতুর সহায়তায় সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন এবং তক্ষশিলায় উপনীত হন। সেখানকার শাসকের আবার দুটি নাম তক্সাইলস (নিশ্চিতরূপে তক্ষশিলা বা তক্সিলার অনুসরণে) এবং ওমফিস (অম্ভি); তিনি তো ইতিমধ্যেই আলেকজান্ডারের বশ্যতাস্বীকার করে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপনা করেছেন। পরবর্তী নদী হিদাসপেসের (বিতস্তা বা ঝিলম) পরপারে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন দুই শাসকের রাজ্য— সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের একটি জনগোষ্ঠী (পুরু)-র গোত্রনামানুসারে (বৈদিক যুগ ১.৫ দ্রষ্টব্য) উভয়ের নামই 'পোরাস'। এই দুটি স্থানের রাজপুত্রের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী যুবরাজ ঝিলমের পরপারে আলেকজান্ডারের পথরোধ করল। ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাসের অধ্যয়নে এই যুদ্ধটি যে কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিধায় বিশেষিত সেটি হলো, প্রাচীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাসে এই একটিমাত্র প্রকৃত যুদ্ধ এমন পেশাগত খুঁটিনাটি বর্ণনায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

উপর্যুপরি কৃত্রিম আক্রমণের কৌশলে পুরুকে প্রতারিত করে আলেকজান্ডার তাঁর ঝিলমের পরপার-অভিযানে সফল হয়েছিলেন; ১২০টি রথ এবং কিছু অশ্বারোহী সজ্জিত পুরু-পুত্রের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করেছিলেন তিনি। পুরু নিজে তাঁর প্রসিদ্ধ ৪০০০ অশ্বারোহী, ৩০০টি রথ, ২০০টি হস্তী এবং ৩০০০ পদাতিক সেনা সহ অধিকতর শুষ্ক ভূখণ্ডে আলেকজান্ডারের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে

একটি দীর্ঘ ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করেছিলেন সে ক্ষেত্রের উভয় প্রান্তেই ছিল তাঁর হস্তীযূথ এবং তাদের অন্তর্বর্তী স্থানে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। শেষোক্ত দলটির সম্মুখে ছিল সারিবদ্ধ রথ। পুরুর সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আলেকজান্ডার এই আপাত-অপরাজেয় বিন্যাসকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। যেমন, সু-নিয়ন্ত্রিত অশ্বারোহী আক্রমণে পুরুর অশ্বারোহী বাহিনীকে তিনি প্রথমে একদিকে, পরে আবার অন্যদিকে দৌড়তে বাধ্য করেছিলেন। হস্তীযূথের মুখোমুখি অশ্বেরা যেহেতু চমকিত হতে পারে, সে কারণেই তাঁর সুশৃঙ্খল পদাতিক বাহিনী ওই পশুযূথ এবং মাহুতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরে অশ্বারোহীর দল পশ্চাৎ থেকে হস্তীগুলিকে আক্রমণ করল (চিত্র ১.১ দ্রষ্টব্য)। ইরানের যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন রথারূঢ় সৈন্যের দল আলেকজান্ডারের বাহিনীর সম্মুখে পরাজিত হয়েছিল, এখানেও ঠিক তেমনি ঘটল। শেষাবধি, পুরুর বাহিনী হস্তীযূথের চতুর্দিকে ভিড় জমাতে লাগল। পরিস্থিতি তখন এমন যে স্বপক্ষীয় সেনাদের পদদলিত না করে পশুগুলির আর এক পা-ও এগোবার স্থান ছিল না। প্রভূত হত্যালীলায় ভারতবর্ষীয় এই বাহিনী পরাভূত হলো এবং পুরু স্বয়ং বন্দী হলেন।

পুরুকে তাঁর অধীনস্থ রাজা হিসাবে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করে আলেকজান্ডার পূর্বমুখে অগ্রসর হয়ে নিম্ন হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের নিকটে 'অকেসিনস' (অসিকনি বা চেনাব) অতিক্রম করলেন, তারপর পার হলেন হিদ্রাওটেস (ইরাবতী অথবা রাভি)। এরপরে তিনি সাঙ্গালা দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একটি পাথুরে ঢিপি বা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি ইটের দুর্গ— নিকটেই একটি হ্রদ (অবস্থানের সন্তোষজনক শনাক্তকরণ হয়নি)— সেখানে 'ক্যাথেই' জনগোষ্ঠী নিজেদের আত্মরক্ষার

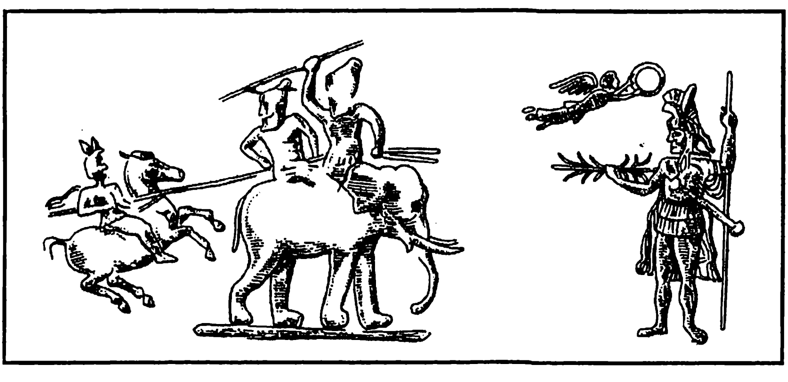

চিত্র ১.১আলেকজাণ্ডারের পদক, ব্যবিলন, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ (c) সম্মুখভাগ : মাসেডোনীয় অশ্বারোহী ভারতীয় হাতিকে আক্রমণ করছে
পৃষ্ঠ ভাগ : বজ্র হস্তে আলেকজাণ্ডার (A B. Bosworth- অনুসরণে) অশ্বের রেকাব ও জিনের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়

জন্য সমবেত হয়েছিল। ৭০,০০০ যুদ্ধবন্দীকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এদের দাসে পরিণত করে তিনি যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন এমন অনুমান করাই যায়। এর পরে পথিমধ্যে যে নদী তার নাম হিফাসিস (বিপাশা বা বিয়ফস, সম্ভবত শতদ্রু-বিয়াসের যুক্ত স্রোত)। এরও পূর্বদিকে বিশাল গাঙ্গেয় অববাহিকা, 'সমৃদ্ধ এবং উর্বর' এক দেশ, ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক সংখ্যায় হস্তীর সমাবেশ সেখানে। আর যুদ্ধে এই পশুটির মূল্য আলেকজান্ডার এখন বিলকুল অনুধাবন করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও আলেকজান্ডারের সেনানায়কেরা আরো অগ্রসর হতে অস্বীকার করলেন : যে সম্পদ জয় করেছেন, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। এছাড়া এই সুদীর্ঘ অভিযানে, স্বদেশ থেকে এতদূরে চলে আসার উদ্বেগে তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, ফিরতি পথের যাত্রা শুরু হলো। সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ পুরু তাঁর নিজস্ব রাজত্বের এলাকাসহ বিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের শাসক হলেন। ঝিলমের তীরে পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সেই স্থানটিতে প্রত্যাবর্তন করে আলেকজান্ডার আবার নিজ বাহিনী পুনর্নির্মাণ করলেন। এবার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত দুই শহরের বাসিন্দা এবং দুর্গ-রক্ষীরা তাঁর সেনাবাহিনী। নিম্ন-হিমালয় অঞ্চলে অভিসর জনগোষ্ঠীর প্রধান আবসারেস-এর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ এবং সেইসঙ্গে লবণাক্ত অঞ্চলের শাসক সোপেইথেস বা সোফিটেস (সৌভূমি)-এর আনুগত্য গ্রহণ করলেন তিনি। এবার সমুদ্রপথে আর একটি বিশাল অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা সাঙ্গ হলো।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন নৌকা-নির্মাতা জনগোষ্ঠীর সহায়তায়, আলেকজান্ডার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ-সমন্বিত এক বিশাল নৌবহর প্রস্তুত করলেন। ঝিলমের স্রোতে প্রবাহিত-হওয়া পাহাড়ী অঞ্চলের দারুবৃক্ষেই নিঃসন্দেহে এই নৌকাগুলি নির্মিত হয়েছিল। পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে নদীর উভয় তীরে সুসজ্জিত করে, ২০০টি হস্তীকে সঙ্গী করে তাঁর ক্ষুদ্র নৌবহরে তিনি এবার নদীপথে নৌ-অভিযানে চললেন। চেনাবের সঙ্গম অতিক্রম করে 'মল্লোই' (মল্ল)-দের হঠাৎ চমকে দেবার জন্য তিনি একটি শুষ্ক অঞ্চল বরাবর তাঁর সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করলেন। নির্বিচার গণহত্যায় একটি দুর্গ-শহর আলেকজান্ডারের অধিকৃত হবার পর, 'মল্লৌ' গোষ্ঠী রাভি নদীর তীর বরাবর পালাতে লাগল। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আলেকজান্ডার মুলতানের সন্নিকটে কোনো এক স্থানে অবস্থিত তাদের রাজধানী-শহর দখল করে নিলেন। (১৪০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই শহরের পাশ দিয়ে রাভি নদী প্রবাহিত হতো।) এই শহরটি অধিকারের সময়কালে অস্থির আলেকজান্ডার স্বয়ং একটি ঝটিকাবাহিনীর নেতৃত্ব-দানকালে গুরুতর আহত হন। অনেক কঠিন বাধা অতিক্রম করে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়। এর প্রতিশোধে, স্ত্রীলোক

এবং শিশু নির্বিশেষে শহরের প্রতিটি অধিবাসীকে তলোয়ারের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। উপঢৌকন হিসাবে ৫০০টি অশ্বরথের বিনিময়ে আলেকজান্ডার অবশিষ্ট মল্লপ্রধান ও তাঁদের মিত্র 'অক্সিদ্রাকাই'-এর বশ্যতা অনুমোদন করেন। এবার রাভি ও চেনাবের সঙ্গমস্থলে পৌঁছবার জন্য তাঁকে একটি সংক্ষিপ্ত পথ অতিক্রম করতে হয়। এরপরেই এই সম্মিলিত প্রবাহ এবং সিন্ধু নদের মিলনস্থল অভিমুখে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। এই সঙ্গমের সন্নিকটে প্রথমে 'অবস্তানী' (অম্বাস্থাস) বশ্যতা স্বীকার করে; এবং এই দুই বিপুল স্রোতধারা যেস্থলে মিলিত হয়েছে, সেখানে আলেকজান্ডার আরো একটি বসতির সন্ধান পান।

এইবার আলেকজান্ডার সিন্ধ অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। উত্তর-সিন্ধের শাসক মুশিকানুস আলেকজান্ডারের এই দ্রুত অভিযানে চমকিত হয়ে প্রথমে আত্মসমর্পণ করলেও পরে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন এবং নিহত হন; তাঁর প্রজারা দাসে পরিণত হয়। আরেক প্রধান অক্সিকানুসের রাজধানী অধিকৃত হয় এবং মাটিতে মিশে যায়। আরও দক্ষিণে ছিল সাম্বুসের রাজত্ব : পার্বত্য জনগোষ্ঠীর শাসক ছিলেন তিনি। সেই পার্বত্য অঞ্চলটি অবশ্যই কির্থার পর্বতমালা। সে কারণে তাঁর রাজধানী সিন্ধিমানাকে আপাতদৃষ্টিতে সেহওয়ান হিসাবে সনাক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। সাম্বুস পালিয়ে বাঁচলেন এবং বিনা রক্তপাতে সিন্ধিমানা অধিকৃত হলো।

কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমে ইরান এবং মেসোপটেমিয়া প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করছিলেন আলেকজান্ডার এবং সেইমতো তাঁর ভারত-বিজয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত কিছু ব্যবস্থাপনাও করছিলেন। সমগ্র সিন্ধু অববাহিকা দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণে সিন্ধু-চেনাব সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তরের অংশটি রইল ফিলিপের নিয়ন্ত্রণে; আর সহ-মন্ত্রপ হিসাবে ওই স্থান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত শাসনের দায়িত্বভার পেলেন আলেকজান্ডারের ব্যাকট্রীয় শ্বশুর অক্সিয়ার্টেস (সম্ভবত তিনি ছিলেন নামমাত্র শাসক এবং অকুস্থলে অনুপস্থিত) এবং পেইথন। ফিলিপ এবং পেইথন ছিলেন মাসেডোনিয়ার মানুষ; অধীনস্থ ভারতীয় যুবরাজ সহ গ্রিক, ইরানি এবং মাসেডোনীয় সৈনিকের সমন্বয়ে গঠিত এক মিশ্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন তাঁরা। এমন এক পরিস্থিতিতে গোলমালের সম্ভাবনা প্রবল এবং বাস্তবে সেটিই হলো। আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার অল্পকিছু পরেই, এক সশস্ত্র বাহিনীর (গ্রিক?) ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে ফিলিপ সম্ভবত তাঁর তক্ষশিলার সদরদপ্তরে নিহত হলেন। কিন্তু তাঁর মাসেডোনীয় রক্ষীবাহিনী এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সমূলে বিনাশ করল এবং ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যা করল। ভারতীয় রাজকুমার তক্সাইলকে সহকারী হিসাবে গ্রহণ করে ওই প্রদেশ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আলেকজান্ডার ইউডেমুস (একজন মাসেডোনীয়)-কে আদেশ দিলেন। স্থানীয় সমর্থন লাভের জন্য আলেকজান্ডারের যে উদ্বেগ, এই ব্যবস্থায় সেটির স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দের হেমন্তকালে, নিম্ন-সিন্ধে আলেকজান্ডার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিজিত অঞ্চলসমূহে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু মজুত বাহিনী ভারতবর্ষে অবস্থান করবে এবং এ স্থানে প্রাপ্ত হস্তীযূথ সহ তাঁর বাহিনীর একাংশ আরাকোশিয়া (কান্দাহার) এবং ঝারাঙ্গিয়া (সেইস্তান)-র মধ্য দিয়ে কার্মানিয়া (কির্মান, পূর্ব ইরান) অভিমুখে অগ্রবর্তী হবে। এই বাহিনী সম্ভবত বোলান গিরিপথও অতিক্রম করেছিল, কিন্তু এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য মেলে না। পেদ্রোসিয়ার (বেলুচিস্তান) মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশকে সমুদ্র উপকূলে সন্নিকটস্থ অঞ্চল বরবার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং আলেকজান্ডার। পারস্য উপসাগরে পৌঁছবার জন্য নিয়ারখুশের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র নৌবহর সমুদ্র তটরেখা বরাবর এগিয়ে চলেছিল। বালুচিস্তান প্রদেশের মধ্য দিয়ে স্থলপথে অগ্রবর্তী হবার এই সিদ্ধান্ত যে হঠকারী তারই প্রমাণে প্রভূত সংখ্যায় মানুষ ও পশু এই অভিযানে নিহত হলো। পরিশেষে আলেকজান্ডার গেদ্রোসিয়া এবং আরাকোসিয়াকে সংযুক্ত করে একজন সত্রপের শাসনাধীন এলাকায় পরিণত করলেন। এই অঞ্চলের দায়িত্ব পেলেন সাইবারটিউস। কারামানিয়াতে তিনি যে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন, তাদের আরাকোসিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠালেন ভারতবর্ষে। আর তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দের এপ্রিল-মে মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের মুসা-য় পৌঁছলেন। সেস্থান থেকে তিনি যখন ইরানের ব্যাবিলনের উদ্দেশে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখনই খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের জুন মাসে হঠাৎ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলেকজান্ডারের আক্রমণের অভিঘাতে, নির্বিচার লুণ্ঠন ও ধ্বংসে ভারতবর্ষের বিজিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিঃসন্দেহে প্রবল আন্দোলিত হয়েছিল। ধনসম্পদ, সামগ্রী ও দাসে পরিণত মানবসম্পদ প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করাই ছিল আলেকজান্ডারের প্রকাশ্য এবং তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজত্বে তিনি অবশ্যই ভারতীয় রাজকুমার এবং প্রধানদের মধ্যস্থতার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিদেশী রক্ষীবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং আলেকজান্ডারের রাজসভাসদ, সত্রপ ও সেনানায়কদের বিলাসব্যসনের প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেওয়াই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

আলেকজান্ডারের বিজয়-অভিযানের অগ্রগতির ছায়াসঙ্গী ছিল বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের বিপুল পীড়ন ও যন্ত্রণা। তথাপি এর ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির যে ফলপ্রসূ সংমিশ্রণ ঘটেছিল, সে কারণেই ইতিহাসে এই অভিযান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইজিপ্ট এবং সিরিয়ায় যে হেলেনীয় সভ্যতার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে সরকারী ও বিজ্ঞানের ভাষা হিসাবে গ্রিক ভাষা ব্যবহৃত হতো। আরো পূর্বে বিস্তৃত হেলেনীয় সংস্কৃতির স্তরটি ছিল অনেক সূক্ষ্ম, কিন্তু সিন্ধু অববাহিকা সহ সমগ্র অঞ্চলে গ্রিক (এবং মাসেডোনীয়) জনগোষ্ঠী সুবিধাজনক দূরত্বে বিভিন্ন

শহরে তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। আমাদের প্রমাণার্থে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এমন একটি শহর উদ্ধার করা হয়েছে— তার নাম আই খানুম। উত্তর আফগানিস্তানে অক্ষু নদীর তীরে এর অবস্থান— একটি থিয়েটার ও জিমনাসিয়াম সহ সম্পূর্ণ একটি নগরী। আলেকজান্ডার স্বয়ং এই শহর প্রতিষ্ঠা না করলেও, সম্ভবত সেলুকাসের সময়কালে (খ্রিস্টপূর্ব ৩১১-২৮১) এটি স্থাপিত হয়। আশ্চর্যজনক নানান সামগ্রী এখানে উদ্ধার করা হয়েছে— কান্দাহার গ্রিসের দক্ষিণাঞ্চল থেকে পরিভ্রমণরত দার্শনিক ক্লিয়ারখুসের খ্রিস্টপূর্ব ২৭৫ অব্দের (ক্যা.) একটি শিলালিপি যেখানে গ্রিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি খোদিত রয়েছে; অসাধারণ গ্রিক ভাষায় খোদিত খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দের (ক্যা.) অশোকের শিলালিপি। শেষোক্তটিতে গ্রিক অক্ষরের অপূর্ব ক্যালিওগ্রাফিক লেখনে উত্তর-আলেক্সান্দ্রীয় প্রভাবের পরিচয় মেলে এবং সেইসঙ্গে গ্রিক-বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিস্তৃত এর বহিঃস্থ বসতির সঙ্গে সংযোগ-রক্ষার চিহ্নও বহন করে এইসব শিলা-সাক্ষর। নিজের সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মূল গ্রিসের পাঁচজন ইয়োনাস-শাসকের প্রসঙ্গক্রমে অশোকের শিলালিপিতে (শিলালিপি XIII : নিষ্কর্ষ ১.৪) উল্লিখিত 'ইয়োন' শব্দটি হেলেনীয় বিশ্ব ও ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগের (এবং বাণিজ্য) চিহ্ন বহন করছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ফলাফল বিবিধ; তার মধ্যে কয়েকটি প্রসঙ্গ পরবর্তী নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে— যেমন অব্দের প্রচলন, ভাস্কর্য ও প্রস্তরশিল্পে উপরি অংশের রক্তিমাভা, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে হেলেনীয় উপাদানের অনুপ্রবেশ। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রিক-বিশ্ব থেকে ভারতবর্ষ অভিমুখে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপ্তিকেও আলেকজান্ডারের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার দীর্ঘমেয়াদী ও অনিচ্ছাকৃত ফলাফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৩ নন্দ-বংশ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উত্থান

প্রাকৃত পয়ারে রচিত বংশানুক্রমিক শাসকদের বহুল প্রচলিত প্রাচীন তালিকার ভিত্তিতে (এফ. ই. পার্গিটারের প্রস্তাবনা অনুসারে) খ্রিস্ট জন্মের চতুর্থ শতকে প্রাচীন একটি পুরাণগাথা সংকলিত হয়। সেখানে মৌর্যদের ঠিক পূর্বেই নন্দ বংশের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয় (নিষ্কর্ষ ১.১ দ্রষ্টব্য)। সেইসব পুরাণগাথা অনুসারে, নন্দবংশ মাত্র দুটি প্রজন্মে বিস্তৃত ছিল— প্রতিষ্ঠাতা রাজা এবং তাঁর আট পুত্রের পর্যায়ক্রমিক শাসন। ধ্রুপদী (অর্থাৎ গ্রিক এবং লাতিন) বিবরণ (দিয়োদোরাস, XVIII. ৯৩; কুর্টিউস রুফুস, IX.2) যার প্রভাব আপাতভাবে আলেকজান্ডারের সমকালীন প্রতিবেদন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, সেখানেও দুই প্রজন্ম ব্যাপী শাসনকালের কথা বলা হয়েছে যদিও কেবল দুইজন শাসক, যারা পিতা ও পুত্র, তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত বৌদ্ধ ঐতিহ্যে (মহাবংশ, V,১৪-১৭) 'নয়জন' নন্দের কথা বলা হয় কিন্তু

তারা সকলেই যে সহোদর এবং পর্যায়ক্রমে শাসন করেছেন, সে বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুত, সমগ্র প্রচলিত পুরাণ-কথায় নন্দদের জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত অস্পষ্ট কিংবা তারা নিম্ন-বংশজ (অথবা রাজ-ঔরসজাত হলেও, পুরাণ অনুসারে কোনো শূদ্র-যোনিতে তাদের জন্ম)। বহু বিদ্যা-বিশারদ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭২ খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে যে গ্রিক প্রতিবেদন এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে, সেখানেও অদ্ভুত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথম নন্দ-শাসক স্বয়ং ছিলেন ক্ষৌরকার কিংবা এক ক্ষৌরকারের পুত্র। নন্দ-শাসকদের নামের অনুসন্ধানে আমাদের উৎসগুলি ব্যাখাতীত দৃষ্টান্তে বিভিন্ন অভিমুখে ধাবিত হয়। প্রচলিত বৌদ্ধ কাহিনীতে নয়জন নন্দ-শাসকের নাম পাওয়া যায়— উগ্গসেনা (উগ্রসেন) থেকে ধননন্দ পর্যন্ত; পুরাণে অবশ্য দুটি মাত্র নাম পাওয়া যায়, একজন হলেন প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম এবং অন্যজন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুকল্প। গ্রিক প্রতিবেদনে আলেকজান্ডারের সমসাময়িক শাসকের নাম আগ্রামেস বা ঝান্দ্রামেস হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটি অগ্রসৈন্য-এর (উগ্রসেনের পুত্র) অপভ্রংশ।

পুরাণে নন্দদের রাজত্বের পরিসর ১০০ বছর। এর মধ্যে প্রায় ৮৮ বছর এই বংশের প্রতিষ্ঠাতাই দেশ শাসন করেন। বৌদ্ধ রচনায় অবশ্য আর একটু যুক্তিসঙ্গত সময়কালের উল্লেখ মেলে। সেখানে এদের রাজত্বকাল ২২ বছর এবং সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এদের সিংহাসনচ্যুত করেন (টীকা ১.১ দ্রষ্টব্য)। সেই বিচারে নন্দ বংশের রাজত্বকালের পরিধি হবে খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৪ থেকে ৩২২ অব্দ (ক্যা.)।

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ এবং জৈন রচনায় ও বিশাখদত্তের সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষস'-এ পাটলিপুত্র নন্দদের রাজধানী হিসাবে চিহ্নিত (পালি ভাষায় একে 'পুপফাপুর'-ও বলা হয়)। অতএব এরা ছিলেন মগধের শাসক। পুরাণেও, শেষ শিশুনাগ শাসকের সঙ্গে মহাপদ্ম নন্দের সম্পর্ক স্থাপনা করে এদের মগধের শাসক হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে (নিষ্কর্ষ ১.১ দ্রষ্টব্য)। গ্রিক প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায় যে, 'গঙ্গারিদাই' এবং 'প্রাসী'-র রাজা ছিলেন আগ্রামেস। এদের মধ্যে প্রাসী অবশ্যই প্রাচ্যের মানুষ (সংস্কৃত 'পূর্বদেশীয়'- অর্থবাচক শব্দ)। মেগাস্থিনিস (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ ক্যা.)-এর বর্ণনাতেও পাটলিপুত্র (পালিবোথরা) প্রাচ্যদেশে অবস্থিত। গঙ্গার নিম্ন প্রবাহের বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকেই সম্ভবত 'গঙ্গারিদাই' এই গ্রিক নামে বিভূষিত করা হয়েছে। অতএব এইসব বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, অগ্রামেসের রাজত্ব উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা, আলেকজান্ডার যদি পাঞ্জাব অতিক্রম করে আরো পূর্বদেশে অগ্রসর হতেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন অগ্রামেস এমন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। খারাভেলার হাতিগুম্ফের শিলালিপিতে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গে দেখা যায় নন্দদের রাজত্ব কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) অবধি বিস্তৃত : সেখানে বলা হয়েছে যে,

'তিনশ বছরেরও' প্রাচীন সময়কালে 'নন্দরাজা' কলিঙ্গ রাজধানীতে জল আনয়নের জন্য একটি পরিখা খনন করিয়েছিলেন।

রাজত্বের বিস্তার এমন বিশাল হওয়ায় নন্দরাজাকে বিপুল এক সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ করতে হতো। অগ্রামেসের ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ চারঘোড়ার রথ এবং ৩,০০০ বা ৪,০০০ হস্তী (সংখ্যাগুলি দিওদোরাস ও কিউ. কুর্টিয়ুস রুফুস প্রদত্ত; পদাতিক বাহিনী ব্যতিরেকে অন্যান্য সব ক্ষেত্রে প্লুতার্ক অত্যন্ত বর্ধিত সংখ্যা দিয়েছেন) রয়েছে এমন তথ্য দেওয়া হয়েছিল আলেকজান্ডারকে। ওই একই গ্রিক প্রতিবেদনে এ কথাও উল্লেখিত যে, অগ্রামেসের পিতার অসম্মানজনক বৃত্তি এবং পূর্ববর্তী রানীর সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বিশ্বাসঘাতক পদক্ষেপে সিংহাসন দখলের কাহিনী পুরু আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, সে কারণেই ওই শাসক তাঁর প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। বিশেষত নন্দদের বংশপরম্পরায় ধনলিপ্সা এবং নানান গুরুভার রাজস্বের প্রবর্তনাও লোকচক্ষে নন্দদের অপ্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সাধারণ মানুষের এই বিরাগের ভাবনাটি সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ বংশ উৎপাতের প্রচেষ্টায় কাজে লাগিয়েছিলেন। 'মৌর্য' একটি গোত্র নাম হওয়াই সম্ভব। মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের অদ্যাবধি টিকে-থাকা খণ্ডাংশ সহ সমস্ত গ্রিক প্রতিবেদনে অথবা অশোকের শিলালিপিতে কোথাও এই শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও, ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'অশোক' উভয়ের নামের সঙ্গেই মৌর্য শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। পুরাণেও (খ্রিস্টজন্মের চতুর্থ শতকের অধিক প্রাচীন নয়) ওই বংশের এই একই নাম। বৌদ্ধ পরম্পরায় বলা হয়েছে, যে শাক্য-গোষ্ঠীতে বুদ্ধদেবের জন্ম তারই মোরিয়া গোত্রের মানুষ হলেন চন্দ্রগুপ্ত এবং এই মোরিয়া গোত্রের মানুষজন ময়ূর (মোরা) সঙ্কুল একটি স্থানে বসবাস করত। প্রচলিত জৈন রচনায় চন্দ্রগুপ্ত ময়ূরদের রাজ-অধ্যক্ষের পুত্র (ময়ূর-পোষক)। উভয়ক্ষেত্রেই এই প্রচলিত কথনের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ মেলে না।

পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে দাবি করা হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত কোনো এক নন্দ রাজার পুত্র অথবা দৌহিত্র। তবে দুয়ের বিচারে বৌদ্ধ বা জৈন কথনটি অধিক সম্ভাব্য বোধ হয়।

রোমান ঐতিহাসিক জাস্টিন যিনি মাসেডোনীয় সাম্রাজ্যের একটি গ্রিক ইতিহাস সংকলিত করেছিলেন, তাঁর একটি অসাধারণ অনুচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্তের জীবনের প্রথম পর্যায়ের কাহিনী রয়েছে। সেটিই এ বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠতম তথ্য-সূত্র। অবশ্যই গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না (নিষ্কর্ষ ১.২ দ্রষ্টব্য)। আমাদের বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন 'হীন বংশজাত'। সামরিক অধিনায়ক হিসাবে কর্মরত অবস্থায় তিনি সম্ভবত 'নন্দ্রাস' অথবা নন্দ রাজার বিরাগভাজন হন এবং প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বিদ্রোহীদের

সঙ্গে যোগ দেন। আধুনিক এক সম্পাদকের যে পাঠে আলেকজান্ডার 'নন্দ্রাস'-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তা ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে নয়, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর প্রথম জীবনে সমগ্র নন্দ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্লুতার্ক মন্তব্য করেন যে, 'আন্দ্রাকোট্টাস' (সান্দ্রাকোট্টাস বা চন্দ্রগুপ্ত) তাঁর যৌবনকালে, আলেকজান্ডারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নন্দ রাজা তাঁর প্রজাদের এমনই অপ্রিয় যে, আলেকজান্ডার সহজেই সে দেশ দখল করতে পারবেন, এ কথা বলার জন্য পরে তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। এ কাহিনী সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, এতে বোঝা যায় যে, প্রথমদিকে শুধুমাত্র নন্দদের সঙ্গেই চন্দ্রগুপ্তের শত্রুতা ছিল এমন কথাই সকলে বিশ্বাস করত। নন্দদের সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত যথাযথ শক্তি-সমাবেশ করতে পেরেছিলেন। প্রথম জীবনে চন্দ্রগুপ্তকে যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল সে-কাহিনী বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় রচনাতেই ব্যক্ত। 'মিলিন্দপনহো' বৌদ্ধ গ্রন্থে (IV ৮.২.৬) চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীর সঙ্গে নন্দের সেনাপতি ভদ্দশালা-র প্রভূত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রতি পরম্পরাগত রচনায় (শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ সহ) নন্দদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রামে তাঁর গুরু এবং মন্ত্রীপদে একজন ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি চাণক্য অথবা কৌটিল্য। নন্দদের জাত-শত্রু অথচ চন্দ্রগুপ্তের স্বার্থ সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সমর্থনে সদা তৎপর একজন মানুষ হিসাবে তাঁকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই কার্য সম্পাদনে তাঁর নিষ্ঠুরতা বল্গাহীন; ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন না মোটেই; অতি দ্রুত পরিকল্পনার ছক সাজিয়ে এবং চাতুর্যে কাজ হাসিল করেন তিনি। কথিত যে, শুধুমাত্র চন্দ্রগুপ্তের কারণে তিনি তাঁর অন্য এক শিষ্য পর্বতের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। পর্বত ছিলেন একজন নন্দ-রাজপুত্র অথবা উত্তর-পশ্চিম বা হিমালয়ের কোনো এক অঞ্চলের শাসক (এই হতভাগ্য শত্রু সম্পর্কে বিবৃতি এমনই বিবিধ ও বিচিত্র)। চাণক্যের সম্পর্কে একমাত্র এটুকুই বলা যায় যে, তিনি সম্ভবত ঐতিহাসিক চরিত্র, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী এবং অপরিমেয় নিষ্ঠুরতার জন্মদাতা। কিন্তু বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' (খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতক বা তার পরে রচিত) উপাখ্যানের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে অথবা বিবিধ ধ্রুপদী রচনায় তাঁর চরিত্রের বিবিধ খুঁটিনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেটি কাল্পনিক। বস্তুত তিনিই রাষ্ট্র পরিচালন বিষয়ে রচিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক বিখ্যাত বাদ-বিসম্বাদের রচয়িতা কিনা সে প্রসঙ্গে ১.২ নং টীকায় আলোচনা করা হয়েছে।

১.৪ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্ব (খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮ অব্দ ক্যা.)

অশোকের শিলালিপি অনুসারে আমরা যে কালপঞ্জী পুনরায় বিন্যস্ত করতে পারি (টীকা ১.১ দ্রষ্টব্য) সেখানে মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তের অভিষিক্ত হবার সময়কাল

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দ। চন্দ্রগুপ্তের কর্মজীবনের প্রথম পর্বে নন্দদের কবল থেকে সিংহাসন অধিকার করাই যে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে সমস্ত ধ্রুপদী বিবরণই সহমত পোষণ করে। এই সমস্ত বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্ত বা চাণক্য কোনো পক্ষেই 'যবন' অথবা 'ইয়োনাস' (মাসেডোনীয় বা গ্রিক বোঝাতে 'ইয়োনীয়ান' শব্দ ব্যবহৃত হতো)-দের সঙ্গে শত্রুতার কোনো উল্লেখ সেখানে দেখা যায় না। শুধুমাত্র জাস্টিনের ওই অনুচ্ছেদে (নিষ্কর্ষ ১.২) আলেকজান্ডারের উত্তরসূরিদের থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অধিকারের জন্য চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামান্য উল্লেখ রয়েছে। কীভাবে এই প্রসঙ্গটি এখানে এল তা আবিষ্কারের জন্য আরো বিশদ অনুধাবন প্রয়োজন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের জন্য তাঁর সেনাপতিরা যখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ, তখন আলেকজান্ডার অধিকৃত ভারতবর্ষীয় ভুখণ্ডে সংঘটিত ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্ডারের যখন জীবনাবসান হলো, তখন তাঁর 'অনুচরবৃন্দ', অথবা প্রধান সেনাপতির দল, যারা তখন মাসেডোনীয় সৈন্যবাহিনীর নামে কাজ করছিল, তারা সমগ্র সাম্রাজ্য দখলে সচেষ্ট হলো। বস্তুতপক্ষে, সর্বপ্রথমে শাসক-প্রতিনিধি রূপে (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩-৩২১) অবতীর্ণ হলেন পার্ডিক্কাস। তিনি একদিকে আলেকজান্ডারের সৎ-ভাই আর অন্যদিকে তাঁর অনাথ পুত্র যৌথভাবে উভয়ের প্রতিভূরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। সাম্রাজ্যের এশীয় অংশটি রইল তাঁর শাসনাধীনে। আর ব্যাকট্রিয়ার একদল সশস্ত্র গ্রিক বাহিনীর বিদ্রোহ দমন অভিযানে তিনি তাঁর পূর্বদেশীয় সত্রপদের (ভারতবর্ষ-সহ) শক্তি পরীক্ষায় প্রেরণ করলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে ইজিপ্টে পার্ডিক্কাস নিহত হবার পর, তাঁর মাসেডোনিয়ার সেনানায়ক আন্টিপেটার শাসক-প্রতিনিধি হলেন। ভারতবর্ষীয় অঞ্চলসমূহের জন্য তিনি যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন সে কথা আমাদের জানান দিয়োদোরাস (XVIII. ৩৯)। সামরিক অভিযান ব্যতিরেকে যেহেতু স্থানীয় শাসকদের অপসারণ অসম্ভব, সে কারণে তিনি সিন্ধু তীর বরাবর এবং হিদাসপেস (ঝিলম) অতিক্রম করে তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে পুরু শাসনাধীন হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। আলেকজান্ডারের অধীনে যিনি সিন্ধু অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন, সেই পেইথন পারোপামিসাদেই বা হিন্দুকুশের শাসনভার দেওয়া হলো। কিন্তু বাস্তবে, পাঞ্জাবে নিযুক্ত আলেকজান্ডারের সত্রপ ইউডেমুস সেখানে তাঁর পূর্বতন ক্ষমতা দখল করে রইলেন। কথিত আছে যে, তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করে পরবর্তীকালে পুরুকে হত্যা করেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩১৯ অব্দে আন্টিপেটারের মৃত্যুর পর, আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী (দিয়াদোচি)-দের একাংশের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই আরো তীব্র হয়। এইসব যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে আনীত হস্তীকুলের একটি প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য হবার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পলিপেরচোন, যিনি মাসেডোনিয়ায় আন্টিপেটারের

উত্তরাধিকারী ছিলেন, তাঁর সংগ্রহে ৬৭-র অধিক হাতি থাকায় তিনি বেশ সুবিধাজনক কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন— অবশ্য রোমের বিরুদ্ধে হ্যানিবলের সংগ্রামে, প্রায় একশ’ বছর পূর্বেই ইউরোপে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতিকে যে-কাজে লাগানো হয়েছিল এ বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইরানে আন্টিগোনাস এবং ইউমেনেসের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনায় আবার ভারতবর্ষে নিযুক্ত মাসেডোনীয় সত্রপবর্গ ইতিহাসে পরিচিত হয়ে উঠলেন। আলেকজান্ডারের সমগ্র সাম্রাজ্য দখলের স্বপ্ন দেখতেন আন্টিগোনাস আর আলেকজান্ডারের গ্রিক সচিব ইউমেনেস অত্যন্ত দৃঢ়তায় তাঁর প্রভুর ভবনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ইউমেনেসের সহচর, আরাকোশিয়ার সত্রপ (কান্দাহার জেলা) যাকে তিনি সাইবারটিউস নামে ডাকতেন, সেই সাইবারটিউস অবশ্য পরে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩১৭ অব্দে ইরানের গাবিয়েনের প্রথম যুদ্ধে যোগ দেবার সময় পাঞ্জাব থেকে ইউডেমুস ১১৪টি হস্তী এবং কিছু ভারতীয় সৈন্য সঙ্গে এনেছিলেন। পরের বছর গাবিয়েনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইউমেনেস পরাজিত হন এবং তিনি ও ইউডেমুস উভয়েই বিজয়ীদের হাতে নিহত হন। সিন্ধের সত্রপ পেইথনকে আন্টিগোনাস পুরস্কার হিসাবে ব্যাবিলনের শাসনভার অর্পণ করলেন; আরাকোসিয়ার শাসকপদে বহাল রইলেন সাইবারটিউস এবং আরিয়ার (হিরাট) সত্রপ বদল করা হলো। খ্রিস্টপূর্ব ৩১২ অব্দে গাজায় ইজিপ্টের টলেমির আঘাতে সিন্ধু অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ অবধি বিস্তৃত আন্টিগোনাসের শাসন প্রবল আন্দোলিত হলো (সেখানে টলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আন্টিগোনাসের পুত্র দিমিত্রিউসের তেতাল্লিশটি হাতি ছিল)'। এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে আলেকজান্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকাস ব্যাবিলন দখল করে নিলেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের সঙ্গে আন্টিগোনাসের সম্পর্ক ছিন্ন হলো। খ্রিস্টপূর্ব ৩১২ বা ৩১১ অব্দে সেলুকাসের এই সামরিক অভ্যুত্থানের সাফল্যে যদিও একটি যুগের সূচনা হলো, তবুও সেলুকাস সর্বদাই ব্যাবিলনের চতুর্দিকে তাঁর অবস্থান সুরক্ষিত করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রইলেন। এছাড়া আন্টিগোনাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছিল তাঁকে এবং হানা দিতে হচ্ছিল এশিয়া মাইনরে, সিরিয়ায়।

সম্ভবত এই সময়কালেই ভারতবর্ষের সীমান্ত-প্রদেশে নিযুক্ত মাসেডোনীয় সত্রপেরা অধিক মাত্রায় বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিল। আরাকোসিয়ার সত্রপ সাইবারটিউস এখন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আন্টিগোনাসের থেকে বিচ্ছিন্ন। পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের সময়কালে লবণাক্ত অঞ্চলের রাজা সোফিটেস (পূর্বে ১.২ দ্রষ্টব্য) একটি রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রার একদিকে শিরস্ত্রাণ পরিহিত সোফিটেসের আবক্ষ মূর্তি আর অপরদিকে গ্রিক পুরাণের চরিত্র সোফিতৌ (Sophytou বা Sophytes) এবং একটি মোরগ (চিত্র ১.২)। সেলুকাস প্রবর্তিত মুদ্রার অনুকরণেই

সম্ভবত মুদ্রাটি নির্মিত। সে কারণে এটি অবশ্যই খ্রিস্টপূর্ব উত্তর-৩১২ পর্বের ট্যাঁকশালে নির্মিত। সোফিটেস অবশ্য কোনো রাজকীয় উপাধি ধারণ করেননি। সে কারণে একজন স্বাধীন হেলেনীয় সত্রপের অতিরিক্ত কোনো পরিচয়ের দাবি তাঁর আর রইল না।

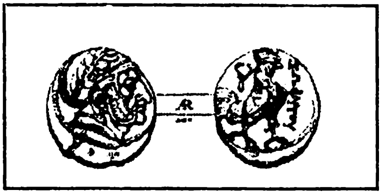

চিত্র ১.২ সোফিটেসের রৌপ্যমুদ্রা
সম্মুখভাগ:সোফিটেসের আবক্ষমূর্তি, সেলুকসের অনুকরণে মস্তকে শিরোস্ত্রাণ
পৃষ্ঠ ভাগ :মোরগ এবং গ্রীক পুরাকাহিনী!
সোফিটৌস (A Cunninghum-অনুসরণে)

মাসেডোনীয় শক্তির এই অবনমনের ফলেই শেষপর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের সামনে ক্ষমতা দখলের নতুন পথ উন্মুক্ত হলো। ''সেলুকাস যখন তার ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরার ভিত্তি স্থাপন করছেন'' (জাস্টিন) অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩১২ অব্দের পরবর্তী পর্যায়, সেই সময়েই মাসেডোনীয় 'বীরপুরুষ' এবং সোফিটেসের মতো আরও অনেক ভারতীয় সেনাপতিকে উৎখাত করে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বিজয় অভিযান শুরু করলেন (নিষ্কর্ষ ১.২ দ্রষ্টব্য)। এর পরবর্তীকালে পরাভূত নন্দ বংশের অধিকৃত এলাকায় নিজ শক্তিকে সংহত করার যথেষ্ট সময় তিনি পেলেন। জাস্টিনের বিবৃতি অনুসারে মনে হয় ভারতবর্ষীয় অঞ্চলসমূহ (অর্থাৎ সিন্ধু অববাহিকা) সরাসরি চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে এসেছিল। তবে, সিন্ধুর সীমান্তরেখায় অবস্থিত কিছু অঞ্চলও তাঁর রাজত্বের অন্তর্গত হওয়া সম্ভব।

ইজিপ্ট এবং গ্রিসের সঙ্গে আন্টিগোনাসের ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষে শেষপর্যন্ত ব্যাবিলনের সেলুকাস লাভবান হলেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের সত্রপদের পদানত করার সুযোগ পেলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দের পর তিনি এক বিরাট অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন এবং পূর্বদিকে ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীন সত্রপ স্টাসানোরের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ব্যাকট্রিয়াকে পদানত করে তিনি হিন্দুকুশ অতিক্রম করলেন (তিনি যে সিন্ধুনদও পার হয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য)। সম্ভবত তাঁর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ হয়নি। ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ স্থান এবং আফগানিস্তানে চন্দ্রগুপ্তের শাসন অনুমোদন করে তারা পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। যে সমস্ত অঞ্চলের অধিকার ছেড়ে দেওয়া হলো স্ট্রাবোর একটি অনুচ্ছেদে তাদের কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে পারোপামিসাদেই (হিন্দুকুশ এবং কাবুল অঞ্চল), আরাকোসিয়া ('আরাকোতোই') (কান্দাহার) এবং গেদ্রোসিয়া ('গেদ্রোসোই') (বেলুচিস্তান)। কাবুলের সন্নিকটে তিনটি স্থানে অশোকের আরমীয় শিলালিপি এবং কান্দাহারে তাঁর গ্রিক ও আরমীয় ভাষায় লিখিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হবার পর এইসব অঞ্চলে মৌর্য শাসন সংক্রান্ত প্রাচীন বিতর্কের অবসান হলো। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এদের মধ্যে আরিয়া (হিরাট)-এর উল্লেখ নেই।

এইসব অঞ্চলের ওপর নিজ-অধিকার ত্যাগ করার বিনিময়ে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের থেকে উপহার স্বরূপ ৫০০টি হাতি লাভ করেন। যেহেতু অতি সত্বর এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ইফসুসে আন্টিগোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে আরো পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর, সে কারণে চন্দ্রগুপ্তের এই উপহারটি তাঁর পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০১ অব্দ) সেলুকাস এবং তাঁর মিত্র লাইসিমাখুস-এর সম্মিলিত অধিকারের ৪৮০টি হাতি আন্টিগোনাসের ৭৫টি হাতিকে সংখ্যার বিচারে ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং এই ঘটনাটিই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে চূড়ান্ত প্রমাণিত হলো। আন্টিগোনাস পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে দিয়াদোচি বা উত্তরাধিকারীদের আগ্রাসী ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের অবসান হলো।

চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলুকাসের মৈত্রী-চুক্তি পরিশেষে বৈবাহিক বন্ধনে পরিসমাপ্ত হলো; কিন্তু কে কার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

এই মৈত্রীচুক্তির আর একটি ফলাফল হলো, সেলুকাসের দূত হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসের আগমন। মেগাস্থিনিস 'আরাকোসিয়ায় সেখানকার রাজ্যপাল সাইবারটিউস-এর সঙ্গে অধিক সময় অতিবাহিত করতেন এবং কথাচ্ছলে আমাদের এ কথাও জানিয়ে দেন যে, তিনি প্রায়শই ভারতীয় রাজা সান্দ্রাকোট্টাসের সঙ্গে দেখা করতে যান' (আরিয়ান, আনাবেসিস, V.৬)। এই বিবৃতিতে বোঝা যায় যে, নতুন রাজার আমলেও সাইবারটিউস আরাকোসিয়ার সত্রপ-পদে বহাল ছিলেন; আর পাটলিপুত্র ('পালিমবোথরা') অথবা ভারতবর্ষের যে-কোনো স্থানের অস্থায়ী শিবির— যেখানেই চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা হোক না কেন, সেখানে যাতায়াতের পথে মেগাস্থিনিসের বিশ্রামের স্বাভাবিক স্থানটি নিঃসন্দেহে আরাকোসিয়ার সীমান্ত-এলাকা; গ্রিক এবং মাসেডোনীয় জনগোষ্ঠীর একটি বিপুল অংশের বসতি সেখানে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্ভবত চার খণ্ডে লিখিত বিবরণ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে রেখে গিয়েছিলেন মেগাস্থিনিস। ভারতীয় ইতিহাসে এটি তাঁর এক মহান কীর্তি। তাঁর যে রচনা প্রায়শই 'ইন্ডিকা' নামে উল্লিখিত সেটি কালাবর্তনে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এর কিয়দংশ উদ্ধৃতি এবং স্মৃতিতে— বিশেষত দিয়োদোরাস সিকুলুস (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে), স্ট্রাবো (খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতকের শেষার্ধে) জ্যেষ্ঠ প্লিনি (c.খ্রিস্টাব্দ ৭৯) এবং আরিয়ান (c. ১৫০ খ্রিস্টাব্দ)-এর রচনায় বেঁচে রয়েছে। এইসব লেখকদের মধ্যে প্লিনি লিখতেন লাতিনে এবং অন্যগুলি গ্রিক ভাষায় রচিত। জনশ্রুতির আধারে রচিত অলীক কল্পনার বিচিত্র বর্ণনে তাঁর প্রবল আগ্রহের কারণে মেগাস্থিনিস হেলেনীয় লেখকের সঙ্গে নিজেকেও বিপন্ন করে তুললেন— অসংখ্য কাহিনী, যেমন মুখবিবর-হীন মানুষ, ইউনিকর্ন এবং অন্যান্য সব পশু, অবিশ্বাস্য চেহারা, তাদের আচার আচরণও তদ্রূপ— স্বর্ণসন্ধানী পিঁপড়ে ইত্যাদি। সম্ভবত

[illegible]দের রচনাকে আরো জীবন্ত করে তোলার উদ্দেশ্যেই তাঁর তুচ্ছ এই প্রয়াস। কিন্তু তাঁর বর্ণনার মধ্যে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তিনিই হলেন প্রথম গ্রিক লেখক, যিনি বহু বিবাহের উপস্থিতি এবং আজ আমরা যাকে 'বর্ণ' বলি, মোটামতো ভারতবর্ষের সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের নির্ধারিত পেশা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর জোড়-বাঁধা 'ব্রাখমানেস' এবং 'সর্মানেস' ভারতীয় দার্শনিকদের দুটি শ্রেণী হিসাবে আর একটি জোটের কথা প্রায়শই আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর করে তোলে— সেটি হলো অশোকের শিলালিপিতে খোদিত 'ব্রাহ্মণ এবং সমন' (গান্ধারী শ্রমণ)। অতএব ভারতবর্ষের সমাজ, মৌর্য প্রশাসন এবং অন্যান্য বিষয়, তিনি স্বয়ং যার সাক্ষী ছিলেন— এই সব প্রসঙ্গে তিনি যা কিছু বলেছেন, সবই আমাদের গভীর মনোযোগ দাবি করে (পরবর্তী ১.৬ এবং তৃতীয় অধ্যায় বিশেষ দ্রষ্টব্য)।

চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য বিজয়-অভিযানের মধ্যে গুজরাট এবং মালোয়ার প্রসঙ্গে সন্দেহাতীত প্রমাণ মেলে। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, 'সৌরাষ্ট্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুদর্শন হ্রদটি খনন করিয়েছিলেন 'মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত'-এর পক্ষে কর্মরত সে স্থানের রাজ্যপাল 'বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত'।' ঘটনাচক্রে অশোকের গিরনার শিলালিপিও ওই একই শিলাখণ্ডে স্থাপিত। গুজরাট কোনো ক্ষমতাসীন মগধকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর অধিকারে —এই তথ্য স্বভাবতই অবন্তীর (মালওয়া) পূর্ববর্তী অধীনতার ইঙ্গিত দেয়।

চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য বিজয়-অভিযান প্রসঙ্গে অসংখ্য অনিশ্চয়তার টানাপড়েন রয়ে গেছে— হয়ত তিনি সেগুলো জয় করেছিলেন— বিশেষত দাক্ষিণাত্য প্রসঙ্গে এমন কথা বলা হয়। তবুও যে রাজ্যই তিনি জয় করুন না কেন, সমগ্র উত্তর ভারত এবং আফগানিস্তানের বৃহত্তর অংশ নিজ-অধিকারে আনার ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্তের সাফল্য একটি অসধারণ সামরিক আরব্ধের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিভাত হয়। এই মানুষটি সম্পর্কে অবশ্য খুব সামান্যই জানা যায়। মেগাস্থিনিসের দাবি হলো, 'তিনি চন্দ্রগুপ্তের কাছে এবং তাঁর রাজসভায় অনেকবার গিয়েছিলেন। অবশ্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ পর্ব। কিন্তু তিনি যদি চন্দ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনাও করে থাকেন, 'ইন্ডিকা'-র প্রাপ্ত খণ্ডাংশে তার কোনো আভাসই মেলে না। স্ট্রাবো যখন একটি প্রতিবেদনে লেখেন যে, শিবিরে থাকাকালীন সচরাচর চল্লিশ হাজার মানুষ চন্দ্রগুপ্তের সহযোগী ছিলেন, তখন স্ট্রাবো মেগাস্থিনিস থেকে উদ্ধৃতি দেন। অবশ্য আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভাল এবং চুরির ঘটনা খুবই বিরল। সম্ভবত তিনি কড়া শাসক ছিলেন। এ বিষয়ে জাস্টিনের একটি প্রতিবেদনে রয়েছে যে, একদিকে পূর্ববর্তী অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার দাবি করছেন তিনি, আবার অন্যদিকে স্বয়ং বিজিত মানুষজনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে সমপরিমাণ দমন-পীড়ন চালাচ্ছেন (নিষ্কর্ষ ১.২)। তবে প্রচলিত এইসব গল্পকথার বিষয়ে যে কঠিন অনুসন্ধানের

প্রয়োজন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। স্ট্রাবো আমাদের বলেন যে, রাজা সর্বদা দাসী পরিবৃত থাকতেন এবং গুপ্ত ঘাতকদের বিভ্রান্ত করতে প্রায়শ রাতে শয্যা-কক্ষ পরিবর্তন করতেন। সম্ভবত এ তথ্যটির সূত্রও সেই মেগাস্থিনিস। তিনি প্রাসাদ ছেড়ে খুব কমই (কোনো সামরিক অভিযান ব্যতিরেকে) বাইরে যেতেন : যেমন বিচারের জন্য রাজসভায় যাওয়া; মন্দিরে পূজা দেওয়া; উৎসবে অংশগ্রহণ করা, অবশ্য সেখানেও তিনি যথেষ্ট রক্ষী-পরিবৃত থাকতেন; তাছাড়া নারী রক্ষী-পরিবৃত হয়ে শিকারে যেতেন।

প্রচলিত জৈন কাহিনীতে, চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত মন্ত্রী চাণক্য কেবলমাত্র জৈন পণ্ডিত (স্রবক) নন, বারো বছরব্যাপী দীর্ঘ মন্বন্তরের অভিঘাতে চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং রাজত্ব পরিত্যাগ করে একজন জৈন পরিব্রাজক রূপে দক্ষিণ দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং শেষাবধি কাহিনী নির্ধারিত পথের মধ্যে কর্ণাটকের কোনো এক স্থানে আত্মহত্যা করেন। গল্পটি তেমন যুক্তিসঙ্গত না হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। শ্রীলঙ্কার চিরাচরিত উপাখ্যানে এবং পুরাণে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পরিসর চব্বিশ বছর এবং তাঁর জীবিতকালেই তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে আসীন হন। এই ঘটনার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮ অব্দ (c.)।

১.৫ বিন্দুসার এবং অশোকের প্রথম পর্যায় (খ্রিস্টপূর্ব ২৬২ অব্দ c. পর্যন্ত)

বিন্দুসারের বিষয়ে যেসব তথ্য আমরা অবগত তন্মধ্যে একটি হলো, তিনি সম্ভবত অমিত্রঘট (অশোকের পিয়দসী উপাধির সঙ্গে তুলনীয়) উপাধি ধারণ করেন এবং মহান মাসেডোনীয় শক্তির সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। স্ট্রাবো (II.১.৯) জানান যে, সান্দ্রাকোট্টাসের (চন্দ্রগুপ্ত) পুত্র তথা উত্তরসূরির নাম 'অমিত্রখাদেস'; এবং সেলুকাসের রাজসভা থেকে মেগাস্থিনিসের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে একজন দূত পাঠানো হয়েছিল যাঁর নাম দেইমাখুশ। তিনিও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি বিবরণী লিখেছিলেন, সে রচনাটি নষ্ট হয়ে গেলেও, পরবর্তী গ্রিক লেখকদের নানান রচনায় কখনও কখনও দেইমাখুশের বিবরণের উদ্ধৃতি চোখে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ অব্দে সেলুকাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আন্টিওখুস আই সোতের (খ্রিস্টপূর্ব ২৮০-২৬২ অব্দ)। তাঁর কাছেও মিষ্টি সুরা ও শুকনো ডুমুর এবং একজন গ্রিক দর্শন-শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ জানাতে ওই 'অমিত্রখাতেস'-এর (এখানে বাননমি এরূপ লিখিত) দূত এসে পৌঁছল। কিন্তু শেষের অনুরোধটি রক্ষা করা গেল না। তবু গ্রিক দর্শন-শিক্ষার জন্য যে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল তার কিছু কৃতিত্ব বিন্দুসারের প্রাপ্য। প্লিনির মতানুসারে ইজিপ্টের টলেমি ফিলাডেলফুস (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৬ অব্দ)-ও ভারতবর্ষে দিওনিসিউস নামে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন— কিন্তু সেটা বিন্দুসার না অশোকের সময়কালে সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। তবে এই দৌত্য বিনিময়ের ঘটনা হেলেনীয় জগতে অশোক

প্রোরিত খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দের (ক্যা.) দৌত্য অভিযানের সঙ্গেই অধিক মানানসই। (টীকা ১.১ দ্রষ্টব্য)।

অশোকের শিলালিপির স্থান এবং লিখিত তথ্যের নিরিখে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ বিষয়ে যেটুকু তথ্য ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এর ভিত্তিতে আমরা যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, তাতে অনুমান করা যায় যে, বিন্দুসার কেবলমাত্র চন্দ্রগুপ্তের অধিকৃত এলাকাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণই করেননি, সম্ভবত নতুন অঞ্চলও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অমধ্র-দেরও (আধুনিক অন্ধ্র) তিনি নিশ্চয়ই পরাভূত করেছিলেন, কেননা অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অন্ধ্রদেরও সাম্রাজ্যের এক গোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মেগাস্থিনিসের থেকেই স্ট্রাবো এদের সম্পর্কে নানান তথ্য জানতে পেরেছিলেন এমন অনুমান করা যায়— এই অমধ্ররাই তিরিশটি সুরক্ষিত দুর্গ-শহরের অধিকারী ছিল। এছাড়া তাদের ছিল ১০০,০০০ পদাতিক সেনা, ২,০০০ জন অশ্বারোহী এবং ১,০০০টি হাতি। অতএব চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে তাঁরা নিশ্চয়ই একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছিল। বৌদ্ধ পুরাকাহিনী তক্ষশিলা আর উজ্জয়িনীর ওপর অশোকের নিয়ন্ত্রণের কথা আমাদের বলে। দিব্যবদন বলছে যে, তক্ষশিলায় একটি বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি অশোকের নিকট তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন। আর শ্রীলঙ্কার মহাবংশ (V. ৩৯) বলছে যে, বিন্দুসার যখন অন্তিম শয্যায়, তখন অশোক উজ্জয়িনীতে তাঁর রাজপ্রতিনিধি পদে আসীন ছিলেন।

পুরাণ অনুসারে, বিন্দুসার পঁচিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন; কিন্তু মহাবংশের (V.১৮) হিসাবে তাঁর রাজত্বকালের সময়সীমা আঠাশ বছর। শেষের মতটি গ্রহণ করলে (কেননা যে কোনো একটা তো পছন্দ করতেই হবে— টীকা ১.১ দ্রষ্টব্য) বিন্দুসারের মৃত্যু এবং অশোকের সিংহাসনলাভ খ্রিস্টপূর্ব ২৭০ অব্দের (c.) ঘটনা।

বৌদ্ধ পুরা কাহিনী আমাদের বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সংঘটিত রক্তক্ষয়ী হিংসার কথা জানায়। অশোক যে তরবারির আঘাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুমনসহ তাঁর ৯৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন, সে কাহিনী শ্রীলঙ্কার কালপঞ্জীতে দীপবংশ (৪০০ খ্রিস্টাব্দ (c.) এবং মহাবংশ (V. ১৮-২০, ৩৯-৪০) আমাদের জানা। অবশ্য দিব্যবদনের কাহিনীর 'যৌক্তিকতা তুলনায় কম। এখানে বলা হচ্ছে যে, অশোকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীম (এখানে নামটি এরকম) তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসার পূর্বে অশোক পাটলিপুত্র দখল করেন। তক্ষশিলায় একটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সুসীমকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল এবং সিংহাসনের দাবি জানাতে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তিনি নিহত হন।

সিংহাসনে আসীন হয়ে, অশোক 'দেবনামপিয় পিয়দসি রাজা'— এই উপাধি ধারণ করলেন। তাঁর শিলালিপিতেও এই নামটি চোখে পড়ে। অবশ্য সহজভাবে

রাজা অর্থে নৃপতি; দেবনামপিয় (দেবতাগণের প্রিয়) মৌর্য সম্রাটদের ব্যবহৃত উপাধি, কেননা অশোকের উত্তরসূরি দশরথও তাঁর গুহা-লিপিতে এই উপাধি ব্যবহার করেছেন। অতএব একমাত্র পিয়দসি ('সুদর্শন অথবা নয়নমনোহর আকৃতি)-ই ছিল সম্রাট হিসাবে অশোকের নিজস্ব উপাধি। দীপবংশ-ও তার সম্পর্কে কিছু বলতে এই উপাধিই ব্যবহার করেছে। মাইনর ১ নং অনুশাসনের মাস্কি শিলালিপিতে সর্বপ্রথম অশোকের নিজের নামটি ('অশোক') দেখতে পাওয়া যায়। এখন অবশ্য এই নামোল্লেখ সহ আরো অনেক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে : যেমন, গুর্জরে ওই একই অনুশাসন এবং নিত্তুর ও উদেগোলাম মাইনর প্রস্তর খণ্ডের দ্বিতীয় অনুশাসনের প্রতিলিপি। মাইনর শিলা অনুশাসন সম্ভবত অশোকের একেবারে প্রথম জীবনের অনুশাসন শিলালিপি। তাঁর পরবর্তী অনুশাসনগুলিতে তাঁর নিজের নাম আর কোথাও উল্লিখিত হয়নি।

বিবিধ বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ বৌদ্ধ পুরা-কাহিনীতে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্ববর্তী অশোক একজন অতীব নিষ্ঠুর শাসক হিসাবে চিত্রিত। অশোকের নিজস্ব শিলালিপিতে কিন্তু এ ঘটনার কোনো সমর্থন মেলে না। তাঁর ভ্রাতাদের কয়েকজন বেশ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল এবং প্রভূত সুযোগসুবিধা ভোগ করত। কেননা তাঁর পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে তিনি ভ্রাতা এবং ভগিনীদের গৃহস্থালিতে আধিকারিক নিযুক্তি সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর সিংহাসন লাভের পর থেকে বছরে একবার আপাতভাবে বন্দীমুক্তির আদেশ দিতেন, পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে এমন উল্লেখ রয়েছে। এই বন্দীমুক্তির ঘটনা নিয়মিতভাবে কিংবা কেবলমাত্র একবার যখনই হোক না কেন, অর্থশাস্ত্রেও এর অনুমোদন রয়েছে (II ৩৬.৪৪; XIII ৫.১১)।

অশোকের কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) বিজয়ে মৌর্য সাম্রাজ্য তার বিস্তৃতির সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল। বস্তুত যে ঘটনাকে 'ধম্ম' ও বৌদ্ধধর্মে উপনীত হওয়া এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ বদল হিসাবে অশোক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, সেই ঘটনার কোনো উল্লেখ তাঁর বিষয়ে বর্ণিত বৌদ্ধ পুরাকাহিনীতে পাওয়া যায় না। অতএব অশোক সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত তথ্য-সূত্রের অবাস্তবতার একটি ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তথ্যের জন্য অশোকেরই ত্রয়োদশ প্রস্তর-অনুশাসনের নিকটে আমরা ঋণী (নিষ্কর্ষ ১.৪)।

এই অনুশাসনে অশোক বলছেন যে, তিনি 'কলিঙ্গ' নামে অভিহিত মানুষজনকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু যে কোনো জনগোষ্ঠীকে এইভাবে চিহ্নিত করাই ছিল তাঁর অনুশাসনের স্বাভাবিক ধরন এবং প্রাচীনতর রচনাতেও এভাবেই অঞ্চলগুলি উল্লিখিত। এই বিশেষ তথ্যটি স্ট্রাবো মেগাস্থিনিসের থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বয়ানে চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল কলিংগেই (অথবা কলিঙ্গরা) ৬০,০০০ পদাতিক, ১,০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০টি হাতির অধিকারী ছিল। অতএব অশোককে নিশ্চয়ই

প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু অশোক যে কোনোভাবে প্ররোচিত হয়েছিলেন এমন কোনো উল্লেখ তাঁর অনুশাসনে নেই : তাঁর বক্তব্য হলো যে, শুধুমাত্র রাজত্ব জয়ের অভিলাষেই তাঁর অভিযান এবং আক্রমণের কারণ হিসাবে এই যুক্তিই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তাঁর শাসনকালের অষ্টম বছরে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ২৬২ অব্দে (c.) এই বিজয়-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল এবং অপরিমেয় হত্যাকাণ্ড ও দাসত্বের কাহিনী এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কথিত আছে যে, ১৫০,০০০ জন মানুষ যুদ্ধবন্দী হয়; ১০০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়; এবং বলাই বাহুল্য যে আরো অনেক মানুষ নিহত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। সংখ্যাগুলি সম্ভবত অতিকথন দোষে দুষ্ট; কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছিল, অশোকের অনুতপ্ত হবার পক্ষে তা যথেষ্ট। এর পরেই সামরিক আগ্রাসনের নীতি থেকে তাঁর জীবনের গতিপথ অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রয়াসের অভিমুখে পরিবর্তিত হয়। এমনকি তিনি তাঁর উত্তরসূরিদের ভবিষ্যতে কোনো 'নতুন বিজয়-অভিযান'-এর পরিকল্পনা না নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনে, সমস্ত মানুষ যারা ক্ষমার্হ তাদের ক্ষমা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তাঁর নতুন নীতি ছিল, 'ধম্ম'-এর বিজয় অভিযানে সচেষ্ট হওয়া। এর প্রকৃতি এবং বিবর্তনের বিষয়টি অধ্যায় ২.১-এ আলোচিত হবে।

এই সময়কালের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, অশোকের শিলালিপির প্রকৃত অবস্থানে এবং তন্মধ্যে উল্লিখিত ভৌগোলিক নির্দেশে সেই বিস্তৃতির বেশ স্পষ্ট রূপরেখা বিধৃত। দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট যে, এই সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশটি সেলুসিড সাম্রাজ্যের সীমারেখা স্পর্শ করেছিল। কেননা অ্যান্টিওখুশকে (প্রথম অথবা দ্বিতীয়) অশোকের একেবারে অব্যবহিত প্রতিবেশী বলা হয়েছে। কান্দাহারে, লাঘমানে (আফগানিস্তানের) এবং শাহবাজগরহি ও মানসেহরা (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান)-তে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশে মৌর্যসাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। এরই নিরিখে ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে (এবং পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে) ইওনুস এবং কম্বোজুস যে এই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই স্থান পেয়েছে, তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর যে মৌর্য-অধিকারে ছিল এ বিষয়টি পরিষ্কার নয়। কিন্তু কলসিতে (দেরাদুনের নিকটে, উত্তরাঞ্চল) উৎকীর্ণ প্রস্তরে এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রাপ্ত রুম্মিনদেই ও নীগোলি সাগর স্তম্ভলিপিতে প্রতিভাত হয় যে, হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ বরাবর অবস্থিত গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাংলাদেশের মহাস্থানের সরকারী শিলালিপি থেকে এই আভাস মেলে যে, বাংলারও অনেকাংশ মৌর্যদের পদানত হয়েছিল। পশ্চিমে, অশোকের গিরনার প্রস্তরলিপিতে এবং ১৫০ খ্রিস্টাব্দে

খোদিত রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে গুজরাটও মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে। উপদ্বীপের অভ্যন্তরে যথেষ্ট সংখ্যায় অশোকের শিলালিপি রয়েছে; কোঙ্কন যে এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার সাক্ষ্য বহন করছে মুম্বাই-এর সন্নিকটে সোপারায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপি। পূর্ব উপকূলে, উড়িষ্যায় অবস্থিত ধৌলি এবং জৌগড় অনুশাসন অশোকের কলিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির প্রস্তর-সাক্ষী। কর্ণাটক মালভূমিতে এবং দক্ষিণ অন্ধ্রে, অশোকের অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তামিলনাড়ু এবং কেরালায় একটিও অনুশাসনের সন্ধান মেলেনি। অশোকের দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ প্রস্তর-অনুশাসনে চোড়াস, পামদিয়াস, সতিয়াপুতাস এবং কেরালাপুতাস অঞ্চলগুলি এবং সেই সঙ্গে তামরাপামনি (শ্রীলঙ্কা)-কে তাঁর সাম্রাজ্যের বহিঃস্থ অঞ্চল হিসাবে উল্লেখিত। এর সঙ্গে আমাদের সন্ধানকার্যের তথ্যটি বেশ মিলে যায় (মানচিত্র ১.২ দ্রষ্টব্য)।

অশোকের সাম্রাজ্য যে বস্তুত 'বিশাল' (মহালাক) (চতুর্দশ প্রস্তর-অনুশাসন) ছিল সে বিষয়ে এই মৌর্য রাজার সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করতে পারি। এখন এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য কীভাবে পরিচালিত হতো সে বিষয়ে একটু দৃকপাত করা যাক।

১.৬ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

মৌর্য-শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে আমাদের প্রধান তথ্যসূত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে এইভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায়; (১) অশোকের অনুশাসনসমূহ, (২) প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন ভাষায় লিখিত মেগাস্থিনিসের বিবৃতি, (৩) অর্থশাস্ত্র, যার অংশবিশেষ মৌর্যযুগে, এমনকি কিয়দংশ প্রাক্-মৌর্য যুগে রচিত (টীকা ১.২ দ্রষ্টব্য)।

মৌর্য আধিপত্যের বিস্তৃতির কারণে, মৌর্য শাসনাধীন অঞ্চলগুলির উল্লেখে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'সাম্রাজ্য' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। অশোক নিজে মনে হয় তাঁর প্রথম মাইনর প্রস্তর-অনুশাসনে সাম্রাজ্যের উল্লেখে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাম 'জম্বুদ্বীপ' (জাম [জম্বু]-দ্বীপ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও যেমন তাঁর ত্রয়োদশ প্রস্তর-অনুশাসনে তিনি বিজিত (যে অঞ্চল জয় করা হয়েছে) এবং রাজবিসব (রাজকীয় এলাকা) শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু মূল রাজত্ব মগধের সঙ্গেই যুক্ত রইল : তাঁর বৈরাম অনুশাসনে নিজেকে 'মগধের রাজা' (রাজা মগধে) এই নামে বিশেষিত করেছেন। মৌর্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসন ছিল পাটলিপুত্রে (মগধের রাজধানী); মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় এটি পালিমবোথরা বা পালিবোথরা। পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনের গিরনার প্রতিলিপিতে অশোক 'পাটলিপুত্র' স্থলে 'এখানে' লিখেছেন। এর অর্থ হলো, এই শহর থেকেই অশোক তাঁর সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

অশোক তাঁর জীবনকে 'ধম্ম' (এ বিষয়ে ২.২ এবং ২.৩ দ্রষ্টব্য) অভিমুখে

পরিবর্তিত করার পর শাসন পরিচালনের প্রচলিত নিয়মের অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে নানান পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে মৌর্য রাজা স্বয়ং এবং তাঁর সরকার কীভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার কিছু সূত্র অশোকের অনুশাসনগুলিতে পাওয়া যায়। তিনি বলছেন যে, (অষ্টম প্রস্তর অনুশাসন) রাজারা প্রমোদ ভ্রমণে বিশেষত শিকারে যেতেন; নারীরক্ষী পরিবৃত চন্দ্রগুপ্তের শিকারে যাবার বর্ণনা আমরা মেগাস্থিনিসের রচনায় পাই (পূর্বের ১.৪ দ্রষ্টব্য)। রাজা যখন আহারে বসতেন কিংবা অন্তঃপুরে শয়নকক্ষে, জনসমক্ষে (গোয়ালঘরে), রথে আসীন বা ভ্রমণে ব্যস্ত থাকতেন তখন কোনো রাজকার্যেই তাঁকে বিরক্ত করার অনুমতি ছিল না (ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসন)। আরিয়ান অবশ্য মেগাস্থিনিসের রচনা উদ্ধৃত করে জানিয়ে দেন যে, চন্দ্রগুপ্ত সাধারণত বিচারসভায় সম্পূর্ণ একটা দিন অতিবাহিত করতেন এবং সে সময় তাঁর কিছু একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন জনসমক্ষে বিচারকালেই পূরণ করতে হতো যাতে বিচার সংক্রান্ত কাজ ব্যাহত না হয়।

সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে সম্রাটের নিজস্ব পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। পঞ্চম প্রস্তর-অনুশাসনে অশোক তাঁর নিজের যে গৃহস্থালির উল্লেখ করেছেন, সেই বিবরণে তাঁর ভ্রাতা, ভগিনী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরাও থাকতেন 'এখানে' (অর্থাৎ পাটলিপুত্রে, গিরনার প্রতিলিপিতে লিখিত) এবং বহিঃস্থ শহরগুলির দেখাশোনার জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করা হতো। এই সমস্ত রাজপুত্রের মধ্যে কয়েকজনকে (বিন্দুসারের রাজত্বে অশোকের অবস্থা তো এরকমই ছিল) বিভিন্ন প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধি এবং রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হতো। অশোকের পৃথক প্রথম প্রস্তর অনুশাসন (ধৌলি প্রতিলিপি) অনুসারে, একজন কুমার (রাজপুত্র, বিশেষত রাজার সন্তান) উজেনি (উজ্জয়ন)-র রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন। পাঙ্গুরারিয়া শিলালিপিতে সম্ভবত ইনি কুমারসাম্ব হিসাবে উল্লিখিত। দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে (ধৌলী প্রতিলিপি) তৌশালীতে একজন কুমারকে কথা বলা হয়েছে, যিনি সম্ভবত কলিঙ্গের রাজ্যপাল। সুভন্নগিরিতে (মাস্কির নিকটে?) একজন আয়পুত (আর্যপুত্র), যিনি প্রভুর পুত্র অর্থাৎ রাজকুমার, তিনি রাজ-প্রতিনিধি (মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের ব্রহ্মগিরি অনুশাসনসমূহ) নিযুক্ত ছিলেন। এইভাবে রাজধানী এবং প্রদেশসমূহ, উভয় স্থানেই শাসনদণ্ড ছিল সম্রাট-পরিবারের মুঠোয়। জীবনের সমস্ত আয়োজন উপকরণের ক্ষেত্রে, শাসনদণ্ডের এই নিয়ন্ত্রণে যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেত, তার সবটুকুই ভোগ করত রাজ-পরিবার। যত সম্পদ লাভ করা হতো সবই সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হতো : অশোকের দ্বিতীয় স্ত্রী (দেবী) কারুভকি আম্রকানন, আশ্রয়-ভবন, ত্রাণ-শিবির ইত্যাদি সবকিছুই দান করতে পারেন। এই সমস্ত দানকেই তিনি যথাযথভাবে একমাত্র নিজস্ব দান হিসাবে চিহ্নিত করতেন।

অশোকের শিলালিপির দুটি স্থানে পরিষ বা কাউন্সিল (সংস্কৃত পরিষদ)-এর

উল্লেখ আছে। ইয়ুটুস নাম্নী আধিকারিকদের রাজা যে আদেশ করতেন সেই আদেশ সূত্রায়িত করার দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত ছিল (তৃতীয় প্রস্তর অনুশাসন)। মহামাতদের (সংস্কৃত মহামাত্য) রাজা যে কাজের নির্দেশ দিতেন সে বিষয়ে কাউন্সিল বা পরিষদে কোনো মতানৈক্য ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তা রাজাকে জানানোর নির্দেশ ছিল (ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসন। নিষ্কর্ষ ২.৫)। সুতরাং পরিষদ এক অর্থে ছিল একটি ভারপ্রাপ্ত কমিটি যারা রাজার আদেশ কার্যকর করত। সুতরাং এরকম পরামর্শদাতা পরিষদ কিংবা অন্য কোনো কমিটি ছিল না যেটি রাজার অনুপস্থিতিতে স্বয়ং সিদ্ধান্তে কাজ করত। সে কারণে রাজাকে মন্ত্রণা দেবার জন্য অর্থশাস্ত্রে (I ১২.৬, ১৫.৪৭-৫৯, ১৯.১৩ ইত্যাদি) যে মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ রয়েছে, তার সঙ্গে এই মৌর্য পরিষদের কোনো লিখিত মতের আদান-প্রদান হতো না। মজার বিষয় এই যে, অশোকের শিলালিপিতে মন্ত্রী শব্দটিই কোথাও নেই। এমনকি তাঁর ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসনে যেখানে শব্দটি প্রত্যাশিত ছিল সেখানেও নেই।

মানচিত্র ১.২ মৌর্য সাম্রাজ্য : খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দ (c)

অশোকের প্রথম স্তম্ভ অনুশাসন থেকে মনে হয় যে, প্রশাসনিক আধিকারিক যারা উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন পদমর্যাদায় বিভাজিত ছিল, তাদের পুলিস (= পুরিষ, সংস্কৃত পুরুষ, লোক?) এই সাধারণ অভিধায় চিহ্নিত করা হতো। অশোকের শিলালিপিতে যেসব আধিকারিকের অধিক উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন 'মহামাত' এবং এরা যে উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিক তা অনস্বীকার্য। নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা সরাসরি এদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন (ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসন)। অতএব এরা মন্ত্রীদের সমতুল্য ছিলেন বলে মনে হয়। বেশ কয়েকজন পণ্ডিতও মনে হয় এই পরিষের অথবা পরিষদের সদস্যভুক্ত ছিলেন। তোসালি (কলিঙ্গ) এবং সুভন্নগিরি (দাক্ষিণাত্য) উভয়স্থানেই কুমার বা আয়পুত (শাসক-রাজপুত্র) এবং তাঁর সঙ্গে নিযুক্ত মহামাতকে রাজা একত্রে নির্দেশ দিয়েছেন (পৃথক প্রস্তর অনুশাসন ২য় : ধৌলি; মাইনর প্রস্তর অনুশাসন ১ম ব্রহ্মগিরি) অর্থাৎ প্রতিটি শাসক-রাজপুত্রের সঙ্গে যেন তাঁর মন্ত্রী হিসাবে একজন মহামাত সর্বদাই নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য শহর যেমন কলিঙ্গের সমপা এবং কর্ণাটকের ইসিলা ও উত্তর প্রদেশের কোশাম্বী, সেসব স্থানে মহামাতেরা স্বয়ং রাজ্য শাসন করতেন এবং সেইভাবেই তাদের সম্বোধন করা হয়েছে (পৃথক প্রস্তর অনুশাসন ১ম ও ২য় : জৌগড় মাইনর প্রস্তর অনুশাসন, ১ম ব্রহ্মগিরি এবং (ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন : এলাহাবাদ স্তম্ভ)। পরবর্তী মৌর্য যুগের সোহগৌড়া কাংস্য ফলকের অনুশাসনে দেখা যায়, সাভতির (শ্রাবস্তী) মহামাত স্বয়ং শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। অতএব আধিকারিকদের একটি বৃহৎ অংশ মহামাত এই পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন মনে হয় এবং এদের মধ্যে অনেকেই সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদে আসীন ছিলেন। অর্থশাস্ত্রেও (I ১০.৭, ১২.৪; II ৫.৫ ইত্যাদি) মহামাত্র অভিধায় ভূষিত আধিকারিকেরা সাধারণত মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক উভয়রূপেই অবতীর্ণ।

অশোকের অনুশাসনে অবশ্য কয়েকজন মহামাতকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর বিভিন্ন কাজের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের একদলকে দ্বাদশ প্রস্তর-অনুশাসনে ইথিধিয়াখা—মহামাত (সংস্কৃত স্ত্রীয়াধ্যক্ষ—মহামাত্র) অর্থাৎ নারীগণের অধ্যক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভবত এরা মহিলাদের প্রদত্ত অনুদান বা সাহায্যের বিষয়টি দেখাশুনা করত। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত (II ২৭.১) গণিকাধ্যক্ষ অর্থাৎ রাজসভার বারাঙ্গনাদের অধ্যক্ষ পদটির সঙ্গে এদের নিশ্চিতরূপেই তুলনা করা চলে না। সীমান্তে নিযুক্ত অমতা-মহামাতেরাও ছিলেন যাদের নির্ধারিত দায়িত্ব অবিশেষিত। (প্রথম স্তম্ভ অনুশাসন)। শহরে এদের ওপর বিচারবিভাগের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল কেননা পৃথক প্রস্তর অনুশাসন ১ম (ধৌলি)-এ তোসালিতে কর্মরত মহামাতকে আরো একটি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে— নগর-বিয়োহরক অর্থাৎ শহরের শাসক-বিচারক (ম্যাজিস্ট্রেট)। অর্থশাস্ত্রে এর সহযোগী আরেকটি পদ-নাম পাওয়া যায়— পৌরব্যবহারিক (V. ৩.৭)।

'ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন'-এর সারনাথ স্তম্ভ প্রতিলিপির, ক্ষতিগ্রস্ত অংশটিতেও পাটলিপুত্রের মহামাতের উল্লেখ রয়েছে। মেগাস্থিনিসের রচনা থেকে সংকলিত স্ট্রাবোর বিবরণে (নিষ্কর্ষ ১.৩) আমরা অবশ্য নগর-রাজধানীর সরকারী সংগঠনের বিষয়ে জানতে পারি। যে সমস্ত শহরের কথা আমাদের বলা হয়েছে সেসব স্থানের প্রত্যেকটিতে পাঁচজন আধিকারিকে গঠিত ছয়জন সদস্যের একটি দল নিম্নলিখিত অধিকারের ক্ষেত্রগুলি শাসন করত : (১) শিল্প-কারিগরি; (২) বিদেশী; (৩) জন্ম ও মৃত্যু, সংক্রান্ত সরকারী তথ্য ও রাজস্বের সংকলন; (৪) বাণিজ্য, ওজন ও পরিমাপ; (৫) বিক্রয়কালে জালিয়াতি প্রতিরোধ; (৬) বিক্রিত সামগ্রীর হিসাবে কর সংগ্রহ। সৈন্য সংগঠনের মতো এই বর্ণনাও অধিক পরিমাণে আদর্শ উপস্থাপনা মনে হয়। তবুও মৌর্যদের অধীনে, আধিকারিকদের দল সম্মিলিতভাবে এই কাজগুলির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকতেই পারে— বিষয়টি তেমন অসম্ভব কিছু নয়। তাছাড়া যুক্তির বিচারে অশোকের ষষ্ঠ প্রস্তর-অনুশাসনেও পরিষ বা পরিষদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণের নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে। পাঁচ সংখ্যার বিষয়ে অবশ্য প্রাচীনকালের শেষ পর্যায়ের পঞ্চকুলের প্রভূত প্রচলনের উল্লেখ করা যায়— এরা ছিলেন সেই 'পাঁচজন আধিকারিক, সমস্ত গণকার্যে যাদের উপস্থিতির প্রয়োজন হতো।'

অশোকের অনুশাসনে যে মৌর্য-সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না, তা মোটেই বিস্ময়কর নয়। শুধুমাত্র সারনাথের স্তম্ভ অনুশাসনে দুর্গের অধীনে ন্যস্ত জেলাসমূহ অর্থাৎ কোটাবিশয়ার উল্লেখ মেলে। এতে বোঝা যায় যে, জেলাগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যদলের বসতির কারণে দুর্গগুলি স্থাপিত হয়েছিল। প্লিনি এবং প্লুতার্ক উভয়েই চন্দ্রগুপ্তের ৬০০,০০০ পদাতিক সেনার কথা বলেছেন। প্লিনি অবশ্য এর সঙ্গে ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৯,০০০ টি হাতি যুক্ত করেছেন। সম্ভবত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেই তাঁরা এই পরিমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। সংখ্যাগুলি হয়ত কল্পনায় একটু বর্ধিত হয়েছে কেননা দিয়োদোরাস আমাদের একথাও বলেছিলেন যে, রাজার নিজস্ব তহবিল থেকেই পদাতিক, ঘোড়া এবং হস্তী অর্থাৎ সমগ্র সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ করা হতো।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ উদ্ধৃত করে স্ট্রাবো সামরিক সংগঠনের আরো বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। চারটি ভাগে বিভাজিত যে বাহিনীর কথা তাঁর বিবরণে বলা হয়েছে তার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের (২.৩০-৩৩) বয়ানের বেশ সঙ্গতি রয়েছে। সেনাবাহিনী চতুর্বর্গীয় : পদাতিক, ঘোড়া, শকট, হস্তী। বলগা বা লাগাম ব্যতিরেকেই অশ্ব ব্যবহারের কাহিনী যদি সত্য হয় তবে মানতেই হবে যে, এর ফলে অশ্বারোহী বাহিনীর কার্যকারিতাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সাঁচীর তোরণদ্বারে অশ্বের যে ভাস্কর্য রয়েছে তাতে স্পষ্টতই বলগা দেখা যায়; এ

কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে (চিত্র ১.৩)। যুদ্ধক্ষেত্রে শকটের সঙ্গে ঘোড়াগুলিকে যুক্ত করা হতো আর কুচকাওয়াজের সময় ষাঁড়ের দল রথ টানত। সারথি ছাড়াও রথে দুজন যোদ্ধা থাকতো (চিত্র ১.৪ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রতিটি হাতির পিঠে থাকত মাহুত আর তিনজন ধনুর্ধারী। স্ট্রাবোর বিবরণ থেকে জ্ঞাত (XV. ১.৫২) এইসব তথ্যে একটা বিষয় চোখে পড়ে যে, আলেকজান্ডারের মুখোমুখি যুদ্ধক্ষেত্রে রথের শোচনীয় যুদ্ধবিদ্যা প্রদর্শনের পরেও মৌর্য জমানায় রথের কার্যকারিতার প্রতি বিশ্বাস একইরকম বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা যথেষ্ট কার্যকারিতার সাক্ষর দিত। পরবর্তীকালের তামিল লোক-গাথায়, রথে ধাবমান মৌর্য বাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণের কথা, এ কারণে তাদের পাহাড় কেটে এগিয়ে আসার স্মৃতিচারণা সংকলিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে (X ৫.৩৬) একদল পদাতিক সেনার একক আক্রমণের কাহিনী রয়েছে (বর্ম পরিহিত সেনারা অগ্রভাগে, পশ্চাতে

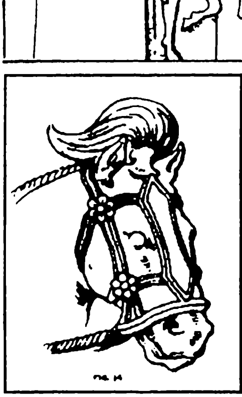

চিত্র ১.৩ (ক) অশ্বপৃষ্ঠে রাজকুমার, উত্তর-তোরণ, ১নং স্তূপ, সাঁচী খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক। অশ্বের রেকাব ও জিনের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়
(খ) অশ্বের বল্লা, পশ্চিম-তোরণ (F. C. Maisey-অনুসরণে)

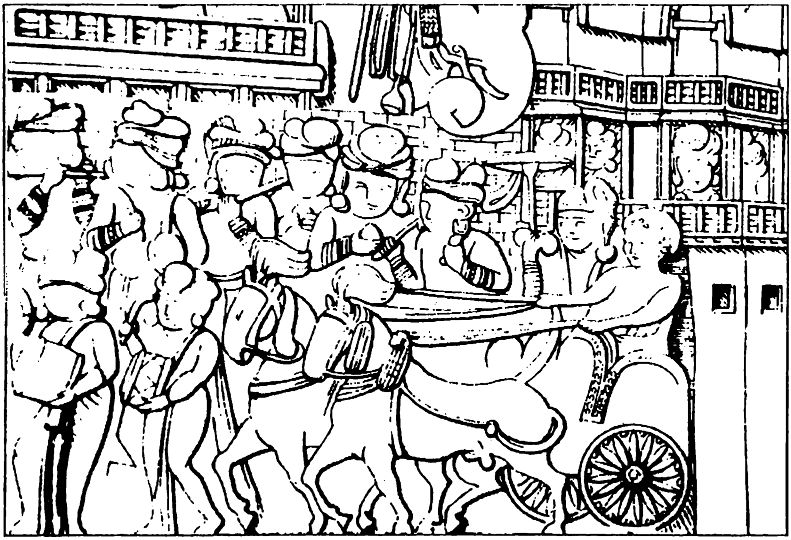

চিত্র ১.৪ রথ, উত্তর-তোরণ, ১নং স্তূপ সাঁচী (F. C. Maisey-অনুসরণে)

তীরন্দাজের দল), কিন্তু কোনো একটি স্থানেও মাসেডোনীয়-গ্রিক ব্যূহ (পূর্বের ১.২ দ্রষ্টব্য) সম্পর্কে একটি শব্দও লেখা হয়নি। অবশ্য উত্তর পশ্চিম থেকে আগত গ্রিক এবং হেলেনীয় গোষ্ঠীর ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সঙ্গে মৌর্য সেনাদলও যে যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম ব্যূহ সংস্থাপনে অভ্যস্ত ছিল, এমন অনুমান করা যেতেই পারে। বিধ্বংসী দারু-স্তম্ভ, প্রাচীর ভাঙার জন্য ঢেঁকি জাতীয় যন্ত্র, প্রস্তর-গোলক ছোঁড়ার দৈত্যাকার গুলতিবিশেষ অর্থাৎ আলেকজান্ডারের সামরিক যন্ত্র হিসেবে যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেই সামরিক 'এঞ্জিন'-এর উপস্থিতি প্রসঙ্গেও একইরকম অনুমান সম্ভব। এইসব প্রসঙ্গেও অর্থশাস্ত্রে কোনো উল্লেখের সন্ধান মেলে না। এমনকি যেখানে যুদ্ধের চলমান অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেওয়া হচ্ছে (II. ১৮.৬) অথবা কেমন করে দুর্গ আক্রমণ করতে হবে সে বিষয়ে সলাপরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সেখানেও এদের কোনো উল্লেখ নেই (XVIII. ৪.২৫-৫৩)। কিন্তু মৌর্য বাহিনীতে গ্রিক সৈন্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে যুদ্ধে ব্যবহৃত এইসব কলকৌশল অবশ্যই মৌর্য সেনাদলে প্রবর্তিত হয়েছিল। কেননা মেগাস্থিনিস (স্ট্রাবোর উদ্ধৃতিতে) গরুর গাড়িতে বহন করে আনা 'সামরিক এঞ্জিন'-এর কথা বলেছিলেন। তিনি অবশ্য 'রণতরীর অধিনায়ক'-এর উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এখন আমরা নিশ্চিত জানি যে, 'রণতরী' বলতে তিনি চিরাচরিত পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিশাল নৌবহর বোঝাতে চাননি; অর্থশাস্ত্রে II.২৪ যে জাতীয় নৌকার বর্ণনা আছে, তাদেরই উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

সেনাবাহিনীর সংঘটনের বিষয়ে, মেগাস্থিনিস (স্ট্রাবো বয়ানে উদ্ধৃত) এবং

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় পুরোপুরি অমিল লক্ষিত হয়। মেগাস্থিনিস চারটি কমিটির পাঁচজন সদস্যের কথা বলেছেন, যাদের প্রত্যেকে পৃথকভাবে পদাতিক, অশ্বারোহী, শকট ও হস্তীর দায়িত্ব ছিলেন এবং সেইসঙ্গে 'রণতরীর অধিনায়ক' আর 'গো-শকটের অধ্যক্ষ' এই দুটি গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করত। অর্থশাস্ত্র কিন্তু দুজন পৃথক অধ্যক্ষের কথা বলেছে। তারাই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান করত। এছাড়া অন্য কোনো গোষ্ঠীর উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে নেই। মৌর্য সেনাদলের সেনানায়ক কাঠামোর বিষয়ে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। পুরাণে কথিত (নিষ্কর্ষ ১.১) আছে যে, শেষ মৌর্য শাসক বৃহদ্রথকে তাঁর সেনাপ্রধান (সেনানী) সিংহাসনচ্যুত করেন; কিন্তু পূর্ববর্তী মৌর্য শাসকদের আমলে সেনাবাহিনীতে এরকম পৃথক কোনো পদ আদৌ ছিল কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

দুর্গের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রাজধানী পাটলিপুত্রে সম্ভবত সবচেয়ে ব্যাপক প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল। মেগাস্থিনিসের প্রতিবেদন (স্ট্রাবো এবং আরিয়ানের উদ্ধৃতিকে একত্রিত করলে) অনুসারে নদী বরাবর ৮০ স্টাদিয়া (১৪.৮ কিলোমিটার) এবং প্রস্থে ১৫ স্টাদিয়া (২.৮ কিলোমিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত শহরটি ৫৭০টি স্তম্ভ এবং ৬৪টি তোরণপথ সহ বিশাল কাষ্ঠপ্রাচীরে সুরক্ষিত— প্রাচীরগাত্রে তীরন্দাজদের জন্য নির্দিষ্ট ছিদ্র ছিল। আপাতভাবে স্থলভূমির প্রান্ত থেকে ৬০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৩০ ঘনফুট গভীর একটি পরিখা সমগ্র শহরকে বেষ্টন করে ছিল। দু'টি স্তরে খননের ফলে পুরাতত্ত্ব অন্তত একটি ভারী কাঠের বেড়ার অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে। কৌশাম্বীতে (কোসান, এলাহাবাদ জেলা, উত্তরপ্রদেশ) মাটি জড়ো করে নির্মিত মৌর্যযুগের একটি প্রতিরক্ষা স্তূপ রয়েছে। তক্ষশিলায় কাদামাটিতে নির্মিত একটি দুর্গ-প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটিও মৌর্যযুগের বলে মনে করা হয়।

প্রদেশের প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে, আমরা আবার অশোকের অনুশাসনের সাহায্য নিতে পারি। অশোক তাঁর পৃথক প্রস্তক-অনুশাসনের প্রথমটিতে বলেন যে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি মহামাতদের পরিভ্রমণে পাঠাতেন; উজেনেই (উজ্জয়িনী)-এর কুমার প্রতি তিন বছরে আধিকারিকদের একাজে পাঠাতেন এবং তক্ষশিলার কুমারও তাই করতেন। উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলার শাসক-প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান ছিল, সম্রাট তাঁর স্বনিয়ন্ত্রিত এলাকায় যা যা করতেন এরাও তাদের বিশাল অঞ্চলে সেই কাজগুলি করত। পৃথক প্রস্তর অনুশাসনের দ্বিতীয়টিতে (ধৌলি) 'প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে' উড়িষ্যায় অবস্থিত তোসালির কুমারের উল্লেখ রয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই কলিঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। অনুরূপে, ব্রহ্মগিরির মাইনর প্রস্তর-অনুশাসনগুলির (কর্ণাটক), প্রারম্ভিক বয়ানে সুভম্নগিরির যে আয়পুতের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিও নিশ্চয় এই উপদ্বীপের একাংশের রাজ্যপাল ছিলেন। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপি যেটি বেশ কিছু প্রামাণিক নথিপত্রের

ভিত্তিতে লিখিত এমন আভাস মেলে, সেখানেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে স্থানীয় এক রাজ্যপালের কথা বলা হয়েছে যিনি গিরিনগরের (গিরনার) সুদর্শন হ্রদ খনন করেছিলেন। তারপর অশোক মৌর্যের অধীনস্থ পরবর্তী যে রাজ্যপাল সেই হ্রদটির আরো উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তাঁরও উল্লেখ সেখানে রয়েছে। এই শিলালিপিতে এই দুই রাজ্যপালের নাম এবং জাতিগত পরিচয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, অন্তত এই দুটি ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের কোনো বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকারী ছিল না : চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপাল ছিলেন একজন বৈশ্য, পুষ্যগুপ্ত; অশোকের একজন 'গ্রিক প্রধান' (ইয়াভানরাজ), তুষাসফা। শেষোক্ত জনের নামোল্লেখে (প্রাচীন পারসিক, তুষাস্‌প) তিনি যে বস্তুত একজন হেলেনীয় ইরানী ছিলেন যে তথ্যের আভাস মেলে।

অশোকের শিলালিপি তার নিজস্ব ভাষাগত বিশিষ্টতার কারণে এইসব উপ-রাজকীয় এবং প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-এলাকার আঞ্চলিক সীমারেখা আরো নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে আমাদের সাহায্য করে। ব্রহ্মগিরির একসার মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের প্রারম্ভিক টীকা ভাগ্যক্রমে নষ্ট হয়নি। এই রচনার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই শিলালিপি পাঠে আমরা জানতে পারি যে, এইসব অনুশাসনের লিখিত বিবৃতি স্বয়ং রাজার প্রেরিত। প্রথমে রাজার কথা পৌঁছোয় সুভম্নগিরির (সম্ভবত মাস্কির নিকটে) আয়পুতের (শাসক-রাজপুত্র) সদর দপ্তরে। তারপর সেকথা আবার ইসিলা শহরে (ব্রাহ্মগিরির নিকটে) পরিবেশিত হয়। তাহলে অন্যান্য অনুশাসনের বক্তব্যগুলিও এই একইভাবে প্রথমে রাজদরবার থেকে শাসন-প্রতিনিধি এবং রাজ্যপালদের নিকটে গেল; এরপর বিভিন্ন স্থানে খোদিত করার জন্য অধীনস্থ আধিকারিকদের কাছে এইসব রাজানুশাসন তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন— ঘটনার অনুগমন বিচারে এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হওয়া যায়। আমরা দেখতে পাবো যে (৩.৪ এবং টীকা ৩.১) অশোকের শিলালিপিসমূহে, প্রাকৃতে রচিত একই অনুশাসনের অনেকগুলি ভাষিক বিভিন্নতা রয়েছে। এরই ভিত্তিতে শিলালিপিতে চারটি প্রধান কথ্য ভাষাকে শনাক্ত করা যায় : ক ('মগধী'), খ ('উজ্জয়িনী), গ ('পশ্চিমী') এবং ঘ (গান্ধারী বা 'উত্তর-পশ্চিমী')। এদের আবার তিনটি উপকথ্য-ভাষা রয়েছে ক^{১} (কলসি), ক^{২} (কলিঙ্গ) এবং খ^{১} (দক্ষিণী)। অনুমিত হয় যে, ক (মগধী) বাগধারার খোদিত অনুশাসন ব্যতিরেকে অন্য সবকটি ক্ষেত্রে এটি অনুবাদ করা হয়েছে অথবা বিভিন্ন প্রাদেশিক সদরদপ্তরে সরকারী কাজে ব্যবহৃত প্রাকৃত স্থানিক কথ্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার রচনাটিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে। যেহেতু রাজার স্বশাসিত অঞ্চলে যেখানে পাটলিপুত্র থেকে নিম্নতর আধিকারিকের নিকটে সরাসরি রাজাদেশ পৌঁছতে পারে, সেখানে এমন কোনো অনুবাদের প্রয়োজন হয়নি; অতএব ক কথ্য ভাষায় লিখিত সমস্ত অনুশাসনের ক্ষেত্রে, পূর্ব রাজস্থানের বৈরাট থেকে বাংলাদেশের

মহাস্থান পর্যন্ত প্রাপ্ত শিলালিপির প্রতিটি স্থানই প্রত্যক্ষভাবে রাজশাসিত ছিল এমন অনুমান করাই যায়। অতএব, বৈরাট অনুশাসনে স্ব উল্লেখে অশোকের 'মগধের রাজা' এই পরিচয়-ঘোষণা এখন এক নতুন অর্থ বহন করে। এই বিশিষ্ট উল্লেখে তিনি মগধ থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ-শাসিত বিশাল অঞ্চলকে বিশেষিত করতে চেয়েছেন। প্রাদেশিক শাসনক্ষমতার নিরিখে ক১ (কলসি) কথ্য ভাষার কোনো সন্তোষজনক বিবরণ দেওয়া যায় না। কিন্তু ক২ কথ্য ভাষায় রচিত উড়িষ্যা শিলালিপি পৃথক কলিঙ্গ রাজ্যকে উপস্থাপিত করে।

'খ কথ্যভাষা' সম্বলিত শিলালিপির দলটি মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশের গুজ্জর থেকে মুম্বাই-এর সন্নিকটে পশ্চিমী তটরেখায় অবস্থিত সোপারা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত রচনাই যদি উজ্জয়িনীর কুমারের মাধ্যমে বণ্টন করা হয় তাহলে এই শাসক-প্রতিনিধিত্বের পদটি যে কত বিশাল এবং সে কারণেই কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি আমরা বুঝতে পারি। খ১ কথ্যভাষার সন্ধান মেলে কর্ণাটকে। দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণের প্রভাবে রচনার শরীরে সুবিধানুযায়ী নানান পরিবর্তনের চিহ্ন দৃশ্যমান। সমস্ত খ১ কথ্যভাষায় রচিত বয়ান সুভন্নগিরী থেকে এসেছে এমন কথা আমরা অনুমান করতেই পারি। কিন্তু এই অঞ্চল বড় অদ্ভুত। এখানে ক এবং খ কথ্য ভাষায় রচিত অশোকের মূল রচনাটি রয়েছে। আবার সেইসঙ্গে ব্রহ্মগিরির অনুশাসনগুলি এমন একজন লিপিকার খোদাই করেছেন যিনি তাঁর সাক্ষর-চিহ্নে খরোষ্ঠী ব্যবহার করেছেন। অতএব এটি নিশ্চয়ই উত্তর-পশ্চিম এলাকা থেকে এসেছে। স্পষ্টতই এর পর থেকে সুভন্নগিরির শাসনাধীন অঞ্চল উজ্জয়িনীর শাসন এলাকার নিছক ব্যাপ্তি হিসাবে রইল না, সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে আধিকারিকেরা এখানকার কাজে নিযুক্ত হতে লাগল।

'গ' কথ্যভাষাটি সম্পূর্ণ এককভাবে গিরনার প্রস্তরলিপিতে উপস্থাপিত। বোঝা যায় যে, সৌরাষ্ট্র (এমনকি গুজরাট) মৌর্যদের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। গান্ধারে তক্ষশিলা-শাসন প্রসঙ্গে আমরা অশোকের দুটি অনুশাসনে 'ঘ' কথ্যভাষা দেখতে পাই (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানসেহরা এবং শাহবাজগরহি)। তক্ষশিলার আরকটি সরকারী ভাষা হলো আরমীয় ভাষা। কেননা, তক্ষশিলায়, কাবুলের সন্নিকটে দরুন্তায় এবং কান্দাহারে অশোকের অনুশাসনের আরমীয় ভাষায় কৃত অনুবাদ পাওয়া গেছে। শেষোক্ত স্থানটিতে আবার অশোকের অনুশাসনের গ্রিক প্রতিলিপিরও সন্ধান মিলেছে। আরমীয় শিলালিপিতে অশোকের উপাধি যেহেতু 'প্রিয়দর্শ', সে কারণে এরই পরিবর্তিত আকারে গ্রিক ভাষায় শব্দটি মগধী ভাষার 'পিয়দসি'-র স্থলে হয়েছে 'প্রিয়দর্শী'। অথচ মগধী রূপের অনুকরণে গ্রিক রচনায় শব্দটি 'পিয়োদসেস'। অন্তত আরমীয় ভাষায় লিখিত অনুশাসনটি তক্ষশিলা থেকে প্রেরিত এমন অনুমান করাই চলে। কেননা এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সিন্ধু-সংলগ্ন অঞ্চলে গান্ধারের এই রাজধানী-শহরটির শাসক-প্রতিনিধি অবশ্য বেশ

কিছু মাত্রায় ক্ষমতা ভোগ করত। অতএব একথা আমরা বলতেই পারি যে, অশোকের অনুশাসন থেকে প্রাদেশিক বিভাজনের যে চিত্র আমরা পাই, অনুশাসনের ভাষিক বিশেষত্বে তা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

মেগাস্থিনিস থেকে উদ্ধৃত করে, গ্রিক ঐতিহাসিক আরিয়ান অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে এবং দিয়োদোরাস একটু তির্যক সুরে স্বশাসিত অঞ্চলসমূহ এবং নগরীর উল্লেখ করেছেন, যাদের নিজস্ব 'শাসক-বিচারক' অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট ছিল এবং রাজার আধিকারিকের দল তাদের শাসন করত না। প্রকৃতপক্ষে, অশোক তাঁর পঞ্চম (নিষ্কর্ষ ২.৩) ও ত্রয়োদশ অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ১.৪) বিশেষভাবে এই নির্দিষ্ট মানুষজনের (এবং অঞ্চলসমূহের) বিষয়ে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে মনে হয় তারা যেন তাঁর সাম্রাজ্যের সাধারণ নিয়মে শাসিত অঞ্চলের প্রতিতুলনায় ভিন্ন কোনো স্থান অধিকার করে আছে। এরা হলো : (১) ইওনা, (২) কম্বোজ, (৩) গামধার (গান্ধার), (৪) রথিকা, (৫) পিতিনিকা, (৬) ভোজ, (৭) নভক (৮) নভপমটি (৯) অমধ্র, (১০) পরিম্ধ। এদের মধ্যে (১) এবং (৫) অশোকের পঞ্চম প্রস্তর-অনুশাসনে 'পশ্চিমের সীমানা' হিসাবে বর্ণিত। অবশ্য পাটলিপুত্রের নিরিখে বিচার করলে তেমনই হয়। (৫), (৭), (৮) এবং (১০) নম্বরের স্থান নির্দেশ করা যায়নি; অন্যগুলির জন্য ১.২ মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

অশোকের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং তাঁর নামে শাসিত এইসব অঞ্চলসমূহের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল, 'ইওন' অঞ্চল সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সে বিষয়ে কিছু আভাস পাওয়া যায়। কান্দাহারে গ্রিক শিলালিপি আবিষ্কৃত হবার পর 'ইওন' অর্থে যে তিনি আরাকোশিয়ার কথা বলেছেন সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না (১.১ মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এ প্রসঙ্গে স্মরণ (উপরিউক্ত ১.৪ দেখুন) করা যেতে পারে যে, অশোকের আরাকোশিয়ার রাজ্যপাল সাইবারটিউস সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের আমল থেকে ক্ষমতাসীন। কান্দাহারে গ্রিক বা আরমীয় শিলালিপির কোনোটিতেই সাইবারটিউসের কোনো উত্তরাধিকারীর নাম কিংবা রচনার কোনো অংশের এমনকি তার দপ্তরের কোনো উল্লেখ নেই। তিনি যে একজন অর্ধ-স্বাধীন সত্রপ আভাসেও এমন কোনো ছলনার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়নি, পূর্বোক্ত তথ্যে আমরা এই সংকেত পাই। অবশ্য কান্দাহারের দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনের গ্রিক অনুবাদে আধিকারিকদের কাজ সংক্রান্ত (ধম্ম-মহামাত ইত্যাদি) শেষ বাক্যদুটি অনুপস্থিত। এ বিষয়টিও লক্ষণীয়। আরাকোশিয়ার স্থানীয় প্রশাসনে বাক্যদুটির কোনো প্রাসঙ্গিকতা না থাকায় যেন ও দুটি বাদ পড়েছে। অনুরূপে কম্বোজেও (কাবুল অঞ্চল) আরমীয়-ব্যবহারকারী স্থানীয় ইরানী আধিকারিকদের ওপরেই শাসনভার বহুল পরিমাণে ন্যস্ত ছিল এমন হওয়াই সম্ভব। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, লাফম্যানের আরমীয় পথ-প্রস্তর লিপিতে উল্লেখিত রাজ্যপাল (skn), স্পষ্টতই ইরানীয়— ওয়াশাভ ('Whśw'), 'সারথি'। তাঁর অধীনস্থ বিচারকের নামটিও তদ্রূপ— ওয়াখসু-ফ্রিত

('wahswprt'), 'ভক্ষুদেবের অনুগৃহীত'। অন্যদিকে আবার গান্ধার রাজ্য, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল তক্ষশিলা, সেই গান্ধারের মতো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনাঞ্চল কেন যে এই বিশেষ অঞ্চলের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ল, তার ব্যাখ্যা দেওয়া সত্যিই কঠিন। যদি সেক্ষেত্রে অশোক অর্ধ-স্বশাসিত সত্রপের কথা না ভেবে কেবলমাত্র স্থানীয় সাংস্কৃতিক বা জাতিগত বিশিষ্টতা, যেমন ইরানী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে ভাবেন তবেই একমাত্র এটি সম্ভব হতে পারে।

বিশেষ অঞ্চলের তালিকা জানায় যে, অপর অঞ্চলসমূহে নিয়মিত প্রাদেশিক প্রশাসন বলবৎ ছিল। রাজ্যপালের সদরদপ্তরে এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে কীভাবে মহামাতদের নিয়োগ করা হতো ইতিপূর্বেই আমরা তা দেখেছি। তৃতীয় প্রস্তর অনুশাসনে সমগ্র সাম্রাজ্যে কর্মরত এইরকম তিন শ্রেণীর আধিকারিকের উল্লেখ রয়েছে : ইউত (ইউক্ত), রাজুক (রজ্জুক) এবং পদেসিক (প্রাদেশিক)। এরা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণে যেতেন। ইউতদের বিষয়ে আমরা জেনেছি যে, পরিষ বা পরিষদ রাজার যেসব আদেশকে সূত্রায়িত করত, তার প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ সারমর্ম সম্পর্কে এদের নির্দেশ দেওয়া হতো। অতএব, এরপরে নিশ্চয় রাজধানী থেকে দূরে নানান স্থানে এদের পাঠানো হতো।

রাজুক এবং পদেসিক, মনে হয়, প্রদেশে নিযুক্ত আধিকারিকের দল (এদেরই জন্য সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে 'দিন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে)। মাইনর দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে যে, রাজুক তাঁর অধীনস্থ একটি 'জনপদ'-এর মানুষজনকে 'ধম্ম'-এর নীতি বিষয়ে নানান নির্দেশ দেবে। এর অর্থ নিশ্চয় এই যে, ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে লিখিত অশোকের বিবৃতিতে যে বিশাল জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে একমাত্র ইওনদের অঞ্চল ব্যতিরেকে এমন কোনো জনপদ ছিল না যেখানে কোনো ব্রাহ্মণ বা সমন নেই। অষ্টম প্রস্তর অনুশাসনে, 'জনপদের মানুষজন' এই শব্দবন্ধটি মনে হয় রাজধানীর বাইরে বসবাসকারী মানুষজন, সঠিকভাবে বলতে গেলে, 'প্রাদেশিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অশোকের চতুর্থ এবং সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনের বিবৃতিতে (নিষ্কর্ষসমূহ ২.৬ এবং ২.৭) যখন বলা হয় যে তাঁর "রাজুকদের বেষ্টন করে আছে জনসাধারণ (জন), শতসহস্র মানুষ", তখন একটি জনপদের আয়তনের বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব আমরা অনুমান করতে পারি যে, একটি জনপদ ছিল বস্তুত একটি প্রদেশ অথবা একটি বিশাল উপ-প্রদেশ। চতুর্থ স্তম্ভ অনুশাসন থেকে একটি বিষয় স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, রাজুকেরা যাদের শাসন করত তাদের বিচার করা এবং শাস্তিদানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তারা ভোগ করত।

পদেশিক এবং রথিকদের (শেষোক্ত নামটি মাইনর দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে উল্লিখিত [ইয়েরাগুড়ি]) নামগুলি বিচার করলে (সংস্কৃত প্রদেশ এবং রাষ্ট্র) আঞ্চলিক বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সংযোগের বিষয়টি বোঝা যায়। এছাড়া তাদের সম্পর্কে

আর কিছুই বলা যায় না। বিষয়ান্তরে যাবার পূর্বে আর একটি কথাও উল্লেখ করা যায় যে, অর্থশাস্ত্রে এই দুটি পদের তুল্য কোনো সরকারী পদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

অশোকের ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত স্তম্ভ অনুশাসনের সারনাথ ভাষ্যে 'আহর' এবং 'বিশ্য' এই দুটি আঞ্চলিক উপ-বিভাজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। পরবর্তী শিলালিপিতে উভয় শব্দই জেলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শেষোক্ত শব্দটি একটি যৌগিক শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় সেটি হলো 'কোট বিশ্য' অর্থাৎ 'দুর্গ থেকে নিয়ন্ত্রিত জেলাসমূহ'। এই জেলাসমূহ সম্ভবত একটি উপ-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের বর্তমান আলোচনায় 'কোশাম্বী' হলো সেরকম একটি উপ-প্রদেশ। সেখানকার 'মহামাতগণ' রাজার নিজস্ব প্রদেশ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের আধিকারিকদের থেকে নানান নির্দেশ পেতেন।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে সাম্রাজ্যের রাজধানীর বাধ্যতামূলক অধীনতায় শৃঙ্খলিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বিশাল পরিকাঠামো। মেগাস্থিনিস (স্ট্রাবো মারফত) বলেন যে, প্রতি দশ স্টাডিয়া অন্তর পথ নির্মাণ এবং স্তম্ভ স্থাপনার জন্য ছিলেন আধিকারিকের দল। অশোকের স্তম্ভগুলি আকারে এত বিশাল ছিল যে রাজপথগুলিকে শুধুমাত্র চিহ্নিত করার কাজেই তাদের স্থাপন করা যেত। অবশ্য রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে তারা চিহ্নিত করতে পারত। অনুরূপে, শিলালিপিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পথের সন্নিকটে প্রোথিত হলেও দূরত্বের চিহ্ন নির্দেশক হিসাবে তাদের গণ্য করা চলে না। কিন্তু এ বিষয়ে মেগাস্থিনিস যে ভুল বলেননি, লাঘমানে (আফগানিস্তান) প্রাপ্ত দুটি আরমীয় শিলালিপিতেই তার প্রমাণ মেলে। উভয় শিলালিপিতেই একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে করপথি বা 'Krpty'-র (প্রাচীন পার্সী ভাষায় সেনারাজপথ) ওপরে তথ্য সংবাহক 'তীরচিহ্ন' রয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তর-অনুশাসন এবং সেইসঙ্গে সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে, পথ-ভ্রমণকে আরো আরামপ্রদ করার কাজে অশোকের আত্যন্তিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে অশোক পথের দুপাশে কূপ খনন ও বৃক্ষ-রোপণ করেছিলেন। (নিষ্কর্ষ ২.২ দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রেও পথের প্রসঙ্গকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে: বিভিন্ন ধরনের রাস্তার প্রস্থ কেমন হবে তার হিসাব (II ৪.৩-৫) এবং পথিপার্শ্বস্থ জমি দখল করলে জরিমানা ধার্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (III ১০.৫-৭)। পথের অভাব পূরণ করত জালের মতো বিন্যস্ত একটি গুপ্তচর বিভাগ। জনসাধারণের বিষয়ে সর্বদা তাঁকে অবহিত করানোর জন্য ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনে অশোক তাঁর 'প্রতিবেদকদের' (পতি-বেদক) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসন এবং প্রথম পৃথক স্তম্ভ অনুশাসনে প্রতি পাঁচ বা তিন বছর অন্তর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। মেগাস্থিনিসের মতে, পরিদর্শক ও গুপ্তচর সংখ্যা বিচারে এত বেশি ছিল যে সাতটি শ্রেণীতে বিভাজিত ভারতীয় সমাজে

এরাই ষষ্ঠ শ্রেণীটি গঠন করেছিল (দিয়োদোরাস, স্ট্রাবো এবং আরিয়ানের বিবরণ) (নিষ্কর্ষ ৩.১)। অর্থশাস্ত্রেও (I ১১-১৪) গুপ্তচরদের বিভাগটি বেশ কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। এইসব গুপ্তচরেরা শুধুমাত্র খবর সংগ্রাহক হিসাবেই কাজ করত না, এরই সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী এবং দালালদের প্ররোচিত করাও ছিল তাদের কাজ।

আর্থিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের মূল বক্তব্য হলো, জমি ছিল রাজ-অধিকারে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষ ভূস্বামী হতে পারত না। তাঁর রচনা উদ্ধৃত করে দিয়োদোরাসও বলছেন যে, রাজাকে ভূ-রাজস্ব বা কর এবং সেইসঙ্গে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ দিতে হতো। অন্যদিকে আবার স্ট্রাবো মেগাস্থিনিসের রচনার ভিন্ন অর্থ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, কৃষকেরা ভূমি কর্ষণের "মজুরি হিসাবে উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ পেত।" (একই শব্দ misthos—অর্থে ক্রমে কর থেকে মজুরিতে রূপান্তরিত হবার বিষয়টি রোমিলা থাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৩.১ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো যে, রাজার অধিকারের জমি এবং অন্য জমির মধ্যে অর্থশাস্ত্র সুস্পষ্ট পার্থক্য টেনেছে। এই রচনায় প্রথমোক্ত জমির ক্ষেত্রে কৃষকদের (সম্ভবত হাল-বলদ তাদের নিজেদের) উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবার প্রস্তাব করা হয়েছে (অর্ধসীতিকা)। কিন্তু যারা কেবলমাত্র কায়িক শ্রম দিত (স্বোয়াবীর্য পাজিবিন) অর্থাৎ ভাগচাষী, তারা কেবলমাত্র ফসলের চতুর্থ অথবা ষষ্ঠাংশের ভাগ পাবে এবং অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অথবা চতুর্থ-পঞ্চমাংশ রাজাকে দিতে হবে। খাজনা ছাড়া আর কোনো পৃথক অর্থ দিতে হতো না। অর্থশাস্ত্রেও (I ১৩.৬ এবং II ১৫.৩) উৎপন্ন ফসলে রাজার অংশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ ভাগের (ষড়ভাগ) উল্লেখ রয়েছে বটে কিন্তু এ প্রসঙ্গেও খাজনার চিরাচরিত বা প্রাচীন ধরনটির প্রস্তাবনা করা হয়েছে। অন্যত্র, (V ২.২) একটি এলাকা (জনপদ) থেকে রাজা যে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয় বা চতুর্থাংশ দাবি করতে পারে, সে বিষয়টি অর্থশাস্ত্রে একটি স্বাভাবিক উপায় হিসাবে বিধৃত হয়েছে। এই বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাজভূমি ব্যতিরেকে অন্যত্র খাজনা আদায়ের একটি আদর্শ মান ছিল। মেগাস্থিনিসের বক্তব্যের স্ট্র্যাবো কৃত ব্যাখ্যা এবং অর্থশাস্ত্রের রাজভূমিতে ভাগচাষীদের থেকে পুরোপুরি তিন-চতুর্থাংশ বা তারও অধিক রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাবনা, উভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে সে বিষয়টি স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর। রাজভূমির বাইরের জমি থেকেও যে রাজা রাজস্ব সংগ্রহ করতেন অর্থশাস্ত্রের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় দিয়োদোরাসের বিবরণে। আর অশোকের রুম্মিনদেই স্তম্ভ শিলালিপিতে আবার দিয়োদোরাসের বক্তব্যের সম্ভাব্য অনুমোদন রয়েছে। বুদ্ধের জন্মস্থানে, অশোক সে অঞ্চলের গ্রামগুলিকে বলি-মুক্ত (উবলিকে) ঘোষণা করেছিলেন এবং পৃথক একটি উৎপন্ন খাজনা হ্রাস করে সম্ভবত অর্থ-ভাগিয়া অর্থাৎ এক-অষ্টমাংশ (উৎপন্নের) খাজনা নির্দিষ্ট করেছিলেন। (নিষ্কর্ষ ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। প্রথমটি

আর কিছুই বলা যায় না। বিষয়ান্তরে যাবার পূর্বে আর একটি কথাও উল্লেখ করা যায় যে, অর্থশাস্ত্রে এই দুটি পদের তুল্য কোনো সরকারী পদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

অশোকের ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত স্তম্ভ অনুশাসনের সারনাথ ভাষ্যে 'আহর' এবং 'বিশ্য' এই দুটি আঞ্চলিক উপ-বিভাজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। পরবর্তী শিলালিপিতে উভয় শব্দই জেলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শেষোক্ত শব্দটি একটি যৌগিক শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় সেটি হলো 'কোট বিশ্য' অর্থাৎ 'দুর্গ থেকে নিয়ন্ত্রিত জেলাসমূহ'। এই জেলাসমূহ সম্ভবত একটি উপ-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের বর্তমান আলোচনায় 'কোশাম্বী' হলো সেরকম একটি উপ-প্রদেশ। সেখানকার 'মহামাতগণ' রাজার নিজস্ব প্রদেশ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের আধিকারিকদের থেকে নানান নির্দেশ পেতেন।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে সাম্রাজ্যের রাজধানীর বাধ্যতামূলক অধীনতায় শৃঙ্খলিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বিশাল পরিকাঠামো। মেগাস্থিনিস (স্ট্রাবো মারফত) বলেন যে, প্রতি দশ স্টাডিয়া অন্তর পথ নির্মাণ এবং স্তম্ভ স্থাপনার জন্য ছিলেন আধিকারিকের দল। অশোকের স্তম্ভগুলি আকারে এত বিশাল ছিল যে রাজপথগুলিকে শুধুমাত্র চিহ্নিত করার কাজেই তাদের স্থাপন করা যেত। অবশ্য রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে তারা চিহ্নিত করতে পারত। অনুরূপে, শিলালিপিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পথের সন্নিকটে প্রোথিত হলেও দূরত্বের চিহ্ন নির্দেশক হিসাবে তাদের গণ্য করা চলে না। কিন্তু এ বিষয়ে মেগাস্থিনিস যে ভুল বলেননি, লাঘমানে (আফগানিস্তান) প্রাপ্ত দুটি আরমীয় শিলালিপিতেই তার প্রমাণ মেলে। উভয় শিলালিপিতেই একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে করপথি বা 'Krpty'-র (প্রাচীন পার্সী ভাষায় সেনারাজপথ) ওপরে তথ্য সংবাহক 'তীরচিহ্ন' রয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তর-অনুশাসন এবং সেইসঙ্গে সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে, পথ-ভ্রমণকে আরো আরামপ্রদ করার কাজে অশোকের আত্যন্তিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে অশোক পথের দুপাশে কূপ খনন ও বৃক্ষ-রোপণ করেছিলেন। (নিষ্কর্ষ ২.২ দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রেও পথের প্রসঙ্গকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে: বিভিন্ন ধরনের রাস্তার প্রস্থ কেমন হবে তার হিসাব (II ৪.৩-৫) এবং পথিপার্শ্বস্থ জমি দখল করলে জরিমানা ধার্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (III ১০.৫-৭)। পথের অভাব পূরণ করত জালের মতো বিন্যস্ত একটি গুপ্তচর বিভাগ। জনসাধারণের বিষয়ে সর্বদা তাঁকে অবহিত করানোর জন্য ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনে অশোক তাঁর 'প্রতিবেদকদের' (পতি-বেদক) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসন এবং প্রথম পৃথক স্তম্ভ অনুশাসনে প্রতি পাঁচ বা তিন বছর অন্তর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। মেগাস্থিনিসের মতে, পরিদর্শক ও গুপ্তচর সংখ্যা বিচারে এত বেশি ছিল যে সাতটি শ্রেণীতে বিভাজিত ভারতীয় সমাজে

একটি পৃথক শ্রেণীটি গঠন করেছিল (দিয়োদোরাস, স্ট্রাবো এবং আরিয়ানের বিবরণ) (নিষ্কর্ষ ৩.১)। অর্থশাস্ত্রেও (I ১১-১৪) গুপ্তচরদের বিভাগটি বেশ কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। এইসব গুপ্তচরেরা শুধুমাত্র খবর সংগ্রাহক হিসাবেই কাজ করত না, তারই সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী এবং দালালদের প্ররোচিত করাও ছিল তাদের কাজ।

আর্থিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের মূল বক্তব্য হলো, জমি ছিল রাজ-অধিকারে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষ ভূস্বামী হতে পারত না। তাঁর রচনা উদ্ধৃত করে দিয়োদোরাসও বলছেন যে, রাজাকে ভূ-রাজস্ব বা কর এবং সেইসঙ্গে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ দিতে হতো। অন্যদিকে আবার স্ট্রাবো মেগাস্থিনিসের বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, কৃষকেরা ভূমি কর্ষণের "মজুরি হিসাবে উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ পেত।" (একই শব্দ misthos—অর্থে ক্রমে কর থেকে মজুরিতে রূপান্তরিত হবার বিষয়টি রোমিলা থাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৩.১ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো যে, রাজার অধিকারের জমি এবং অন্য জমির মধ্যে অর্থশাস্ত্র সুস্পষ্ট পার্থক্য টেনেছে। এই রচনায় প্রথমোক্ত জমির ক্ষেত্রে কৃষকদের (সম্ভবত হাল-বলদ তাদের নিজেদের) উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবার প্রস্তাব করা হয়েছে (অর্ধসীতিকা)। কিন্তু যারা কেবলমাত্র কায়িক শ্রম দিত (স্বোয়াবীর্য পাজিবিন) অর্থাৎ ভাগচাষী, তারা কেবলমাত্র ফসলের চতুর্থ অথবা ষষ্ঠাংশের ভাগ পাবে এবং অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অথবা চতুর্থ-পঞ্চমাংশ রাজাকে দিতে হবে। খাজনা ছাড়া আর কোনো পৃথক অর্থ দিতে হতো না। অর্থশাস্ত্রেও (I ১৩.৬ এবং II ১৫.৩) উৎপন্ন ফসলে রাজার অংশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ ভাগের (ষড়ভাগ) উল্লেখ রয়েছে বটে কিন্তু এ প্রসঙ্গেও খাজনার চিরাচরিত বা প্রাচীন ধরনটির প্রস্তাবনা করা হয়েছে। অন্যত্র, (V ২.২) একটি এলাকা (জনপদ) থেকে রাজা যে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয় বা চতুর্থাংশ দাবি করতে পারে, সে বিষয়টি অর্থশাস্ত্রে একটি স্বাভাবিক উপায় হিসাবে বিধৃত হয়েছে। এই বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাজভূমি ব্যতিরেকে অন্যত্র খাজনা আদায়ের একটি আদর্শ মান ছিল। মেগাস্থিনিসের বক্তব্যের স্ট্র্যাবো কৃত ব্যাখ্যা এবং অর্থশাস্ত্রের রাজভূমিতে ভাগচাষীদের থেকে পুরোপুরি তিন-চতুর্থাংশ বা তারও অধিক রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাবনা, উভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে সে বিষয়টি স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর। রাজভূমির বাইরের জমি থেকেও যে রাজা রাজস্ব সংগ্রহ করতেন অর্থশাস্ত্রের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় দিয়োদোরাসের বিবরণে। আর অশোকের রুম্মিনদেই স্তম্ভ শিলালিপিতে আবার দিয়োদোরাসের বক্তব্যের সম্ভাব্য অনুমোদন রয়েছে। বুদ্ধের জন্মস্থানে, অশোক সে অঞ্চলের গ্রামগুলিকে বলি-মুক্ত (উবলিকে) ঘোষণা করেছিলেন এবং পৃথক একটি উৎপন্ন খাজনা হ্রাস করে সম্ভবত অর্থ-ভাগিয়া অর্থাৎ এক-অষ্টমাংশ (উৎপন্নের) খাজনা নির্দিষ্ট করেছিলেন। (নিষ্কর্ষ ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। প্রথমটি

(বলি) সম্ভবত এক ধরনের রাজস্ব-কর। আর দিয়োদোরাস এবং অর্থশাস্ত্র উভয় স্থানেই উৎপন্নের এক-চতুর্থাংশ হারে খাজনার যে আদর্শ পরিমাণ স্থির করা হয়েছে তার অর্ধ পরিমাণ হ্রাসের ফলেই শেষোক্ত এক-অষ্টমাংশ খাজনা নির্ধারিত হয়েছিল।

অর্থশাস্ত্র, II ২৪.১৮, আবার উৎপন্নের 'জল (ভিত্তি)-ভাগ' (উদকাভাগ) কর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কৃষক যদি স্বয়ং বিভিন্ন উপায়ে ক্ষেতে জলসেচ করে তাহলে এই করের পরিমাণ ফসলের এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ হবে (অধ্যায় ৩.১ দ্রষ্টব্য)। করের এই হার বিশেষভাবে রাজার ব্যক্তিগত জমিদারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এমন কথা ভাবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কারণ সেখানে ইতিমধ্যেই ভাড়াটিয়া-কৃষকের থেকে ফসলের অর্ধাংশ নেওয়া হয়েছে। কাজেই অন্য কোনো হারে আবার রাজভূমিতে কর আদায় করা হবে এমন সংযোজন অসম্ভব। সাধারণ ভূমি-করের এটাই যদি সর্বোচ্চ সীমা হয়, তবে বিভিন্ন হারে কর নির্ধারণের একটি পদ্ধতি হিসাবেই একে গণ্য করা হবে। অর্থশাস্ত্রে বস্তুত এ বিষয়ে একটি সাধারণ বিবৃতি উপস্থাপিত হয়েছে (V ২.২)।

মেগাস্থিনিস থেকে আহৃত স্ট্রাবোর (XV ১.৫০) একটি অনুচ্ছেদে এবং ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে দেখা যায় যে, (পরবর্তী ৩.১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মৌর্য প্রশাসনও সেচের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি নির্মাণ করত। এ প্রসঙ্গে নানান ফলাফল ব্যক্ত করে অর্থশাস্ত্রে একটি সুপারিশও করা হয়েছে (II ১.২০-২২)। অবশ্য এই কাজ যে কতটা ব্যাপক ছিল কিংবা প্রশাসন এর খরচ মেটানোর জন্য অন্য কোনো বাড়তি করের বোঝা চাপাতো কিনা সে বিষয়ে জানার কোনো উপায় আমাদের নেই।

উৎপন্নের একটি বিশেষ ভাগে কর নির্ধারণের এই পদ্ধতিতে একটা বিষয়ই বোঝা যায় যে, প্রাথমিকভাবে 'সামগ্রী' রূপেই কর সংগৃহীত হতো। অতএব কর হিসাবে প্রাপ্ত এই ফসল রাষ্ট্রীয় শস্যাগারে মজুত রাখার প্রয়োজন হতো। প্রত্নলিপিতে লিখিত দুটি শিলালিপি— একটি অশোকের অন্তিম পর্বের অথবা তাঁর অব্যবহিত পরের যথা বাংলাদেশের মহাস্থান প্রস্তরফলক শিলালিপি (ভগ্ন) এবং উত্তর-পূর্ব উত্তর প্রদেশে সোহগৌড়ার কাংস-ফলক শিলালিপি (বয়ানটি সুরক্ষিত কিন্তু সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়)— উভয় লিপিতেই শস্যাগার সংক্রান্ত (কোথাগাল) সরকারী নির্দেশ রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার ত্রিতলও হতে পারে (চিত্র ১.৫ দ্রষ্টব্য)। ভবিষ্যৎ ঘাটতি সামাল দেবার জন্যেই আপাত বিচারে গম এবং অন্যান্য শস্য এখানে মজুত রাখা হতো।

এছাড়া সম্ভাব্য অন্য সব উৎস থেকে কর সংগৃহীত হতো। মেগাস্থিনিস (স্ট্রাবোর ভাষ্যে) আমাদের বলেন যে, হস্তশিল্পীরা কর দিত এবং সেইসঙ্গে শ্রম-পরিষেবার জন্যও কর ধার্য ছিল। রাজধানী নগরীতে জন্মমৃত্যুর ঘটনায় কর ধার্য করা হতো। আর বিক্রীত সমস্ত সামগ্রীর ওপর মূল্যের এক-দশমাংশ হারে কর দিতে হতো। স্থান সঙ্কুলানের কারণে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এবং এইরকম অন্যান্য শুল্কের বিষয়ে

অর্থশাস্ত্রে প্রদত্ত বিশদ বিবরণের আলোচনা এখানে করা সম্ভব হচ্ছে না (II ২১ এবং ২২)। সম্ভবত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে হস্তশিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যক্তির ওপর নির্ধারিত করের হারের প্রভূত পরিমাণে ভিন্নতা ছিল।

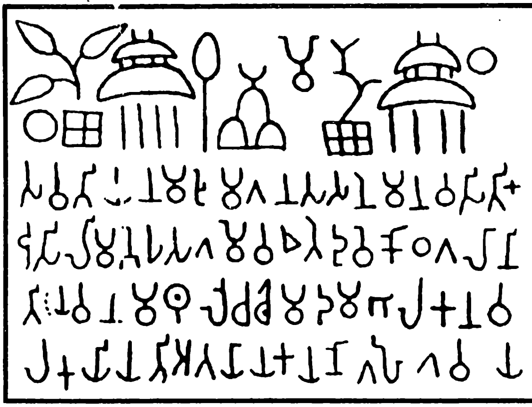

চিত্র ১.৫ সোহগৌরা তাম্রফলকে প্রদর্শিত শস্যাগার নীচে বয়ানের একটি বাক্য (D.D. Kosambi-অনুসরণে)

করের অন্তত একটা অংশ নিশ্চিত রূপে অর্থে সংগৃহীত হতো; মুদ্রা বিজ্ঞানের সাক্ষপ্রমাণে এখন প্রতিভাত যে, অন্ততপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই ছিদ্রযুক্ত রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল। তক্ষশিলার বীর স্তূপে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দের (c.) একটি মজুত ভাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে মুদ্রাবিজ্ঞানী প্রাক-মৌর্য মুদ্রা থেকে মৌর্য মুদ্রাকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থশাস্ত্রের একটি বিবৃতিতে (II ১২.২৪) দেখা যায় রাষ্ট্রীয় টাঁকশালায় ছিদ্র (লক্ষণ) আছে; অতএব এই মুদ্রা যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচলিত এ বিষয়টি অতীত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থশাস্ত্রের পরবর্তী বিবৃতিতে তামার একটি চতুর্থাংশ-সংকর ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ হলো মৌর্য-যুগের ছিদ্র-যুক্ত রৌপ্য মুদ্রা পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়। এ বিষয়টিও ৩.১ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মুদ্রাবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, মৌর্য পর্বে (খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দের c. পরে) বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রার সংখ্যা হ্রাস পেল— মুদ্রার কেন্দ্রীভবনের এ এক সংকেত যেখানে প্রতিটি মুদ্রাই পরিমাণে আরো বেশি সংখ্যক উপস্থিত।

স্পষ্টত সাম্রাজ্যের এই বিশাল শাসনযন্ত্রটি ক্রিয়াশীল রাখতে এক বিপুল আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন। সিন্ধু সভ্যতা এবং অশোকের সময়কালের মধ্যবর্তী পর্বে যে ভারতবর্ষে লিখন পদ্ধতি চালু ছিল এমন কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই। আর মেগাস্থিনিসের দৃঢ় ঘোষণা যে ভারতীয়রা লিখতে জানে না— এই ঘোষণা যতটা সম্মান পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব তার প্রাপ্য। (পরবর্তী অধ্যায়ে ৩.৪ দ্রষ্টব্য)। আর আমাদের বিচারে কোনো লিখিত বিবরণ ব্যতিরেকে, কোনো তথ্য লিপিবদ্ধ না করে সমগ্র সাম্রাজ্য কীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল সেটা বুঝতে পারা স্বাভাবিকভাবেই কঠিন। অবশ্য এ কাজ একেবারেই যে অসম্ভব তা নয়। পঞ্চদশ

শতাব্দীর শেষার্ধেও মেক্সিকোর আজটেক সাম্রাজ্য এবং পেরুর ইনকা সভ্যতা লেখনীর ব্যবহার ছাড়াই বেশ কাজ চালিয়ে নিয়েছিল। মৌর্যদের সম্ভবত বেশ শক্তিশালী একটা বাহিনী ছিল যারা ছিল স্মৃতির মজুত ভাণ্ডার। পুরোহিতরা যেমন সমস্ত ধর্মীয় রচনা স্মরণে রাখতেন, এরাও তেমনি সমস্ত কথিত তথ্য স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতো। ঘটনা যদি এরকম হয় তবে অশোকের রাজত্বকালের প্রথম পর্বে অথবা তারও সামান্য পূর্বে লেখনের আবিষ্কার এই সাম্রাজ্যের সংঘটন পর্যায়ে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ আরমীয় (এবং এর থেকে উদ্ভূত খরোষ্ঠী) এবং সেই সঙ্গে গ্রিক ভাষায় লিখন প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে মৌর্য আমলাতন্ত্রে মানুষজন নতুন নতুন আসার কারণেই সম্ভবত এই সাম্রাজ্যে লেখনের অভিঘাত এসে পড়েছিল (উপরের ১.১ দ্রষ্টব্য)। সর্বসমেত আমরা অশোকের সময়কালের আটটি বিশ্বাসযোগ্য নাম পাই : অশোক স্বয়ং, তাঁর দ্বিতীয়া রানী, তাঁর গর্ভজাত পুত্র, রাজপুত্র (কুমার) শাম্ব, এবং চারজন আধিকারিক। শেষের চারজনের মধ্যে দুজন আফগানিস্তানের লাঘমানে কমে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই ছিলেন স্থানীয় রাজ্যপাল এবং দুজনেরই ইরানী নাম (উপরে দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়টি অবশ্য বিস্ময়কর নয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, অন্য যে দুজন আধিকারিক ভারতবর্ষে কর্মরত ছিলেন তাঁরাও উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছিলেন : তুসাস্প, গুজরাটের হেলেনীয় ইরানী রাজ্যপাল; আর চাপাধা, এই করণিক অংশত খরোষ্ঠী ভাষায় লিখতেন, যদিও এর কর্মস্থল ছিল কর্ণাটক। আমাদের এই প্রামাণিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে যদি ঘটনাচক্রই একমাত্র নিয়ামক না হয়, তবে মৌর্য আমলাতন্ত্রে উত্তর-পশ্চিমাংশের মানুষজনের এই সংমিশ্রণ বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই সংমিশ্রণের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ফলাফল যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একথাও আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতেই হবে।

সারণি ১.১ কালপঞ্জী

	খ্রিস্টপূর্ব
মগধে নন্দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা	c. ৩৪৪
আলেকজান্ডারের উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ জয়	৩২৭-২৫
আলেকজান্ডারের মৃত্যু	৩২৩
নন্দদের উৎখাত; চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনারোহণ	c. ৩২২
চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সংযুক্তিকরণ	c. ৩১১-০৫
সেলুকাসের সঙ্গে চুক্তি; দূত হিসাবে মেগাস্থিনিসের আগমন	c. ৩০৫
চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু; বিন্দুসারের সিংহাসন লাভ	c. ২৯৮
বিন্দুসারের মৃত্যু; অশোকের সিংহাসনারোহণ	c. ২৭০
কলিঙ্গ বিজয়	c. ২৬২

নিষ্কর্ষসমূহ :

নিষ্কর্ষ ১.১

নন্দবংশ এবং মৌর্যবংশ: পূরাণের অংশবিশেষ

নন্দগণ

শূদ্ররমণীর গর্ভে (শেষ শিশুনাগ রাজা) মহানন্দের পুত্র হয়ে জন্মাবেন রাজা মহাপদ্ম, তিনি সকল ক্ষত্রিয়কে ধ্বংস করবেন। তারপর থেকে রাজা হবেন শূদ্র বংশের। তিনি হবেন একচ্ছত্র সম্রাট, সকলকে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনবেন। তিনি পৃথিবীতে থাকবেন ৮৮ বছর (কোন কোন পাঠে লেখা আছে ২৮ বছর)। ভবিষ্যতের সৌভাগ্যে প্রণোদিত হয়ে তিনি সকল ক্ষত্রিয়দের নির্মূল করবেন। তাঁর আট সন্তান, এবং তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুকল্প (বা সহাল্য), এবং তারা মহাপদ্মের উত্তরসূরী হিসাবে দ্বাদশ বর্ষ রাজত্ব করবেন।

কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করবেন; এবং শত বৎসর ধরণীকে উপভোগ করার পর তা (ধরণী) মৌর্যদের অধিকারে যাবে।

মৌর্যগণ

কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করবেন। চন্দ্রগুপ্ত রাজা থাকবেন চব্বিশ বৎসর। বিন্দুসার রাজা থাকবেন পঁচিশ বৎসর। অশোক রাজা থাকবেন ছত্রিশ বৎসর। তাঁর পুত্র কুণাল রাজত্ব করবেন আট বছর। কুণালের পুত্র বন্ধুপালিত আটবছর রাজ্য ভোগ করবেন।

এই দশজন [খ ভাষ্য অনুসারে নয়জন] মৌর্য ১৩৭ বৎসর ধরে ধরণীকে উপভোগ করবেন। তাদের পরে তা (ধরণী) শূঙ্গদের হাতে যাবে।

ভাষ্য ক

[মৎস এবং বায়ু (ভাষ্য)]

তাঁদের (?) পৌত্র দশোনা রাজত্ব করবেন সাত বৎসর। তাঁর [অশোকের] পুত্র দশরথ রাজত্ব করবেন আট বৎসর। তার পুত্র সম্প্রতি রাজত্ব করবেন নয় বৎসর। শালিশুক তেরো বছর রাজা হবেন। দেবধর্মন সাত বৎসর রাজা হবেন। তাঁর পুত্র শতধনভ [শতমধনুস] রাজা হবেন আট বৎসর। বৃহদ্রথ রাজত্ব করবেন সত্তর [?৭] বৎসর।

ভাষ্য খ

বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড

বন্ধুপালিতর উত্তরাধিকারী ইন্দ্রপালিত দশবৎসর রাজত্ব করবেন। তাঁর পুত্র শতধনুস আট বছর রাজা হবেন। বৃহদ্রথ সাত বৎসর রাজা হবেন।

সেনাপতি শূঙ্গমিত্র বীরভদ্রকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন এবং রাজা হিসাবে ৩৬ [বা ৬০] বৎসর শাসন করবেন।

[F.E. Pargiter-এর অনুবাদ অংশত সংশোধিত।]

নিষ্কর্ষ ১.২

চন্দ্রগুপ্তের উত্থান : জাস্টিন

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য তার সঙ্গীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবার পর [সেলুকাস নিকাটর] অনেক যুদ্ধ করেন। প্রথমে তিনি ব্যাবিলন দখল করেন, তারপর এই সাফল্যের জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি ব্যাকট্রিয়দের শাসনে আনেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে যান। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সেটা যেন দাসত্বের জোয়ালটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল এবং তার নগরপালকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। সান্দ্রাকোট্টস ছিলেন একজন নেতা যিনি তাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন; কিন্তু বিজয়ের পর স্বাধীনতার হোতা সংজ্ঞা বদলে হল বশ্যতার হোতা। সিংহাসন দখল করার পর থেকে যে মানুষদের তিনি বিদেশী কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন বশ্যতা আনতে তিনি তাদেরই দমন করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন নীচ বংশ জাত। কিন্তু এ গূঢ় ইচ্ছায় নিজেকে রাজকীয় উচ্চাভিলাষে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন অশিষ্টতার জন্য তিনি নন্দ্রুসের বিরক্তি উদ্রেক করেছিলেন এবং রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি দ্রুত পলায়নের মধ্যে দিয়েই নিজেকে রক্ষা করেন। দুর্ভাগ্যকে কাটিয়ে উঠে যখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন তখন বিশালাকার এক সিংহ তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষটির দিয়ে এগিয়ে আসে। তার কশ দিয়ে লালা ঝরছিল, তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শান্তভাবে চলে যায়। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রথম তাকে সিংহাসন লাভ করবার আশায় উদ্বুদ্ধ করে আর সেইজন্যেই তিনি একদল দস্যুকে জোগাড় করলেন এবং ভারতীয়দের এক নতুন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা করতে প্ররোচিত করলেন। পরে যখন তিনি আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এক বিশাল দানবাকৃতি হাতি তার দিকে এগিয়ে আসে যেন সেটা তার নিজের পোষা হাতি এবং তাকে পিঠে বসায় এবং সৈন্যবাহিনীর সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে ও যুদ্ধক্ষেত্রে তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। এইভাবে সিংহাসন জয় করে সান্দ্রাকোট্টাস ভারতবর্ষের অধিকার পেলেন। সেলুকস তখন তার ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করছিলেন। সেলুকস তার সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং (অন্যদিকে) পূর্বে তার অবস্থান ঠিক করে আন্টিগোনাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে গেলেন।

(J.W. McCrindle এবং Thomas R. Trautman-এর অনুবাদ অনুসরণে)

নিষ্কর্ষ ১.৩

পাটলিপুত্রের পৌরশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের বিবরণ (স্ট্রাবো XV.১.৫১ থেকে)

নগরের দায়িত্বে ছিল পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে গঠিত ছটি সংস্থার ওপর। প্রথমটির দায়িত্ব ছিল শ্রম শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ; দ্বিতীয়টির দায়িত্ব ছিল আগন্তুকদের দেখভাল করার। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা, তাদের নিযুক্ত করা, চাকরদের সাহায্যে তাদের জীবনযাত্রার ধরন লক্ষ্য করা, এবং তাদের নিরাপদে দেশের বাইরে যেতে সাহায্য করা। কিংবা যদি তারা মারা যায় তাহলে তাদের সম্পত্তি তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া, অসুস্থতার সময় তাদের দেখভাল করা এবং মারা গেলে তাদের কবর দেওয়া। তৃতীয় সংস্থার দায়িত্ব জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা, কেবল কর বসানোর উদ্দেশ্যে নয় উঁচু-নীচু নির্বিশেষে জন্ম ও মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যেও বটে যাতে না কোন কিছু লুকোনো থাকে। চতুর্থটির কাজ ছিল খুচরো বিক্রয় বা বিনিময় ব্যবস্থা দেখাশোনা করা। তার সদস্যরা ওজন এবং পরিমাপনের দায়িত্বে ছিল এবং দেখতো সময়কালের ফসল যেন লোকসমক্ষে বিক্রি হয়। কোন মানুষকেই নানান জিনিসপত্র নিয়ে কাজ কারবার করতে দেওয়া হতো না, যদি না সে দ্বিগুণ কর দিতো।

পঞ্চম সংস্থা উৎপাদিত দ্রব্যগুলির তদারক করতো আর জনসমক্ষে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতো। নতুনগুলো পুরোনো থেকে আলাদাভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হতো। পুরোনোর সঙ্গে মিশিয়ে নতুন দ্রব্য বিক্রয় করলে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ষষ্ঠ সংস্থা যাদের নিয়ে গড়া হত তাদের কাজ ছিল বিক্রি-হওয়া জিনিসের মূল্যের এক দশমাংশ আদায় করা। এই কর ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যু। এই সব কাজ সংস্থাগুলো আলাদা আলাদা ভাবে করত। যৌথ দায়িত্বে ছিল তাদের বিশেষ বিভাগের কাজ এবং জনগণের মঙ্গলজনক নানান ব্যাপার, যেমন সরকারি পূর্ত কাজগুলো, মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার, বন্দর ও মন্দিরগুলোর দেখাশোনা করা।

(J.W. McCrindle-কৃত অনুবাদ)

নিষ্কর্ষ ১.৪

অশোকের প্রস্তর অনুশাসন XIII

আট বছর রাজত্ব করার পর রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী কলিঙ্গ জয় করেন। একশত সহস্র মানুষের দেড়গুণ আত্মহারা (বন্দী) হয়, এক শত সহস্র (যুদ্ধে) আহত হয় এবং প্রায় সমসংখ্যক মারা যায়। কলিঙ্গ বিজয়ের পর দেবনামপিয়র মধ্যে ধম্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, ধম্ম কামনা এবং ধম্মের নির্দেশ জারির ইচ্ছা জেগে ওঠে। কলিঙ্গ জয়ের পর দেবনামপিয়র মধ্যে দেখা দেয় তীব্র অনুশোচনা। বিজিতদের কাছে বিজয়

বলতে বোঝায় জনগণের হত্যা, মৃত্যু এবং আত্মহারা (বন্দী) হওয়া। দেবনামপিয় একে মনে করলেন খুব যন্ত্রণাদায়ক এবং খুব দুঃখজনক (ঘটনা)। যারা যেখানে বাস করছে সেইসব ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী এবং অন্য উপগোষ্ঠি (pasamdas) এবং গৃহস্থরা যাদের মধ্যে ঐ স্থানের প্রতি আনুগত্য এবং পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য আছে যারা বন্ধুভাবাপন্ন, যাদের মধ্যে বয়স্কদের প্রতি আনুগত্য আছে, দয়া আছে এবং যারা বন্ধুদের সঙ্গে, পরিচিতদের সঙ্গে, সঙ্গীদের সঙ্গে, আত্মীয়দের সঙ্গে এবং দাস ও ভৃত্যদের সঙ্গে নিগূঢ় সখ্যতায় বাধা, তারা এই আঘাত হত্যা ও প্রিয় বিচ্ছেদ ভোগ করছে সেটা দেবনামপিয়র কাছে আরো বেদনাদায়ক বা যারা (নিজেরা) যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করে (সুভিহিতিনাম), বা যাদের (নিজেদের) মধ্যে চিরন্তন (অক্ষয়) বন্ধু, পরিচিত, সঙ্গী ও আত্মীয় প্রীতি আছে, যারা দুর্ভাগ্যের আঘাত পেয়েছে তারাও ক্ষত যন্ত্রণা ভোগ করছে। সকল মানুষের কাছে এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং দেবনামপিয়র কাছে এটা বেদনাদায়ক বিষয়।

যবন (গ্রীক) দের ছাড়া সব এলাকাতে (জনপদে) ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর দল থাকতো, সব জনপদেই মানুষরা কোন না কোন গোষ্ঠিতে, তা পূর্বে উল্লেখিত না হলেও, সম্পর্কযুক্ত ছিল। সুতরাং যখন কলিঙ্গবাসী পরাজিত হল, যদি তাদের এক শতাংশ বা এক সহস্রাংশ মানুষ আহত হয়, নিহত হয় বা বন্দী হয় তাহলেও দেবনামপিয়র কাছে সেটা ছিল বেদনার বিষয়।

আজকের দিনে যদি কেউ ক্ষতিকর কাজ করে তাহলে যদি তাকে ক্ষমা করা যায় তাহলে দেবনামপিয় তাকে ক্ষমা করবেন। এমনকী দেবনামপিয়র রাজ্যসীমা (বিজিত)র মধ্যেকার জঙ্গলের (অটভি) [অধিবাসীদের], তিনি শান্ত করতে চেয়েছিলেন এবং পক্ষে টেনে আনতে প্ররোচিত করেছিলেন। দেবনামপিয়র ক্ষমতা ও অনুশোচনার কথা তাদের জানানো হয়েছিল যাতে তারা লজ্জিত হয় ও তাদের হত্যা না করা হয়। দেবনামপিয়র ইচ্ছা ছিল যাতে সকল প্রাণী অনাহত থাকে, আত্মনিয়ন্ত্রিত থাকে, নির্লিপ্ত এবং স্থায়ী হয়। এটা অর্জন করাই হচ্ছে দেবনামপিয়র প্রকৃত বিজয়— ধম্ম বিজয়।

পুনরায় দেবনামপিয় এটা জয় করেন এখানে [তাঁর রাজ্যসীমার মধ্যে] এবং সকল প্রতিবেশী রাজন্যদের মধ্যে যেখানে কমবেশি ছয় শত যুজানাশ (রাষ্ট্রবর্গ) তাদের যবন রাজা অ্যানিটখুশ, এবং অ্যানিটখুশ এর তলায় ছিল চারজন রাজা যথাক্রমে টলেমি, অ্যান্টিগোনাস, মগস এবং আলেকজান্ডার, এবং সেইরকম অন্যদিকে ছিল চোড়াস ও পামডিয়াস থেকে তম্বপামনি পর্যন্ত।

সেইরকম রাজ্যসীমার মধ্যে ইয়োনা, কাম্বোজ, নাভক-নাভপামতিস, ভোজ-পিটিনিকাস এবং অমধ্র-পরিমদাস এইসব জায়গায় তারা ধম্ম সম্পর্কে দেবনামপিয়র নির্দেশ অনুসরণ করে। এমন কি যেখানে দেবনামপিয়র দূতরা যায় না সেখানে ধম্ম

সম্পর্কে দেবনামপিয়র ঘোষিত আদেশ এবং ধম্মের নির্দেশ শুনে তারা অনুরূপ কাজ করে বা করতে শুরু করে। এইভাবে শ্রেষ্ঠ বিজয় অর্জিত হয়। এই শ্রেষ্ঠ জয় আনন্দ নিয়ে আসে— এই আনন্দ পাওয়া যায় ধম্ম-বিজয়ের দ্বারা। কিন্তু এই জয় একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার। দেবনামপিয় চিন্তা করতেন কিভাবে পৃথিবীতে মহৎ ফল লাভ করা যায়।

এই উদ্দেশ্যে এই ধম্ম-অনুশাসন লিখিত হয়েছে যাতে আমার পুত্ররা এবং পৌত্ররা নূতন কোন যুদ্ধজয়ের কথা না ভাবে। নূতন কোন যুদ্ধজয় কী তাদের আনন্দ দিতে পারবে। তার চেয়ে বরং তারা কোমলতা এবং লঘুদণ্ডে তৃপ্ত থাকুক (এরই প্রতিফলে?)। বরঞ্চ যখন তারা যুদ্ধজয়ের কথা ভাববে তখন তারা এই জগৎ বা দূর জগৎ সম্পর্কে ধম্ম-বিজয়ের কথা ভাবুক। তাদের আনন্দ হয়ে উঠুক এই জগৎ এবং জগৎ ছাড়িয়ে প্রচেষ্টার আনন্দ।

[E. Hultzsch, B.M. Barua, R. Basak এবং D. C. Sircar (শেষ ইরাগুডি সংস্করণ) কৃত নতুন ভাষান্তর, L. Alsdorf এবং K. R. Norman-এর মন্তব্য অনুসরণে পরিমার্জিত। পুরোপুরি ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনের শিলালিপির পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। গ্রিকরাজাদের প্রাকৃতভাষায় লেখা নাম প্রচলিত ইংরাজি রূপে লেখা হয়েছে।)

টীকা ১.১
মৌর্য কালপঞ্জি

সকলেই জানি তারিখটা কত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে সাধারণ বিষয়ে দিনের নাম আমাদের কাজে লাগে— আমরা বলি, 'পরের মঙ্গলবার তোমার সঙ্গে দেখা করব'। যেখানে সময়ের দূরত্ব সপ্তাহের চেয়ে বেশি, তখন তারিখ উল্লেখ করাই সহজ, সেটা মাসের একটা সংখ্যাসূচক দিন। '১৫ তারিখের মধ্যে তোমার বইটা ফেরত দেব' এখানে ১৫ হচ্ছে চলতি মাসের ১৫ তম দিন। সাধারণভাবে মাস বোঝানো হয় নাম দিয়ে, অবশ্য সংক্ষেপিত রূপে আমরা তাদের সংখ্যাও ব্যবহার করি। দীর্ঘ সময়কালে বৎসরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাসের মত-এর কোন নাম নেই। এটা অবশ্যই একটা সংখ্যা। যেমন চলতি বছর হচ্ছে ২০০৬, পরের বছর হবে ২০০৭। আমরা এটাকে খুব স্বাভাবিক মনে করি, কিন্তু এমন সময় আছে যেটা এরকম সহজ নয়। প্রতিটি বছর পরিচিত হয় সেই সময়ে ঘটা একটা ঘটনায় এবং তাই প্রত্যেক জনবসতিতে একই বছরকে আলাদা আলাদাভাবে মনে রাখা হয়। যত সময় কাটতে থাকে ঐসব নামগুলো ভুলে যাওয়া হয়। অনেক পরে বছরগুলো সংখ্যা দিয়ে মনে রাখা শুরু হয়েছে। ভারতে খ্রিস্টপূর্বাব্দ তৃতীয় শতকে অশোকের শিলালিপিতে সংখ্যাসূচক বৎসর গণনার সূচনা হয়।

অব্দের ব্যবহারে প্রবর্তিত হল সংখ্যাসূচক বৎসর গণনা। কালজ্ঞাপক বিশেষ

কোন ঘটনা বা তার সূচনাপর্ব থেকে সংখ্যা গণনা করা হত: প্রথম বছরেব সংখ্যা ১, পরের বছর ২, ইত্যাদি।

প্রাচীন অব্দে বিশেষ ঘটনা হিসাবে ধরা হত শাসকের সিংহাসন আরোহণের প্রকৃত বা আনুষ্ঠানিক দিন; অশোকের শিলালিপির সংখ্যাসূচক বছর এইভাবে সূচিত হয়েছে। এই প্রথাটা চালু করেছিলেন পশ্চিম এশিয়ার মাসেডনিয় শাসক সেলুকস। খ্রিস্টপূর্ব ৩১২-৩১১ অব্দে ব্যাবিলন দখল করার ঘটনাকাল থেকে তিনি সেলুসিড অব্দ চালু করেন।

প্রাচীন অব্দের হিসাবে একটা বছরের গোলমাল হতে পারে এই কারণে যে, সংখ্যাটা সেই বছরের না যে বছর কেটে গেছে সেই বছরের। খ্রিস্টিয় অব্দে সবসময় সেটা চলতি বছর; যেমন ২০০৬ সাল শুরু হয় খ্রিস্ট জন্মের পর ২০০৫ বছর কেটে গেলে। যদি কেটে যাওয়া বছর থেকে সংখ্যা শুরু হয় তাহলে প্রথম বছরের সংখ্যা এক হবে না, হবে শূন্য। এবং ২০০৬-কে লিখতে হবে ২০০৫। যেভাবে অশোকের শিলালিপিতে বৎসরের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে যেমন ঘটনা ঘটেছে তেমন, যখন অশোক '(রাজা) হিসাবে অভিষিক্ত (অভিষিতেনা) হন আট বছর'— এটা চলতি বছর বোঝায় না। বোঝায় কেটে যাওয়া বছর। এইভাবেই তো আমরা আমাদের বয়স গণনা করি। 'আমি তিয়াত্তর বছরের' বলতে বোঝায় আমার জন্ম থেকে তিয়াত্তর বছর কেটে গেছে। কান্দাহারে অশোকের দুটি গ্রিক শিলালিপিতে এইভাবেই উল্লেখিত 'দশ বছর কেটে গেলে' বয়ানটি এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। অন্যদিকে পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে অশোক বলেছেন যে 'অভিষেকের ছাব্বিশ বছর' তিনি পঁচিশবার বন্দীদের সার্বিক মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতি বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে (সম্ভবত যা নিশ্চয় করে বলা যায় না) তিনি বন্দী মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন। এখানে ২৬বর্ষ অবশ্যই চলতি বছর অর্থাৎ অশোকের অভিষেকের পঁচিশ বছর কেটে যাবার পর বোঝায়। সাক্ষ্য বিচার করে আমরা অশোকের রাজত্বকাল ধরেছি 'কেটে যাওয়া' বছর ধরে; কিন্তু বিষয়ের অনিশ্চয়তা মাথায় রেখে সবসময় ভুল কমাতে কমবেশি এক বছর বিয়োগ করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অশোকের রাজত্বকালের সময়-নির্দেশ যদি কেটে-যাওয়া বৎসরের হিসাবে করা হয়, তবে সেটি খ্রিস্টজন্মের পূর্বাব্দের সমতূল্য হবে। আর রাজত্বকালের সময়-নির্দেশ যদি চলতি বৎসরের নিরিখে করা হয়, তবে রাজত্বের বৎসরগুলি শেষ হবার পর খ্রিস্টপূর্ব অব্দের সঙ্গে তাদের সংখ্যাটি মিলবে।

মৌর্য-ভারত কে আন্তর্জাতিক সময়সীমার মধ্যে স্থাপন করে খ্রিস্টিয় অব্দের সমান করে তুলতে আমাদের প্রধান উপাদান হচ্ছে অশোকের প্রস্তর অনুশাসন-১৩ (নিষ্কর্ষ ১.৪) যেখানে তিনি বলছেন যে 'তিনি দূত পাঠিয়েছেন সেইসব জায়গায় যেখানে আছেন ইয়োনা (গ্রিক) রাজা অমতিওকা (মতান্তরে অমতিওগা) এবং অমতিওকার

পরে তুলামায় (মতা. তুবামায়া), অমতেকিনা, মগা (মতা. মকা) এবং অলিকাশূদ্র (মতা. অলিক্যশূদ্রা) নামে চার রাজা।' 'যবন রাজ অমতিওকা এবং অমতিওকার প্রতিবেশী চার রাজার' কাছে এই দূত প্রেরণ প্রস্তর অনুশাসন-২ এ সংশ্লিষ্ট এবং তার পরেই আছে প্রস্তর অনুশাসন-৩, যেটা বিশেষভাবে বলছে যে এটা প্রচার করা হয়েছে 'অশোকের রাজকীয় দ্বাদশ বৎসরে'। অর্থাৎ পাঁচজন যবন বা গ্রীক (মাসেডনিয়) রাজার কাছে দূত প্রেরণ অশোকের রাজকীয় বৎসর ১২-র পরে নয়।

ঐ উল্লেখিত পাঁচ শাসক যখন সিংহাসনে ছিলেন তার সময় যদি নিরূপণ করতে পারি তাহলে সেই সময়সীমা খুঁজে পাবো যার মধ্যে অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরটি পড়বে এবং তা থেকে আমরা নিরূপণ করতে পারব অশোকের সিংহাসন লাভের সময়কাল। ঐ পাঁচটি নাম সহজেই পুনরুদ্ধার করা যায় যথাক্রমে অ্যান্টিওখুস, টলেমি, অ্যান্টিগোনাস, মগাস এবং আলেকজান্ডার। অ্যান্টিওখুস কেবল সেলুকাসের ছেলের নাম নয়, যিনি ২৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেছিলেন; তাঁর উত্তরাধিকারী যিনি ২৬১-২৪৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ কাল রাজত্ব করেছিলেন, তাঁরও নাম অ্যান্টিওখুশ, ২য়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মিশরের সকল মাসেডনিয় রাজার নামের অংশ ছিল টলেমি। দ্বিতীয় অ্যান্টিগোনাস মাসেডোনিয়া শাসন করেছিলেন ২৮৩-২৩৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। সাইরেনাইকার (মিশরের সীমানায় লিবিয়ার অংশ) মগা রাজত্ব করেছিলেন c-২৭৪ থেকে, মারা গিয়েছিলেন সম্ভবত ২৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা ঠিক তার আগে। দুজন সম্ভাব্য আলেকজান্ডার আছে, একজন এপিরাশের আলেকজান্ডার যার রাজত্বকাল ২৭২-c ২৫৫ খ্রি.পূর্বাব্দ আর একজন করিন্থের আলেকজান্ডার যিনি রাজত্ব করেছিলেন ২৫৩-২৪৭ খ্রি. পূর্বাব্দ। যদি দেখা যায় উল্লিখিত মগার সময়কাল সঠিক তাহলে বাদ দিতে হবে করিন্থের আলেকজান্ডারকে এবং যে সময়সীমার মধ্যে সকলেই একত্রে রাজত্ব করছেন তা কমে দাঁড়াবে ২৭২ থেকে ২৫৮ খ্রি. পূর্বাব্দ। একজন রাজার সিংহাসন লাভ বা মৃত্যুর খবর অত দূর থেকে অশোকের রাজ দরবারে আসার জন্যে এক বছর লাগবে ধরে নিলে অশোকের রাজ্যাভিষেক অবশ্যই হবে ২৬৯ খ্রি. পূর্বাব্দে বা তার আগে। এই সময়কালটা আরো কমে যাবে কেননা আমরা জানি, অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত শেষ নন্দ শাসককে সিংহাসন চ্যুত করেন ৩২৬ খ্রি পূর্বাব্দের পরে। কারণ ঐ বছরই আলেকজান্ডার বিতস্তা নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং তখন সিংহাসনে থাকা নন্দরাজার ক্ষমতার খবর পেয়ে তিনি পালিয়ে যান। চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের সবচেয়ে আগের সময় যদি হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ তাহলে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল (শ্রীলঙ্কার পাঠ 'দিপবংশ' এবং 'মহাবংশ' এবং পুরাণসমূহ অনুসারে চব্বিশ বছর) এবং বিন্দুসারের শাসনকাল ('মহাবংশ' অনুসারে আটশ বছর আর পুরাণ অনুসারে পঁচিশ বছর) ধরলে অশোকের সিংহাসন আরোহণের সময় হবে হয় ২৭৭ খ্রি পূর্বাব্দে (পুরাণ অনুসারে) নতুবা ২৭৪ খ্রি.

পূর্বাব্দ (শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে)। বিপরীতক্রমে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ নির্দিষ্ট হবে ৩১৮ খ্রি. পূর্বাব্দে বা তার আগে (২৬৯+৪৯, পুরাণে উল্লিখিত সময় ধরলে) বা ৩২১ খ্রি. পূর্বাব্দে (২৬৯+৫২ বছর 'মহাবংশ' অনুসারে।)। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য লাভের যে সময় আমরা ধরেছি তা হল ৩২২ খ্রি. পূর্বাব্দ যেটি একটু বেশি করে ধরলে ৩২৫ থেকে ৩১৮ খ্রি.পূর্বাব্দের মধ্যে আবার কম করে ধরলে ৩২৫ থেকে ৩২১ খ্রি. পূর্বাব্দের মধ্যে। দুই বা তিন বছরের সময়সীমার পার্থক্য সবসময়ই মেনে নেওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের কাল ৩২২ খ্রি. পূর্বাব্দ ধরলে এবং সেই সঙ্গে মহাবংশের রাজত্বকাল বিচার করলে অশোকের রাজ্যলাভের সময় হবে প্রায় ২৭০ খ্রি পূর্বাব্দ বা সম্ভবত ২৭৭ থেকে ২৬৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী যে কোন বৎসরে।

কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন শ্রীলঙ্কার কালপঞ্জি দিপবংশ (এবং পরের 'মহাবংশ')-এর ভিত্তিতে মধ্যবর্তী চার বছরকে এইভাবে ধরেন যে অশোকের অভিষেক হয়েছিল বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বছর পরে এবং তার তিন বছর পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন— এবং আবার আর একটি অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু প্রস্তর অনুশাসন-১৩ (নিষ্কর্ষ ১.৪) অনুসারে অশোক ধম্ম বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে তাঁর রাজ্যলাভের অষ্টম বৎসরে। যে ঘটনা থেকে অশোক সময় গণনা শুরু করেন সেই অভিষেক হয়েছিল তার রাজ্যলাভের আট বছর পরে, তাই শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যগত পাঠে বর্ণিত অভিষেকের সময়ের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। এক রাজত্বকালের সঙ্গে অন্য রাজত্বকালের বিরামকাল সংক্রান্ত কোন ছড়াই সেকারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিরস, জটিল, পুঙ্খানুপুঙ্খ এই আলোচনা মৌর্য কালপঞ্জির প্রধান নির্ভর। মৌর্য কালপঞ্জি থেকেই আমরা সমগ্র-প্রাচীন ভারতীয় কালপঞ্জি গড়ে তুলি। তাই বলা যায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে, অশোকের ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন এমনভাবে আমাদের নানান উপকারে লাগে তার কার্যকারিতাকে খাটো করা কঠিন।

টীকা ১.২
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

প্রায় একশ বছর আগে, আর. রামশাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, মহীশূর সরকারের ওরিয়েন্ট লাইব্রেরীতে একটি পাণ্ডুলিপি আকারে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত পাঠ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধমালা বা গ্রন্থের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে অর্থশাস্ত্র। অন্যান্য অনেক ব্যঞ্জনার মধ্যে অর্থ শব্দটি শক্তি এবং সম্পদের নিরিখে সাফল্য বোঝায়। চিরাচরিত অভ্যস্ত বিচারে এটি অপর তিনটি লক্ষ্য থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র যেমন, কামজ ইচ্ছার পূর্ণতা বা কাম, নির্ধারিত নৈতিক আইন এবং প্রথার নির্বাপন বা ধর্ম এবং ধর্মীয় বা আত্মিক পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা বা মোক্ষ। শাস্ত্র বলতে বোঝায়

একটি নিয়ম, নিষ্পত্তি বা জ্ঞানের শাখা। অর্থ-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; যথা রাজকীয় শক্তির অধিকার এবং বৃদ্ধি যেটি সম্পদ অর্জনের রাজকীয় পথ— এই বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ একটি নিষ্পত্তি হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। যে রাজার রাজত্ব ছোট বা মাঝারি আয়তনের তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ রয়েছে এখানে— নিজের ক্ষমতা বজায় রাখা, বিপক্ষের পরিকল্পনা দমন করা, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের বশে আনা, প্রশাসন পরিচালনা করা, প্রজাদের কর নির্দিষ্ট করা, আইনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি (মূলত অর্থদণ্ড কিন্তু কারাবাস এবং মৃত্যুদণ্ডের কথাও আছে) আরোপের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ব্যাপকতর অর্থে এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চাও উপস্থিত কিন্তু শাসিতের পক্ষে নয় বরং শাসকের সুবিধা রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতেই এটি প্রণীত। এই পরামর্শে নৈতিক বাধ্যতার কোন বন্ধন নেই: নির্দোষ ব্যক্তিকে এমনকি নিজস্ব গুপ্তচরকে হত্যা করা, যৌন প্রলোভনের ব্যবহার, মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠন— এসবই শীতল মস্তিষ্কে অনুমোদিত, যদি তারা কোনভাবে রাজার উচ্চাশা বা স্বার্থের সহায় হয়।

অর্থশাস্ত্র সূত্রাকারে লিখিত গদ্য অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য সাধারণত এক পৃথক পরামর্শ বা বিবৃতি রূপে প্রতিভাত। আর ব্যাখ্যা এবং কারণসমূহ এমন সংক্ষিপ্ত যে প্রায়শই এগুলি সরল অনুশাসনে পর্যবসিত। অবশ্য, বর্ণনামূলক উপাদানও কিছু আছে যেমন বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকগণের ওপর ন্যস্ত কার্যাবলীর বিবরণ। আইনের ধারাসমূহ রয়েছে তৃতীয় গ্রন্থটিতে, যার ক্ষেত্রে অবশ্যই এই সূত্রাকার রূপটি অত্যন্ত উপযোগী।

এই রচনাটির মধ্যেই চারটি অনুচ্ছেদে এর রচয়িতা হিসাবে কৌটিল্যের নামের উল্লেখ রয়েছে এবং একস্থানে (একেবারে শেষের দিকে) স্পষ্ট সনাক্ত করা হয়েছে রচয়িতাকে— যিনি নন্দদের সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। সম্ভবত পরবর্তী সংকলনে রচয়িতাকে বিষ্ণুগুপ্ত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে; কিন্তু আমাদের সুপরিচিত চাণক্য নামটি কোথাও নেই। অনেকস্থানে কৌটিল্যের অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে, কখনও কেবলমাত্র তাঁরই মতামত, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য অনেকের সঙ্গে তাঁর মতামত রয়েছে। কিন্তু সর্বদা কৌটিল্যের অভিমতই চূড়ান্ত ও নির্ধারক হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। অতএব এই রচনার নির্দিষ্ট যৌক্তিক বিন্যাসের (প্রারম্ভেই সমস্ত বিষয়বস্তুর বিশদ এবং নিখুঁত তালিকা সহ) বিচারে মনে হয় একজন ব্যক্তিই এর রচয়িতা। আর এই গ্রন্থে সমস্ত উল্লিখিত নির্দেশ যদি অভ্রান্ত হয় তবে সে ব্যক্তি কৌটিল্য। অবশ্য এটি চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের পূর্বে রচিত (c খ্রীস্টপূর্ব ৩২২ অব্দ) না পরে সেটি এখনো পরিষ্কার নয়।

যদিও ভি.এ. স্মিথ এবং ডি. ডি. কোশাম্বী সহ অনেক ঐতিহাসিক এই গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কিত এই মতটি গ্রহণ করেছেন, তবু এর গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কয়েকটি

অসুবিধা রয়েছে। এই গ্রন্থে মনুস্মৃতির (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) রচয়িতা হিসাবে মনুর নামোল্লেখ রয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে এখানে মনুর কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে। কিন্তু এই বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রের বয়ানটি যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে, সেই বিচারে প্রাচীন ঋষি মনুই প্রকৃতপক্ষে এর রচয়িতা কিনা সে বিতর্ক অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হয়। বরং এই পাঠের রচয়িতার নিশ্চিত স্বীকৃতির জন্য মনুর নামটি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কৌটিল্যের মত একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি যিনি রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণে প্রবাদপুরুষ, তিনি পার্থিব বা রাজনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত বিজ্ঞানের আলোচনাকালে এই অর্থশাস্ত্রে যথাবিহিত এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাকারের নাম ও পরিচিতি দিলেন না, এর ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত করলেন না— এ ঘটনায় আমাদের বিস্ময় অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

অর্থশাস্ত্র যে কোনো প্রাচীনতর পাঠ থেকে সংকলিত তার আরো প্রমাণ আছে। বস্তুত এর একেবারে প্রথম বাক্যেই স্বীকার করা হয়েছে যে, অর্থবিচার সম্পর্কে প্রাচীন শিক্ষকদের সংকলিত বিবিধ নিষ্পত্তি বা বিচারের ভিত্তিতেই এটি রচিত। রচনা শৈলীর প্রসঙ্গে আর ট্রাউটমানের সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণে প্রস্তাবিত হয়েছে যে, অর্থশাস্ত্রের দীর্ঘতম গ্রন্থরাজি যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সপ্তম খণ্ড মূলত পৃথক পাঠ এবং সম্ভবত বিভিন্ন সময়কালে নানান লেখক এদের সংকলিত করেছেন। প্রাচীনতর পাঠটি যেহেতু অপ্রাপ্য, সে কারণে অর্থশাস্ত্রে পুনরায় গ্রথিত করার সময় সর্বশেষ সংকলক প্রাচীন ভাষ্যের কত অংশে নিজের দখলদারি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে কথা জানা যায়নি।

পরিশেষে, অর্থশাস্ত্রে এমন অনেক কিছু রয়েছে, যার ভিত্তিতে অনুমিত হয় যে এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ের রচিত— বাস্তবে সে সময়কাল— খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় শতক।

অর্থশাস্ত্রে প্রধান রাজনৈতিক একক হল মাঝারি আয়তনের একটি রাজত্ব— অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি আলোচনার সূত্রেই আমরা কথারম্ভ করতে পারি। এখানে দীর্ঘতম যে আঞ্চলিক ভিভিসনটি লিপিবদ্ধ আছে, সেটি একজন 'স্থানীয়' দ্বারা শাসিত ৮০০টি গ্রামের এলাকা— এরমধ্যে ৪০০, ২০০ এবং ১০ গ্রাম সমন্বিত সাবডিভিশনের তিনটি স্তর আছে। সামরিক অভিযানের প্রসঙ্গে অবশ্য হিমাবাত (হিমালয়) থেকে সমুদ্র পর্যন্ত চক্রবর্তী ক্ষেত্র বা রাজাধিরাজের অঞ্চল-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু এ উল্লেখে ইতিমধ্যেই যে অঞ্চলগুলি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তদপেক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধের স্থান বা বিজিত অঞ্চলসমূহের কথাই বলা হয়েছে। মৌর্যদের মত এমন ভারতব্যাপী প্রসারিত সাম্রাজ্য কিংবা নন্দদের সুবিস্তৃত রাজত্ব ভাইসরয় এবং রাজ্যপালের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য হওয়ার কথা, কিন্তু সে প্রসঙ্গে এই রচনায় কোন উদ্বেগ প্রকাশিত হয়নি।

অতএব, এই বিচারে একটি যুক্তিসংগত বিতর্ক তোলা যায় যে, অর্থশাস্ত্র (II. ১২.২৪) রচনার এই পরম্পরা এমনকি নন্দদের সময়কালেরও আগে শুরু হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে যখন সঙ্ঘ বা গোত্রনামের একটি তালিকা পাই, এবং দেখি যে সেই তালিকায় সুরাষ্ট্র-ও অন্তর্ভুক্ত, তখন গৌতম বুদ্ধের সময়কালের ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে নৃপতিহীন রাষ্ট্রগুলির কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। প্রাচীনকালের অন্যান্য নির্দেশকগণ অর্থশাস্ত্রে (II ১২-২৪) অমসৃণ রৌপ্য (২৫ শতাংশ তামা সহ) এবং তাম্র মুদ্রার উল্লেখ করেছেন যাদের উপরে লক্ষণ বা চিহ্ন মুদ্রিত ছিল। এই উল্লেখে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ সময়কালের ট্যাঁকশালায় প্রস্তুত ছিদ্রিত মুদ্রার প্রসঙ্গ এসে পড়ে, যদিও এর শেষ পর্বেই রৌপ্যমুদ্রায় তামার অংশভাগ বেশি ছিল (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক)। 'শাক্য এবং অজীবক (এইভাবেই বানানটি আছে) এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ বা ভিন্ন মতাবলম্বী সাধু'-দের প্রতি বৈরীভাবের উল্লেখও (III ২০.১৬) যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা শিলালিপিতে (পরবর্তী ৩.৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অজীবিকদের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে অচিরেই উৎকীর্ণ লিপির নথি থেকে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। অতএব এই উল্লেখে এমনই অনুমান করা যায় যে, অন্তত অর্থশাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদটি মৌর্য সাম্রাজ্য অবসানের পূর্বেই রচিত। আরেকটি বিষয় পরিস্কার বোঝা যায় যে মনুস্মৃতি (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক)-র যে অংশে রাজশক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইন সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে (সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় এবং নবম অধ্যায়ের একাংশ) সেখানে অর্থশাস্ত্রের তুলনায় কয়েকটি বিষয়ে অনেক বিশদ বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতএব শেষোক্ত গ্রন্থটি অধিকতর পরবর্তী কোন এক সময়কালে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক বা তার পূর্বে রচিত। বিবাহবিচ্ছেদ এবং নারীর পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের যে অনুমোদনের মনোভাব প্রকাশিত, সেটিও এ প্রসঙ্গে উত্তম প্রমাণ যে, এই গ্রন্থে এমন সব সামাজিক নিয়মাবলী বিধৃত যেগুলি অনেক প্রাচীনতর শতাব্দীতে, মনুস্মৃতির অনেক পূর্বে সমাজে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এরই সঙ্গে, অর্থশাস্ত্রে যেসমস্ত উপাদান রয়েছে সেইগুলি নন্দদের সময়কালের বা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের এমনকি অশোকের সমসাময়িকও যে হতে পারে না এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সমতলে বা এই উপদ্বীপে খ্রিস্ট পূর্ব ২৬০ অব্দের পূর্বে লিখন ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই। অশোকের প্রথম শিলালিপিই লিখিত রূপের প্রথম সাক্ষ্য। অথচ অর্থশাস্ত্রের ১১.১০ গ্রন্থে লিখিত রাজ অনুশাসনের বর্ণনাই শুধুমাত্র নেই, বর্ণলিপির বর্ণসংখ্যা যে ৬৩ সেকথাও লেখা হয়েছে। রাজ-অনুশাসনকে এখানে 'লিপি' হিসাবে নয় 'শাসন' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অশোকের ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত সারনাথ ভাষ্য ছাড়া অন্য সব অনুশাসনে 'শাসন' বহুল ব্যবহৃত। রাজ-অনুশাসনের ভাষ্যে এমন সমস্ত নির্দিষ্ট সূত্রের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেগুলি অশোকের অনুশাসনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এর বিশদ

নির্দেশে (বিশেষত II ১০.১৮-২২) প্রতিভাত হয় যে, রাজ-অনুশাসন অবশ্যই সংস্কৃতে রচিত হবে, অর্থশাস্ত্রের এমনই অভিমত। অথচ অশোকের অনুশাসনগুলি উল্লেখে যদি আলোচনার সূত্রপাত হয়ে থাকে, তবে প্রস্তরে উৎকীর্ণ তাঁর এবং অন্যান্যদের যতগুলি রাজ-অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, বিক্ষিপ্ত একটি ব্যতিক্রম (ধনদেবের অযোধ্যা শিলালিপি, খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতকের প্রথমাংশে) ছাড়া সবকটি প্রাকৃতে রচিত। পরিশেষে আমরা রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপির সন্ধান পেলাম— ১৫০ খ্রিস্টাব্দের এই লিপিটি ধ্রুপদী সংস্কৃতে লিখিত। উত্তরপ্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে এইরূপে লিখনের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের প্রচলন প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ-শতাব্দীর পূর্বে শুরু হয়নি।

পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রে নির্দিষ্ট কিছু ভৌগোলিক উল্লেখের দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে। চীনদেশ (চীনাভূমি) (II.১১.১৪) থেকে প্রাপ্ত চীনাসিল্ক (চীনাপট্ট)-এর মতো শব্দ কেবলমাত্র চীন (কিন) রাজবংশের অধীনে প্রথম চীন সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৭ অব্দ) প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়কালে প্রচলিত হওয়া সম্ভব, কেননা চীন বংশের নামানুসারেই বিদেশীদের কাছে সমগ্রদেশটি ঐ নামে পরিচিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, অলকন্ডা (আলেক্সান্দ্রিয়া) থেকে প্রবাল আনা হয়েছিল (II ১১.৪২) কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে আবহাওয়ার মরসুম আবিষ্কারের পরেই প্রবালের গঞ্জ নামে খ্যাত আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে আরব সাগরে প্রবালের বাণিজ্য শুরু হয়। অর্থশাস্ত্রে শ্রীলঙ্কাকে (II ১১.২৮, ৫৯) 'তাম্রপর্ণী নামে নয় (অশোকের তাম্বপামনি, গ্রীক ভাষায় তাপ্রবানে) 'পরসমুদ্র' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত শব্দটির সঠিক ব্যবহারে একটি দক্ষিণ ভারতীয় নদীর কথা বলা হয়েছে (II ১১.১২)। কিন্তু অনেক পরে কেবলমাত্র খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতকের শেষার্ধের গ্রীক বিবরণেই প্রথম শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে 'পলাইসিমৌদৌ' নামটি (পরসমুদ্রের বিকৃতি) ব্যবহৃত হয়। এরই সমরূপতায়, 'Periplus of the Erythraean Sea' গ্রন্থে প্রাচীন সময়কালের মত 'তাপ্রবানে' নামটি পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে। পরিশেষে, 'নেপাল'-কে অর্থশাস্ত্রে পশমী বস্ত্রের ভাণ্ডার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (II ১১.১০০), অথচ অন্যত্র এই নামের প্রাচীনতম উল্লেখটি খ্রীস্টাব্দ ৩৫০ অব্দের (c.) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপির সমসাময়িক। অতএব, খ্রিস্টীয় শতাব্দী শুরুর আগের কোন রচনায় 'নেপাল' নামের উল্লেখ থাকতে পারে এমন বিশ্বাস করা সত্যিই অসম্ভব।

অতএব, এই অনুমানটির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠা সম্ভব নয় যে, খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় শতক পর্যন্ত বিভিন্ন উপাদানের সংযুক্তিতে ক্রমাগতই অর্থশাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এরপরে একজন সংকলক সেগুলিকে একত্রিত করে, সযত্ন বিন্যাসে তাদের সম্পাদনা করলেন। কিন্তু এই গ্রন্থের কিছু অংশে, যেমন ১১.১০ এবং ১১.১১ অধ্যায়গুলিকে যথেষ্ট আস্থাসহকারে

পরবর্তীকালের রচনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অবশিষ্ট বিশাল উপাদানের সময় নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন। আগেই আমরা দেখেছি যে, এদের কয়েকটি প্রাক-মৌর্য যুগের এবং অপর কয়েকটি (এমনকি সম্ভবত অনেকখানি অংশ)-র মধ্যে মৌর্য যুগের নানা শর্তাদি প্রতিফলিত।

অবশ্য একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, মৌর্য বা অ-মৌর্য যে প্রশাসনই হোক না কেন সমগ্র অর্থশাস্ত্র সংকলন গ্রন্থটি কোনভাবেই কোন একটি বিশেষ প্রশাসনের নিয়মাবলী বিধৃত করার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে রচিত হয়নি; এমনকি যেস্থানে বিভিন্ন আধিকারিক কাজকর্ম বর্ণিত হয়েছে সেখানেও নয়। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অথবা অশোকের শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিচারের বা তথ্যের বিশদ অনুমোদন সন্ধানের পূর্বে, আমাদের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন উপাদানের কালানুক্রিক ব্যাপ্তি এবং সেইসঙ্গে এই পাঠের উদ্দেশ্য বিচার করতে হবে। সুতরাং এই পাঠটিকে জবরদস্তি কোন বিশেষ সময়কালে চিহ্নিত করা সঠিক নয়। এমনকি সামাজিক রীতিনীতির প্রশ্নেও মনু-লিখিত গ্রন্থে যে সামাজিক শৃঙ্খলার কথা পাই, তার নিরিখে অর্থশাস্ত্রে সম্ভবত এর পূর্ববর্তী কোন সমাজের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য সূত্র থেকে এই গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য বা বিচারের আংশিক অনুমোদন পাওয়া গেলেও, এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার নীতি গ্রহণ করাই বিধেয়।

টীকা ১.৩

গ্রন্থপঞ্জি

বর্তমান পুস্তিকার বিষয় সম্পূর্ণত G.M. Bongard– Levin এর Mauryan India (নিউ দিল্লী ১৯৮৫)-র ওপর নির্ভর; প্রধান আকর-বিষয় বা সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি ব্যবহৃত। R.C. Majumdar সম্পাদিত The History and Culture of the Indian People Vol. II (বোম্বে ১৯৫১) এবং K.A. Nilkanta Sastri সম্পাদিত A Comprehensive History of India Vol. II (বোম্বে ১৯৫৭) তে লেখা মৌর্য ভারতের অংশবিশেষ আরো সংশোধন করে নেওয়া দরকার। D. D. Kosambi-র An Introduction to the Study of Indian History (বোম্বে ১৯৫৬ পৃ. ১৭৬-২২৬)-র ৭নং অধ্যায় বারবার পড়া দরকার। এই লেখার পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষত প্রথম অধ্যায়ের পাঠ বিষয়ে।

আলেকজান্ডারের আক্রমণের শ্রেষ্ঠ সহায়ক বর্ণনা পাওয়া যায় V.A. Smith এর Early History of India, চতুর্থ সংস্করণ S.M. Edwardes সংশোধিত (অক্সফোর্ড ১৯২৪) গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে। আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে দেখতে হবে J.B. Bury et al. সম্পাদিত Cambridge Ancient

History VI. (কেমব্রিজ, ১৯৬৪) (অধ্যায় XV. W.W. Tarn-এর লেখা) থেকে। সম্পূর্ণ অংশটাই বাদ চলে গেল নতুনভাবে লেখা দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে (D.M. Lewis সম্পাদিত কেম্ব্রিজ ১৯৯৪)। আলেকজান্ডারের আক্রমণ সংক্রান্ত গ্রিক উৎসগুলির সংগ্রহ ও অনুবাদ পাওয়া যাবে J.W. Mc Crindle-এর সুন্দরভাবে টীকা যুক্ত 'The Invasion of India by Alexander the Great, as described by Arrian, Q. Curtis, Diodorus, Plutarch and Justin' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ওয়েস্টমিনসটার ১৮৯৩, ভারতীয় মুদ্রণ ১৯৯২)

নন্দবংশ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্যে সাবধানতার সঙ্গে দেখতে হবে Hemchandra Roychoudhury's 'Political History of Ancient India' (নিউ দিল্লী, ১৯৯৬) অধ্যায় ৪ এবং পৃষ্ঠা ৫৯১-৬১৭ — B. N. Mukherjee-র মন্তব্য সহ। রাজবংশীয় শাসকদের পৌরাণিক তালিকা (নন্দ এবং মৌর্য সহ) সম্পাদনা এবং অনুবাদ করেছেন F. E. Pargiter তার 'The Purana Text of the Dynastics of the Kali Age (লন্ডন ১৯১৩ ভারতীয় সংস্করণ বারাণসী ১৯৬২) গ্রন্থে। নন্দদের এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্পর্কে লোককথাগুলি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন Thomas R. Trautmann তাঁর 'Kautilya and the Arthashastra গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

'অর্থশাস্ত্র' সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন R. P. Kangle তাঁর 'The Kautilya Arthasastra, Part I (Text), Part II (Translation) এবং Part III (Study) গ্রন্থগুলিতে (বোম্বে ১৯৬৯, ১৯৭২, ১৯৬৫)। বহু ব্যবহৃত R. Shamasastry-র অনুবাদকে (Mysore 1924) ছাড়িয়ে গেছে এই অনুবাদ, অবশ্য সেখানে Kangle-র সংক্ষিপ্ত নির্ঘন্টের তুলনায় ব্যাপক নির্ঘন্ট পাওয়া যায়। সংকলন এবং পাঠের সময় নির্দেশের ক্ষেত্রে Thomas R. Trautmann এর 'Kautilya and the Arthasastra' (Leiden ১৯৭১) হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। S.C. Mishra 'Evolution Kautilya's Arthasastra' (দিল্লী ১৯৯৭) গ্রন্থে উৎকীর্ণ লিপি সম্পর্কে ঝোঁকগুলো খতিয়ে দেখেছেন। যদিও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এইভাবে পাঠের বিভিন্ন অংশের সময় নিরূপণে দৃঢ়তা দেখান নি।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ যা বিভিন্ন গ্রীক ও লাতিন লেখকদের লেখায় পাওয়া গেছে তার বেশীরভাগের অনুবাদ পাওয়া যায় J.W. McCrindle এর 'Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian' (লন্ডন ১৮৭৭) গ্রন্থে (R. C. Majumdar সম্পাদিত কলকাতা ১৯৬০)। এর সঙ্গে দেখতে হবে Mc Crindle-র 'Ancient India as Described in Classical Literature' (লন্ডন ১৯০১)। Mc Crindle-এর অনুবাদ এবং গ্রীক ও লাতিন পাঠ থেকে অন্য অনুবাদগুলির অংশ বিশেষ খুব ভালোভাবে সংকলন করেছেন R.C. Majumdar

তাঁর 'Classical Accounts of India' (কলকাতা ১৯৬০) (টীকা অপ্রতুল এবং সবসময় বিশ্বাসযোগ্য নয়; তবে খুব ভালো নির্ঘণ্ট দেওয়া আছে।)

ছিদ্রিত মুদ্রা বিষয়ে মান্য পুস্তিকা হচ্ছে P.L. Gupta এবং T.R. Hardaker এর 'Ancient Indian Silver Punchmarked Coins of the Magadha-Maurya Karshapana Series' (নাসিক ১৯৮৫)।

Romila Thapar তাঁর 'The Mauryas Revisited' (কলকাতা ১৯৮৭) গ্রন্থে মৌর্যসাম্রাজ্যে রাজকীয় কর্তৃত্বের বিস্তার ও গভীরতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মৌর্য ভারত সম্পর্কে গ্রীক সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন এছাড়া দেখতে হবে Gerard Fussman-এর 'Central and Provincial Administration in.... the Mauryan Empire' Indian Historical Review, XIV, ১-২ (১৯৮৭-৮৮) পৃ: ৪৩-৭২।

অশোক এবং তাঁর শিলালিপি বিষয়ে দেখতে হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি। পরবর্তী মৌর্য শিলালিপি এবং ১৫০ খ্রি. পূর্বাব্দের রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপি যা মৌর্য ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা সব কিছু সংগৃহিত হয়েছে K.G. Krishnan সম্পাদিত Uttankita Sanskrit Vidya Aranya Epigraphs, Vol II Prakrit and Sanskrit Epigraphs, খ্রিস্টাব্দ ২৫৭-৩২০ (মহীশূর ১৯৮৯) নং ৩৭-৪৬ এবং ১৩৫। মহাস্থান শিলালিপির জন্যে দেখতে হবে Epigraphia Indica, XXI, পৃ. ৮৩-৯১; এবং Sohgaura ফলকের জন্যে 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Poona) XI,' পৃষ্ঠা ৩২-৪৮।

২

অশোক এবং তাঁর পরবর্তী সময়কালের মৌর্য সাম্রাজ্য

২.১ অশোকের শিলালিপি

অশোকের রেখে-যাওয়া শিলালিপি তার কীর্তির অনন্য সাক্ষর। এত অসংখ্য কারণে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ যে আলোচনায় কোনটিকে যে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া উচিত সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দুষ্কর। সিন্ধু সভ্যতার অপঠিত ভাবলেখগুলি যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে অদ্যাবধি ভারতবর্ষে লেখনের কোনো প্রাচীনতর গ্রহণযোগ্য উদাহরণ আর নেই। অশোকের শিলালিপি তিনটিরও অধিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় যেমন— প্রাকৃত, ইন্দো-আরমীয় ও গ্রিক এবং আরো চারটি যথা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, আরমীয় আর গ্রিক লিপিতে রচিত। হিন্দি এবং ভারতের অধিকাংশ লিখিত ভাষার যে লিপি বর্তমানে প্রচলিত (দ্রাবিড়ীয় ভাষাসহ) তাদের পূর্বসূরি হলো অশোকের ব্রাহ্মী লিপি। অশোকের সময়কালে কিংবা তার সামান্য পূর্বে (পরবর্তী ২.৫ এবং অধ্যায় ৩.৪) এ লিপি সৃষ্ট (অথবা শ্রীলঙ্কা থেকে আনীত) এমন সম্ভাবনা মোটেই আকাশকুসুম কল্পনা নয়। মধ্য আফগানিস্তান থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় চল্লিশটির বেশি স্থানে স্তম্ভগাত্রে এবং শিলার ওপর (এবং দু তিনটি ক্ষেত্রে ফলকগাত্রে) এই প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই শিলালিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার পরে এদের অনন্যতা আরো বৃদ্ধি পায়। তিন-চতুর্থাংশের অধিক শিলালিপিতে অশোকের ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসন উৎকীর্ণ। অর্থাৎ অধিকাংশ অনুশাসনই অসংখ্য প্রতিলিপির আকারে আমাদের সামনে এসেছে। অশোকের নিজস্ব রচনা এইসব অনুশাসনে (অল্প কয়েকটি প্রারম্ভিক টীকা বা কোনো বিশেষ শিলালিপির নামাঙ্কন ব্যতিরেকে) মূল মগধী কথ্যভাষা প্রাকৃত অথবা কখনো কখনো অংশত অন্যান্য ভাষার কথ্য অভিব্যক্তিতে কিংবা অনুবাদে বা আরমীয় অথবা গ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে সারাংশাকারে খোদিত হয়েছে। সরল কথোপকথনের ভঙ্গিতে অশোক তাঁর প্রজাবৃন্দের উদ্দেশে কিছু বলেছেন। পরবর্তীকালের শিলালিপিগুলির আড়ম্বরপূর্ণ অতিশয়োক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই কথন। শুধু এই একটিমাত্র কারণেই বর্তমান পাঠকবর্গের নিকটে তাঁর অনুশাসনের একটি ভিন্নতর আবেদন রয়েছে। অসংখ্য পুনরুক্তি, অনুল্লেখ এবং বানানের ভ্রম, অশোক নিজেই তার চতুর্দশ প্রস্তর

অনুশাসনে মুক্তকণ্ঠে যেগুলি স্বীকার করেছেন, সেগুলিকে যত বেশি উপেক্ষা করা যাবে ততই এই অনুশাসনের আবেদন আমাদের স্পর্শ করবে। মূল বিষয়টি যেহেতু আমাদের জানা নেই, সে কারণে সরল 'ধম্ম' সূত্রায়নের (নিষ্কর্ষ ২.১ দ্রষ্টব্য) নেপথ্যে যে অজস্র জটিলতা বিদ্যমান, সেসব সহজেই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। 'ধম্ম' সূত্রগুলির আপাত সরলতার অন্তরালে গুরুতর সামাজিক ও এমনকি রাজনৈতিক বার্তা সন্ধানের প্রত্যাশাও হয়তো আমাদের রয়েছে। এছাড়া অশোকের শিলালিপি ভারতবর্ষের প্রথম লিখিত রচনা। এর সাহায্যে আমরা যে শুধুমাত্র মৌর্য কালপঞ্জী পুনর্বিন্যস্ত করতে পারি তাই নয় (উপরের ১.১ টীকা দ্রষ্টব্য) আবিষ্কৃত অন্যান্য উপাদানের সময়কাল চিহ্নিত করার সময় প্রামাণ্য সময়চিহ্ন হিসাবে তাদের ব্যবহার করতে পারি। (উদাহরণস্বরূপ : অর্থশাস্ত্র : ১.২ টীকা দ্রষ্টব্য)। কিছু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অশোকের ধম্ম-এর সারমর্মকে উপলব্ধি করতে হলে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। এই সমস্ত শিলালিপি নিজেরাই তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন এবং ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত তথ্যের অমূল্য আকর এবং এদের সাহায্যেই আমরা লিখিত রচনার বিষয়বস্তুগুলিকে পুনরায় প্রস্তুত করতে পারি। পরিশেষে এইসব শিলালিপির মাধ্যমে আমরা এই প্রথম আমাদের ইতিহাসের এমন একজন চরিত্রের সম্মুখীন হই যাঁকে আমরা কেবলমাত্র নামে নয় একজন মানুষ হিসাবে চিনি। কোনো গল্পকাহিনী বা দূরতর প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি— সরাসরি আমাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেছেন তিনি নিজে— তাঁর সমস্ত কাজের কারণ, সেইসঙ্গে তাঁর উদ্বেগ, তাঁর আত্ম-অনুশাসন, এমনকি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তাঁর আত্মসমালোচনার কথাও বলেছেন আমাদের।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাজ শুরু হয় (টীকা ২.১ দ্রষ্টব্য)। এগুলি আবিষ্কৃত হবার পর একটির সঙ্গে অপরটির তুলনামূলক বিচারের নিরিখে অনুশাসনের ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছগুলিকে পৃথক করা এবং তাদের নামকরণ সম্ভব হলো। একটি অনুশাসন অন্যান্যগুলির তুলনায় শিলালিপিতে যে স্থান অধিকার করে রয়েছে সেই পর্যায় অনুসারে সমস্ত অনুশাসনের ক্রমতালিকা প্রস্তুত হলো।

অনুশাসনগুলির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে মাইনর প্রস্তর অনুশাসন নামে বিশেষিত দুটি অনুশাসনের গুচ্ছকে অশোকের প্রাচীনতম অনুশাসন হিসেবে গণ্য করা হয়। কর্ণাটক এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের সাতটি স্থানে মাইনর প্রস্তর-অনুশাসনের প্রথম এবং দ্বিতীয় লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। উত্তরে বাহাপুর (দিল্লি) এবং সাসারাম (দক্ষিণ-পশ্চিম বিহার) পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে মাইনর প্রথম প্রস্তর-অনুশাসনের প্রতিলিপি রয়েছে অপর দশটি শিলালিপিতে (মানচিত্র ২.১-২.৩ দ্রষ্টব্য)। নিম্নে বর্ণিত প্রস্তর অনুশাসন এবং স্তম্ভ অনুশাসনের তুলনায় মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের প্রতিলিপিগুলির বয়ানে অনেক বেশি

বিষয়গত ভিন্নতা চোখে পড়ে; হয়তো বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর কারণেই মূল বয়ানে ভিন্নতা ছিল অথবা মৌখিক বার্তা থেকে লিখিত হওয়ায় জন্যেও তা হতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্ভবত শব্দের পরিবর্তে বিষয়বস্তুর ওপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনে ২৫৬ নং লিপিটির মতো কিছু দুর্বোধ্যতার নিষ্পত্তি হতে এখনো অনেক সময় প্রয়োজন এবং সে বিচারও সকলের সন্তোষ বিধান করতে পারবে না (পরবর্তী ২.৩ দ্রষ্টব্য); এক মুখ থেকে অন্য মুখে বার্তা প্রেরণের ভ্রান্তির জন্যেও এমন হতে পারে। কোনো মাইনর প্রস্তর অনুশাসনেই তারিখ নেই, কিন্তু সিংহাসন লাভের দশম বর্ষ (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দ) সম্ভবত এর সময়কাল। কেননা কান্দাহারের দ্বিভাষিক যে অনুশাসনে (পরে দ্রষ্টব্য) মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের প্রথম ও দ্বিতীয়ের সংক্ষিপ্তসার রয়েছে সেটি ঐ সময়েই উৎকীর্ণ।

প্রস্তরে এবং ফলকে চতুর্দশ প্রস্তর অনুশাসনের প্রতিলিপি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দক্ষিণ অন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু স্থানে দেখতে পাওয়া যায় (মানচিত্র ২.১-২.৪ দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে শাহবাজগরহি ও মানসেরায় (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে) প্রাপ্ত শিলালিপি। অন্যান্য যে স্থানে চতুর্দশ অনুশাসন পাওয়া গেছে সেগুলি হলো কসলি (উত্তরাঞ্চল), গিরনার (গুজরাট) এবং ইয়েবরাগুড়ি বা এররাগুড়ি (অন্ধ্র)। বোম্বাই-এর সন্নিকটে সোপারায় এবং সন্নাথিতে (কর্ণাটক) এই অনুশাসনগুচ্ছের ভগ্ন অংশ পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার ধৌলি এবং জৌগড়া শিলালিপিতে— একাদশ থেকে ত্রয়োদশ অনুশাসন ব্যতিরেকে অন্য সবকটি অনুশাসন খোদিত আছে। ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন কলিঙ্গ বিজয়ের প্রসঙ্গে লিখিত এবং সেকারণেই মনে হয় রাজনৈতিক দৃষ্টিতে উড়িষ্যায় এটিকে উৎকীর্ণ করা সঠিক বলে বিবেচিত হয়নি। সুতরাং একাদশ ও দ্বাদশ অনুশাসনও সম্ভবত এই প্রসঙ্গে জারি করা হয়েছিল এবং সেকারণে সে দুটিও এস্থানে উহ্য রয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ— এই চারটি প্রস্তর অনুশাসন প্রাচীনতম উপ-গুচ্ছ হিসাবে বিবেচিত। সিংহাসনারোহণের দ্বাদশ বর্ষে এগুলি লিখিত (c. খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮)। তৃতীয় ও চতুর্থ অনুশাসনে তারিখ দেওয়া আছে। রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরে গৃহীত একটি ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে। সুতরাং এই অনুশাসনটি এবং এর পরবর্তী একগুচ্ছ অনুশাসন অবশ্যই এই বছরেই (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৫৭ অব্দ) কিংবা এর সামান্য পরেই জারি করা হয়েছে।

প্রস্তর অনুশাসনের ক্রমান্বয়ী প্রধান লিপিগুলির অনুসরণে ধৌলি এবং জৌগড়ায় একজোড়া পৃথক প্রস্তর অনুশাসন পাওয়া গেছে (মানচিত্র ২.১)। শুধুমাত্র কলিঙ্গের জন্য এগুলি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত এমনও মনে করা হয় এবং সেকারণে এরা কলিঙ্গ অনুশাসন নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে, উড়িষ্যা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সন্নাথির ভগ্ন অনুশাসনে পৃথক প্রস্তর অনুশাসনের প্রথম ও দ্বিতীয়

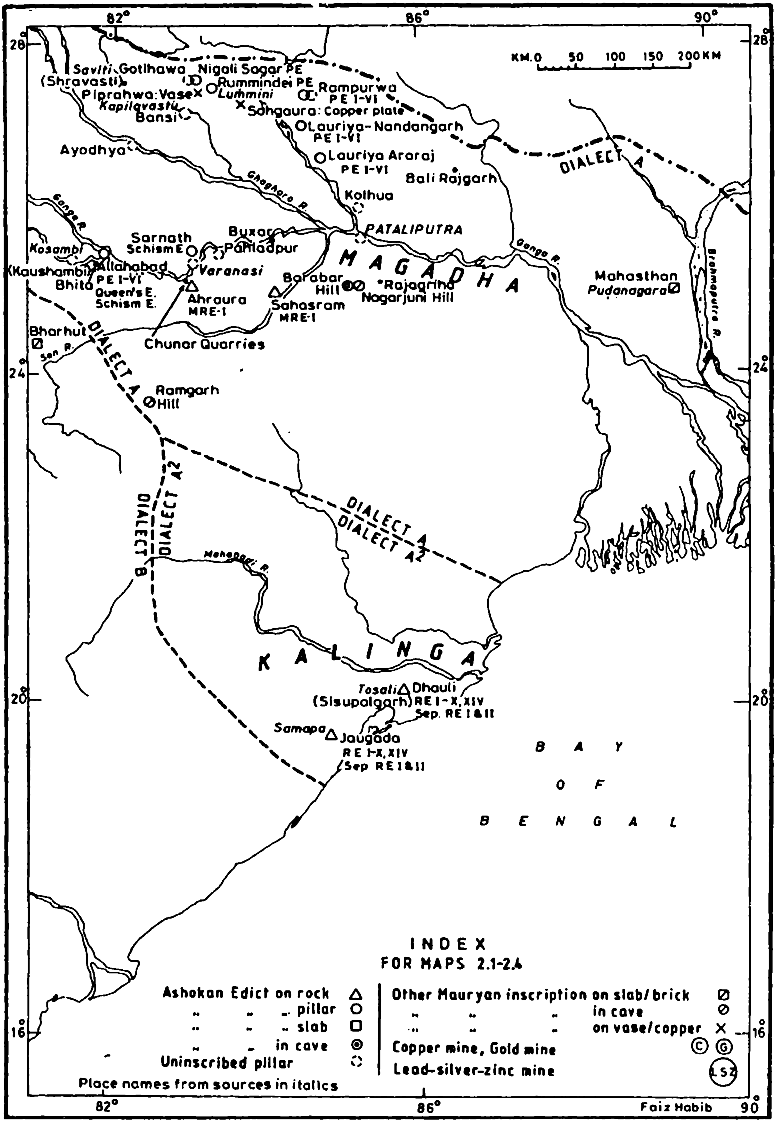

মানচিত্র ২.১ মৌর্য সাম্রাজ্য : পূর্ব

লিপির কিয়ংদশ আছে। তবে বোঝা যায় যে ঐ অনুশাসন দুটি শুধুমাত্র উড়িষ্যার জন্য লেখা হয়নি। জৌগড়া এবং সন্নাথিতে এগুলি যেভাবে খোদাই করা হয়েছে তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে দ্বিতীয় অনুশাসনের যুগ্ম লিপিটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম অনুশাসনের পূর্বে জারি হয়েছে।

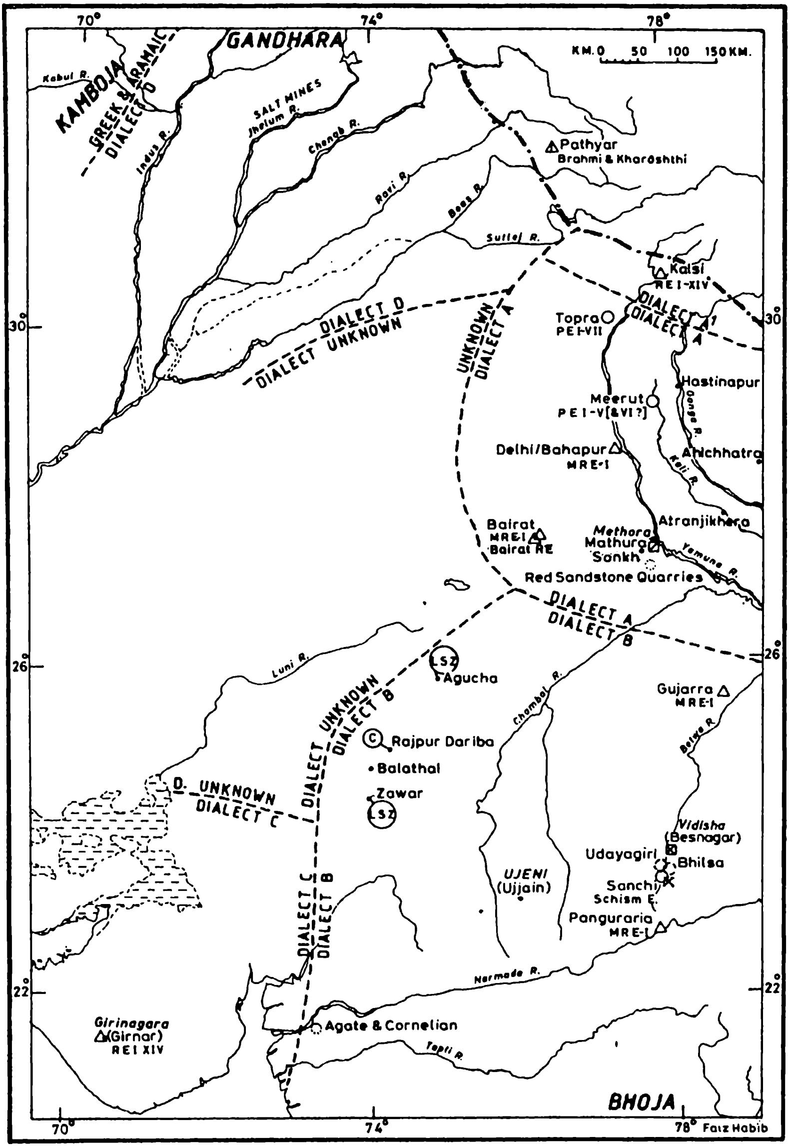

মানচিত্র ২.২ মৌর্য সাম্রাজ্য : উত্তর

এই দুই ক্রমান্বয়ী অনুশাসন গুচ্ছ ব্যতিরেকে আর এক প্রস্তর অনুশাসনের একটিমাত্র প্রতিলিপি কালান্তরে অবিকল আছে। বৈরাটে একটি শিলাস্তূপে সেটি খোদিত (ভাব্রুর সন্নিকটে, উত্তর-পূর্ব রাজস্থান)। বাস্তবিকই সঙ্ঘ বা বৌদ্ধ শৃঙ্খলার

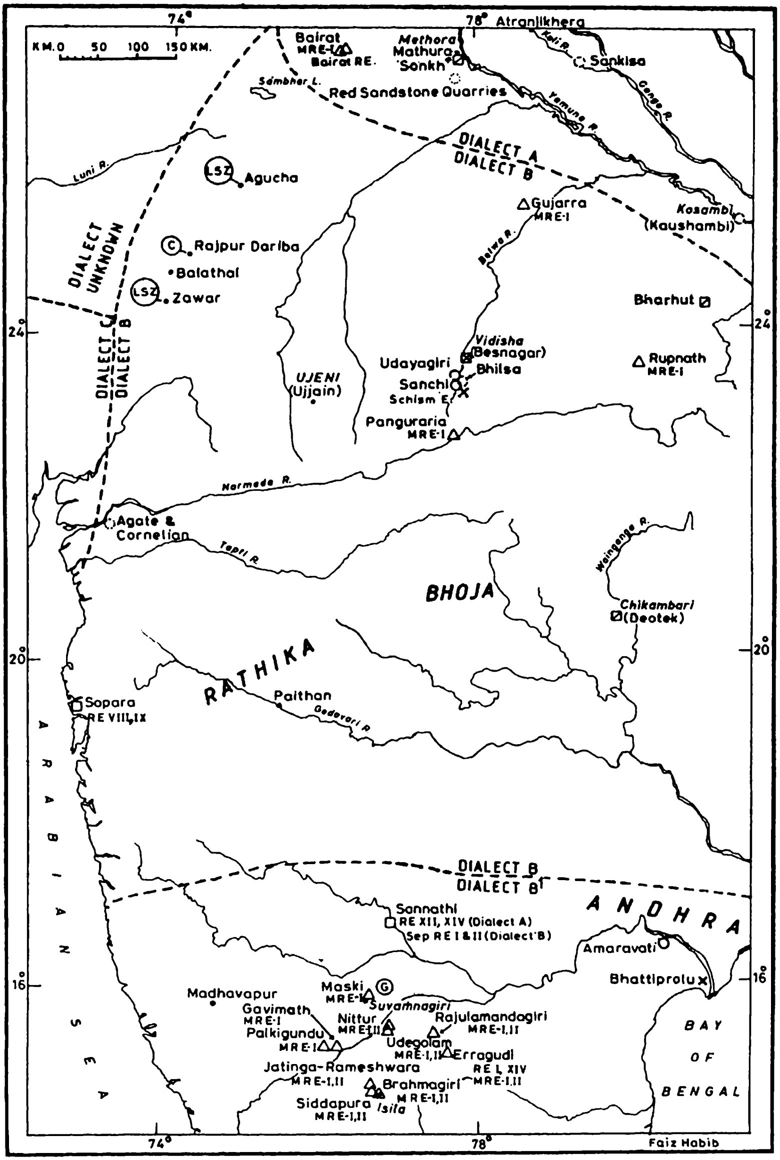

মানচিত্র ২.৩ মৌর্য সাম্রাজ্য : দক্ষিণ

উদ্দেশে অশোকের বার্তা এটি— তারিখহীন অনুশাসন, অন্যগুলি থেকে পৃথক। এখানে বিহারের গয়া প্রদেশের নিকটে বারাবার পাহাড়ের তিনটি গুহা যেগুলি অশোক নির্মাণ করে অজীবিকদের দান করেছিলেন, সেখানে অশোকের এই সংক্ষিপ্ত

সংগ্রহ নম্বর

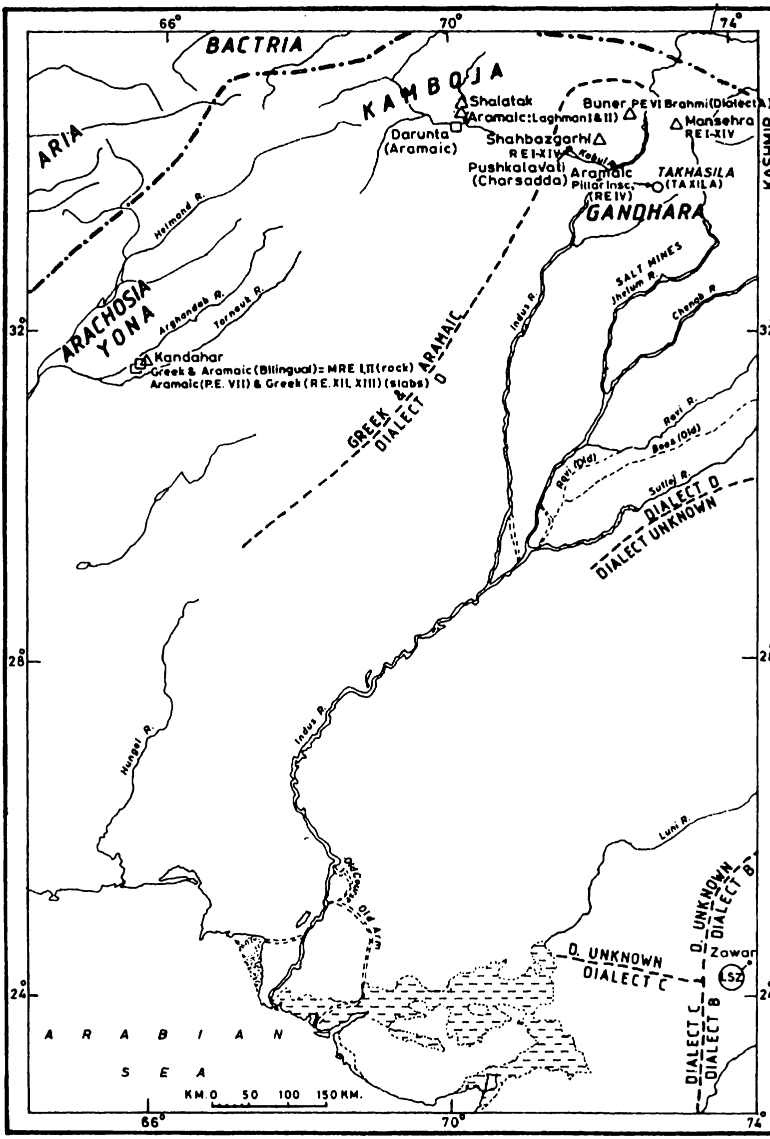

মানচিত্র ২.৪ মৌর্য সাম্রাজ্য : পশ্চিম

দানের বিবরণ খোদিত আছে। দুটি রাজত্বকালের দ্বাদশ বর্ষে (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ) এবং তৃতীয়টি (দান গ্রহীতা হিসাবে অজীবিকদের শনাক্ত করা যায়নি) রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে নির্মিত (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৫১ অব্দে)।

স্তম্ভ অনুশাসনমালার ছয়টি (প্রথম থেকে ষষ্ঠ) বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির বিভিন্ন স্থানে স্তম্ভের ওপর আবিষ্কৃত হয়েছে (মানচিত্র ২.১-২.২ দ্রষ্টব্য)। প্রাসঙ্গিকতা রক্ষায় অশোকের মগধি কথ্যভাষা প্রাকৃতে এগুলি রচিত এবং প্রতিলিপিগুলির মধ্যেও নিবিড় সাদৃশ্য বর্তমান। দিল্লির স্তম্ভদুটি প্রাথমিকভাবে ঐ স্থানে ছিল না। সেগুলির একটি হরিয়ানার তোপরা থেকে এবং অপরটি উত্তর প্রদেশের মীরাট থেকে সুলতান ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) ওই স্থানে এনেছিলেন। তোপরা-দিল্লি স্তম্ভটি সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি (নিষ্কর্ষ ২.৭), এমনটি অন্যত্র কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। এই শিলালিপি-গুচ্ছ সম্ভবত অশোকের একেবারে শেষ পর্বের রচনা। রাজত্বের ২৬ বছরে (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪) প্রথম-ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনগুলি জারি করা হয়েছে। তাঁর শাসনকালের ২৭ বছরে করা হয়েছে। (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩) প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনে এই তারিখের উল্লেখ রয়েছে। অতএব সপ্তমটি অবশ্যই এর পরেই জারি করা হয়েছে। নেপালের তরাই অঞ্চলের পবিত্র স্থানে অশোকের তীর্থযাত্রার স্মরণে দুটি স্তম্ভ লিপি স্থাপিত। তাঁর রাজত্বের ২০ বর্ষে (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ) তাঁর রুম্মিনদেই (লুম্বিনী, বুদ্ধের জন্মস্থান) ভ্রমণের স্মারক সেখানকার স্তম্ভটি এবং সম্ভবত ঐ একই বছরে তার কোনাকামানার বৌদ্ধ স্তূপ ভ্রমণের বিবরণ নিগালি সাগরের স্তম্ভে লিপিবদ্ধ রয়েছে (স্তম্ভগাত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বছরের চিহ্নটি অবলুপ্ত)। 'রানীর অনুশাসন' বিশ্লেষণে অভিহিত তৃতীয় তারিখহীন লিপিটি এলাহাবাদের স্তম্ভে আবিষ্কৃত হয়েছে: অশোকের দ্বিতীয় স্ত্রী কালুভাকির (কারুভাকি) প্রকৃত দানও যথাবিহিত লিপিবদ্ধ করতে হবে এই মর্মে প্রচারিত অশোকের আদেশ সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো বালিপাথরের ফলকে খোদিত অমরাবতীর একটি স্তম্ভের ভগ্নাংশ (সমুদ্রতটবর্তী অন্ধ্র); সেখানে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত একটি পাঠে সম্ভবত অশোকের একটি অনুশাসন খোদিত রয়েছে। কিন্তু এই ভগ্ন পাঠে যে সমস্ত সূত্র রয়েছে আমাদের পরিচিত কোনো অনুশাসনে সেগুলি পাওয়া যায় না।

প্রথম মাইনর অনুশাসন যেটি আমাদের তাঁর প্রাচীনতম ডিক্রি, সেখানে অশোক তাঁর অনুশাসনগুলি পর্বতগাত্র (পবত) এবং শিলাস্তম্ভ উভয়স্থানেই খোদিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আর যেটিকে তাঁর শেষ অনুশাসন বলা যেতে পারে সেই সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে তিনি শিলাস্তম্ভে ও শিলাফলকে তাঁর অনুশাসন উৎকীর্ণ করতে বলেছেন। অনুশাসনগুলি তিনি যখন জারি করতেন তখন হয় প্রস্তরে অথবা স্তম্ভে সম্ভবত এটি খোদাই করা হতো। কিন্তু কখনোই উভয়স্থানে এটি খোদিত হতো না। অবশ্য অশোকের নিজের কোনো বিবৃতিতে এর অনুমোদন মেলে না। বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলজনক এবং এর ব্যাখ্যাও সহজ নয়। কিন্তু অশোকের প্রস্তর এবং স্তম্ভ অনুশাসনগুলির চিরাচরিত শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে এই ধারণাটিই ভিত্তি হিসাবে বহুল

প্রতিষ্ঠিত। তবে রুনেরের (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) একটি শিলাখণ্ডে ব্রাহ্মীতে লিখিত ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনের একটি ভগ্নাংশ আবিষ্কারের দাবিতে এই ধারণাটি ঈষৎ পরিবর্তিত হতে পারে। আমরা যখন অশোকের আরমীয় এবং গ্রিক শিলালিপির প্রতি মনোসংযোগ করি, তখন এই দুই শ্রেণীর অনুশাসনের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তক্ষশিলায় এবং আফগানিস্তানের দুটি ভিন্ন স্থানে এইসব আরমীয় এবং গ্রিক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে (মানচিত্র ২.৪ দ্রষ্টব্য)। বিষয়বস্তু অনুসারে এদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এদের একটি শ্রেণীতে (১) প্রাকৃতে জারি করা অশোকের মূল অনুশাসনের সরাসরি অনুবাদ এবং অন্যটির (২) বয়ানে আমাদের পরিচিত প্রাকৃতে লিখিত অন্য অনুশাসনের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। প্রথম শ্রেণীটি কান্দাহারের নিকটে শাহর-ই-কুহনায় প্রাপ্ত দ্বিভাষিক শিলালিপির অন্তর্গত। এর গ্রিক এবং আরমীয় উভর পাঠই মূল একটি প্রাকৃত অনুশাসনের অনুবাদ হিসাবে প্রতিভাত।

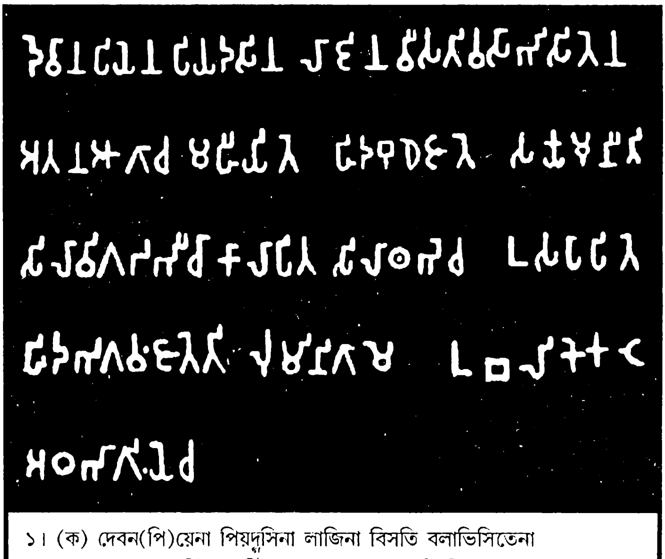

১। (ক) দেবন(পি)য়েনা পিয়দ্‌সিনা লাজিনা বিসতি বলাভিসিতেনা
২। অতনা আগাচ মহিঈতে হিদ বুধে জাতে শাক্যমুনি তি
৩। (খ) শিলা বিগধভি চা কালাপিত শিলা-থাভে চা উসপাপিতে
৪। হিদ ভাগবম জাতে তি (গ) লুম্মিনি গামে উবলিকে কথে
৫। অথ-ভাগিয়ে চা

চিত্র ২.১ : রুম্মিনদেই স্তম্ভ-লিপি (V. A. Smith)-এর অবিকল প্রতিরূপ: তৎসহ ভাষান্তরণ (E. Hultzsch)। Hultzsch কৃত অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে রাখা 'পি' অক্ষরটি Smith-এর অনুবাদে যথেষ্ট পরিষ্কার

এই প্রাকৃত অনুশাসনটি আবার আপাতভাবে বিদেশী শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের পরিবর্তিত রূপ এবং দ্বিতীয় মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের সারাৎসারের সম্মিলন। প্রারম্ভেই তারিখ হিসাবে রাজত্বের ১০ বর্ষ (c খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দ) তারিখটি লেখা আছে (আরমীয় ভাষ্যটির জন্য নিষ্কর্ষ ২.১ [খ] দ্রষ্টব্য)। কান্দাহারে আবিষ্কৃত একটি ফলকে প্রথমে দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনের গ্রিক অনুবাদ (কিছু অংশ এখানে বর্জিত) এবং পরে ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনের প্রথম অংশটি খোদিত। গ্রিক অনুবাদে উপস্থাপিত চতুর্দশ প্রস্তর অনুশাসনের সম্পূর্ণ অংশটি যে প্রস্তরফলকে খোদিত ছিল এটি তারই একাংশ হতে পারে। চূনাপাথরে খোদিত আরমীয় পাঠের একটি ভগ্নাংশ কান্দাহার বাজার থেকে পাওয়া গেছে। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনের সংশ্লিষ্ট অংশের প্রায়-সঠিক রূপান্তরণ এটি। তবে এরসঙ্গে প্রাকৃতে লিখিত কয়েকটি ধারা আরমীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অন্যদিকে ব্রহ্মশিলায় (স্বীকাপ) প্রাপ্ত মার্বেল পাথরের অষ্টভূজীয় স্তম্ভের একটি ফলকে চতুর্থ প্রস্তর অনুশাসনের একাংশ আরমীয় অনুবাদে উৎকীর্ণ। তবে ভগ্ন ফলকে বয়ান ক্ষতিগ্রস্ত।

লাঘমান প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত তিনটি আরমীয় শিলালিপিকে আমরা (২) শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করতে পারি। পুল-ই-দুরান্টা থেকে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন প্রস্তর ফলকে খোদিত ক্ষতিগ্রস্ত পাঠটি পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসন, পঞ্চম ও সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসন এই জাতীয় বিবিধ উপাদানে (প্রাকৃত শব্দ এবং বাক্যাংশসহ) রচিত। অতএব এর মূল প্রাকৃত বয়ানটি সম্ভবত স্থানীয় প্রয়োজনে বিশেষভাবে সংকলিত। আরো দুটি রাজপথ লিপির ক্ষেত্রেও এমন হতে পারে। সেখানে রাজত্বের ১৬ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৪ অব্দ) দূরত্ব-নির্দেশজ্ঞাপনের মুখবন্ধে শিকার এবং মাছ-ধরার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রায়শই কিছুটা জবরদস্তির মনোভাবে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে, অশোক আকেমেনিদীয় পূর্বসূরিদের ধাঁচে তাঁর শিলালিপি প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথম দারিয়ুসের বিশাস বিসুটুন এবং নাকস্-ই-রুস্তমের শিলালিপিতে এই পরম্পরার (খ্রিস্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬ অব্দ) সূচনা হয়েছিল। অন্যান্য ভাষা যেমন আরবীয় এবং আক্কাদিয় ভাষায় যে বিসটুনের শিলালিপির অনূদিত হয়েছিল যে বিষয়ে আমরা অবহিত। উত্তর-পশ্চিমে ইরানীয় গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের কারণে এই আকামেনেদীয় পরম্পরার বিষয়ে অশোক অবহিত। লিখিত ডিক্রি অর্থে 'দিপি' এবং লেখন শব্দার্থে 'নিপেসাপিতা' এই দুটি ইরানী শব্দ তাঁর শাহবাজগরহি শিলালিপিতে উপস্থিত (মানসেহরাতেও 'দিপি' শব্দটি রয়েছে)। কিন্তু দারিয়ুস আর অশোকের উদ্দেশ্যে একটা গুরুতর ভিন্নতা ছিল। সামরিক সাফল্য, প্রভূত শক্তি এবং শাস্তিদানের ক্ষমতা এসবই ছিল দারিয়ুসের আলোচ্য বিষয়। অতএব তিনি নিশ্চিতরূপে প্রভাবশালী মানুষজন, ক্ষমতাবান বিদ্রোহী একঅর্থে শাসক শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই কথা বলেছেন।

তাঁর সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত বিবিধ সরকারী ভাষায় উৎকীর্ণ শব্দে এই কথাই পৌঁছে দেওয়া গেছে। কিন্তু অশোক একেবারে ভিন্ন এক বার্তার প্রস্তাবক—সে তাঁর 'ধম্ম'-এর কথা—তাঁর শ্রোতারাও অন্যরকম— ক্ষুদ্র থেকে মহৎ মানুষ (প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসন এবং দশম প্রস্তর অনুশাসন), এক কথায় সমগ্র জনসমষ্টি (জন, লোক ইত্যাদি) (উদাহরণ স্বরূপ, ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসন : নিষ্কর্ষ ২.৫)। এখন লিখিত রচনা যেহেতু খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষ পড়তে পারতো, সে কারণে শুধুমাত্র শিলালিপির সাহায্যে এই বিচিত্র শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছনো সম্ভব ছিল কিনা, স্বভাবই প্রশ্ন মনে আসে। এমনকি লেখাটি যদি জনসমক্ষে পড়েও দেওয়া হয় তবু সন্দেহের নিরসন হয় না। কেননা প্রতিটি স্থানীয় বসতিতে কথ্য ভাষা, এমনকি ইন্দো-ইরানীয় থেকে উদ্ভূত কথ্যভাষাও যেখানে এত বেশি ভিন্ন হয়ে যায়, সেখানে রাজকীয় প্রাকৃত, সেটি যতই সরল ভাষায় ও শৈলীতে লেখা হোক না কেন, কেবল শ্রুতিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বোধগম্য হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এমনকি অশোকের রচনাতে ব্যবহৃত কথ্য ভাষাও যখন এত ভিন্ন। সর্বোপরি সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা নয়, সরকারী ভাষা বাগরীতিতেও প্রভূত ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়।

এতসব সীমাবদ্ধ সত্ত্বেও নিজের কথাকে পাথরে উৎকীর্ণ করার জন্য অশোকের যে ব্যাকুলতা তার অন্তরালে সম্ভবত দুটি উদ্দেশ্য গোপন ছিল। একটি হলো তাঁর ভাবনাকে কালান্তরে দীর্ঘমেয়াদী করা যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীরা প্রজন্ম পরম্পরায় এই বার্তা বহন করতে পারে (পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসন)। দ্বিতীয়টি হলো, তাঁর আধিকারিকগণ তাদের বহুবিস্তৃত মৌখিক অভিভাষণে (পরবর্তী ২.৩ দ্রষ্টব্য) প্রজাবৃন্দকে যে বার্তা জানাতে চান তারই একরকম অনুস্মারক হয়ে ওঠাই (এবং তার একটি আদর্শ বক্তব্য) এইসব শিলালিপির মূল কাজ। তাঁর অনুশাসনের বর্তমান পাঠোদ্ধারে তাঁর সেই দীর্ঘ কালাবর্তনে বেঁচে থাকার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। আর তাঁর বার্তা থেকে যেমন তাঁর দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৪) তিনি যে ধর্মীয় সহনশীলতার কথা বলেছেন, যেসব থেকে আমাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্যেই আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। অতএব প্রস্তরাক্ষরে নিজের কথা রেখে যাবার জন্য তাঁর যে অনন্য প্রচেষ্টা, সেটি তাঁরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে কোনোমতেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি।

২.২ অশোকের ধম্ম

'ধম্ম' প্রচারী অনুশাসন অর্থাৎ তাঁর ধম্ম লিপি যাতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে সেকারণেই অশোক তাঁর শিলালিপিসমূহ, এইমাত্র যাদের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হলো, সেগুলি রেখে গিয়েছিলেন। তা হলে এই যে ধম্ম যেটি তাঁর সমসাময়িক

মানুষজনকে, বিশেষত তাঁর প্রজাদের এবং সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও আত্মস্থ করানোর আকাঙ্ক্ষা ছিল অশোকের, সেই 'ধম্ম' আদতে কী? প্রাকৃত 'ধম্ম' শব্দটি সংস্কৃত ধর্মের সমার্থক (অশোকের গান্ধারী প্রয়োগে ধর্ম)। এর আক্ষরিক অর্থ হলো যেটিকে দ্রুত ধারণ করতে বা রাখতে হয় অথবা যা স্থির, এবং দৃঢ়। ধর্ম শব্দটি (এর প্রাচীনতর ধর্মণ রূপটি সহ) ঋগবেদে এবং পরবর্তী রচনায় রীতি বা আইন অর্থে পাওয়া যায় যেখানে এইসব আইনে আরো গভীরতর অর্থে দায়িত্বের নিদান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালের বৈদিক রচনায় যা ধর্মসূত্র নামে পরিচিত, সেখানে 'ধম্ম' শব্দটি বুদ্ধের মতবাদ বা শিক্ষার সমার্থক। সেখানে এই পরিচিত সূত্রে বুদ্ধ (গৌতম), ধম্ম (মতবাদ) এবং সঙ্ঘের (আশ্রমের শৃঙ্খলা) কাছে একজন মানুষ আশ্রয় ভিক্ষা করে।

দুটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো স্থানে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে অশোক 'ধম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেননি। দুটি ব্যতিক্রমের একটি তাঁর বৈরাট প্রস্তর অনুশাসনে আবিষ্কৃত। যেখানে তিনি বুদ্ধ, ধম্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ঘোষণা করে বিশ্বাসের এই বৌদ্ধ নিয়মনীতির সপক্ষে প্রাচীনতর প্রস্তরলিপি আমাদের জন্য সাক্ষর রেখে গেছেন। দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনে দ্বিতীয় উদাহরণটি পাওয়া যায়। সেখানে অশোক সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর (পসমদা) সমস্ত সদস্যদের 'পরস্পরের ধম্ম শ্রবণ ও অনুসরণ করার' আহ্বান জানিয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র 'মতবাদ' এই অর্থটিই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানানসই। ধর্মের অন্য অর্থটি হলো প্রতিষ্ঠিত আইন বা রীতি। কিন্তু শিলালিপিতে এমন একটি অনুচ্ছেদও নেই যেখানে শব্দটি এই অর্থ প্রকাশ করে। কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষজন যেমন কোনো বর্ণ কিংবা গোষ্ঠীর সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্থেও অশোক 'ধম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেননি। অশোকের ব্যবহৃত এই শব্দটি তাঁর সমসাময়িক অনুবাদকেরা ভিন্ন অর্থে উপস্থাপিত করেছেন। কান্দাহারের দ্বিভাষিক শিলালিপিতে আরমীয় অনুবাদকের নিকটে ধম্ম অর্থে qsyt বা সত্য এবং সেই সুবাদে এটি সেখানে মতবাদ শব্দার্থটি বহন করে। গ্রিক অনুবাদকের ভাষ্যে অবশ্য গ্রিক ভাষার শুদ্ধতা বা নীতির অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত। বস্তুত অশোকের শিলালিপিসমূহে প্রচারিত তাঁর 'ধম্ম'-এর যে সংক্ষিপ্তসার তারই ভিত্তিতে, কান্দাহার শিলালিপির সঙ্গে পরিচিত হবার অনেকে আগেই, আধুনিক অনুবাদকেরা যে কেমন করে শব্দটির এমন রূপান্তরণ ঘটালেন শেষোক্ত প্রয়োগটি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

শিলালিপিতে উৎকীর্ণ অশোকের বিবৃতি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, তিনি যে ধম্ম প্রচার করেছিলেন সেটি প্রকৃতপক্ষে মনসঞ্জাত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি আকাঙ্ক্ষিত রূপ (তাঁর অনুশাসনে ধম্ম সূত্রগুলির উদাহরণের জন্য নিষ্কর্ষ ২.১ দ্রষ্টব্য)। ২.১ সারণিতে এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। সেখানে

অনুশাসনে প্রদত্ত ধম্ম-এর প্রধান প্রধান নির্দেশগুলি তাদের উপস্থিতির ক্রমানুসারে অনুসারে একটি তালিকায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২.১ সারণিতে অশোকের ধম্ম-এর নির্দেশগুলি যেভাবে বিন্যস্ত আছে সেইমতো আলোচনা করলে আমরা দেখি, যে-নীতিটি সবচেয়ে অধিক বার উপস্থিত সেটি হলো জীবে-দয়া এবং তাদের আঘাত না-করা। স্বভাবতই ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন আমাদের মনে এই প্রত্যাশা জাগায় যে, কলিঙ্গ বিজয়ের সময়কালে নির্বিচার হত্যা আর মানুষের যন্ত্রণায় তাঁর মনে যেহেতু এই অনুতাপ সঞ্চারিত হয়েছিল, সে কারণেই এই অনুশাসন অনুসারেই অশোক আঞ্চলিক বিজয় অভিযান প্রত্যাখ্যান করে ধম্ম-বিজয়ের পথ অনুসরণ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে, তাঁর কাজের জন্য মানুষের যে যন্ত্রণা তার ফলেই তাঁর অনুশোচনা হয়েছিল; কিন্তু করুণার এই মনোভাব পরবর্তীকালে প্রাণীকুল অবধি প্রসারিত হয়েছিল। সেকারণেই বিষয় অনুযায়ী 'করুণার পাত্র' হিসেবে জীবের উল্লেখে প্রাণীকুলও যুক্ত হয়েছে। অশোক স্বয়ং যে নির্বিচারে প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে কিছু মাত্রায় তাদের সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে এর পরে আলোচনা করা যাবে (২.৩)। অনুশাসনে প্রকাশ্যে অনুমোদিত না হলেও বৌদ্ধ (এবং জৈন) ধর্মের প্রভাবেই এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির আত্তীকরণ পরিলক্ষিত হয়।

উপস্থিতির সংখ্যা বিচারে এর পরেই যে নীতি আলোচনায় এসে পড়ে, সেটি হলো বিভিন্ন স্তরে মানবিক সম্পর্ক। প্রথমেই আসে 'মাতা-পিতা'-র প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ। সেসময় সমাজ নিশ্চিতরূপেই পুরুষশাসিত। অতএব সেখানে এমন ক্রম বিন্যাসে আদেশ-ঘোষণা বেশ অদ্ভুত বোধ হয়। বর্তমান হিন্দুস্তানী ভাষাতেও আমরা যে বলি 'মা-বাপ', সেই শব্দাংশে অবশ্যই মায়ের বাস্তব সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করা হয় না। 'গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য' এই পরবর্তী নির্দেশও (৩ নং) অনুরূপে পরিবার বহিঃস্থ গোষ্ঠী বন্ধনের একটি দৃঢ় উচ্চারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে, যে বন্ধনে গোষ্ঠী রীতিনীতির সংবাহক হিসাবে সমস্ত 'গুরুজনেরাই' সমান গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি উদারতা ইত্যাদির মনোভাবের প্রস্তাবনাটিও সাধারণভাবে ঐ একই শ্রেণীর অন্তর্গত (৬ নং)। এখনো পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার বিরোধী কোনো নির্দেশ এখানে নেই; কিন্তু অনুশাসনে কোথাও বর্ণ প্রসঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি এ বিষয়টিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : বস্তুত শিলালিপিসমূহের সমগ্র বয়ানে বর্ণ বা জাতি শব্দের সন্ধান বৃথা কালক্ষেপ। অবশ্য গুরুজনদের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশের অন্তরালে বাস্তবে সেই গুরুজনের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মকানুনের প্রতি আনুগত্যের প্রত্যাশাই করা হয়েছে আর সেই নিয়মকানুন অবশ্যই বর্ণ ব্যবস্থার নিয়মে প্রতিফলিত এ বিতর্ক উঠতেই পারে এবং এমন হওয়াও সম্ভব। তবুও বর্ণ-ব্যবস্থাকে সুবিধাদানের এমন তির্যক ভঙ্গি কেন গ্রহণ করা হলো, সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

সারণি ২.১ ধম্ম-এর রীতি

অশোকের অনুশাসনে উপস্থিতির ক্রমানুসারে বিন্যস্ত রীতিসমূহ

১। সর্ব-জীবে দয়া এবং তাদের আঘাত না-করা	MRE II; RE III, IV, IX, XI; PEII, VII; কান্দাহার দ্বিভাষিক
২। মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য	MRE II; REIII, IV, XI, XIII; PE VII কান্দাহার দ্বিভাষিক
৩। গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা	MRE II; RE IV, IX, XIII; PE VII কান্দাহার দ্বিভাষিক
৪। ব্রাহ্মণ এবং সমনদের প্রতি উদারতা ইত্যাদি	RE III, IV, IX, XIII; PEVII
৫। দান ও ভৃত্যদের প্রতি শোভন ব্যবহার	REIX, XI, XIII; PE VII
৬। বন্ধু ও আত্মীয় পরিজন ইত্যাদির প্রতি উদারতা ইত্যাদি	REIII, IV, XI, XIII
৭। উদারতা	PEII, IV, VII
৮। সত্য-কথন	MREII; PEII, VII
৯। শুদ্ধতা (বিশেষত চিন্তনে), করুণা	REVII; PEII, VII
১০। আত্ম সংযম (বিশেষত কথনে)	REVII, XII
১১। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের সম্মান	MREII
১২। ব্যয়ে এবং অধিকারে সমতা	REIII
১৩। বয়স্কদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার	PEVII
১৪। দরিদ্র এবং হতভাগ্যদের প্রতি শোভন ব্যবহার	PEVII
১৫। উপরোক্ত সব বিষয়ে আনুগত্য	REXIII
১৬। হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, গর্ব ঈর্ষা বর্জন	PEII
১৭। উপবাস পালন	PEIV

সংক্ষিপ্ত রূপ : MRE = Minor Rock Edict / মাইনর প্রস্তর অনুশাসন;
PE = Pillar Edict / স্তম্ভ অনুশাসন
RE = Rock Edict / প্রস্তর অনুশাসন

নিঃসন্দেহে অনুশাসনে বিশেষভাবে উল্লিখিত 'দাস ও ভৃত্যদের' (দাস ও ভাটক) (৫ নং) এবং সেই সঙ্গে 'দরিদ্র ও হতভাগ্যদের' (কপন ও ভলাক) (১৪ নং) শোভন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশগুলি আধুনিক পাঠকদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কোনো রাজকীয় অধ্যাদেশে দরিদ্র এবং ক্রীতদাসদের প্রতি এমন মনোযোগ খুব কমই চোখে পড়ে। এরই অনুষঙ্গে ১২ নং নির্দেশে অতিরিক্ত সম্পদকে নিন্দিত করে ''ব্যয়ে এবং অধিকারে সংযম''-এর ঘোষণার প্রয়োজন হয়।

অশোকের আরো কয়েকটি সূত্রে এই একই মনোভাবের অনুরোধ লক্ষিত হয়। এদের নিছকই তাঁর ভক্তি উন্মত্ততা হিসাবে চিহ্নিত করে আমরা নিশ্চয়ই বাতিল করে দেব না। ''সমস্ত মানুষই (সব মুনিষ) আমার সন্তান', পৃথক দুটি প্রস্তর অনুশাসনের উভয় স্থানেই তিনি বলছেন, 'এবং আমার সন্তানদের যেমন এখানে এবং পরবর্তী জগতে সমস্ত সুযোগসুবিধা এবং সুখ আমি দিতে চাই, সমস্ত মানুষের জন্য আমার তেমনি আকাঙ্ক্ষা।'' তাঁর প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনে অশোক 'সমস্ত মানুষ' এই শব্দার্থ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সমস্ত অর্থে কেবল উচ্চ পদস্থ বা মহান (উদালক, মহাত্পা) নয়, একেবারে নিম্ন পর্যায়ের মানুষও (খুদক) বোঝায়; এরাও 'ধম্ম'-এ নিজেদের উন্নত করতে পারে। দশম প্রস্তর অনুশাসনে, তিনি আরো অগ্রসর হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, নিম্নস্তরের মানুষের তুলনায় উচ্চ-পদস্থ (উসাতা) মানুষের পক্ষে নিজেকে উন্নত করা অনেক বেশি কঠিন কাজ : প্রচলিত যে ধর্মে সমস্ত ধর্মীয় গুণাগুণেই উচ্চ কোটির (বর্ণ) মানুষের অধিকার, অশোকের এই ঘোষণায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ভাষ্য পাওয়া গেল।

অশোকের সপ্তম এবং দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনে তাঁর ধম্ম-এর বার্তা যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের (পসম্দা) উদ্দেশেই উচ্চারিত সে কথা বলাই বাহুল্য। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে শুধুমাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা উচ্চারিত হয়নি, সমভাবে ব্রাহ্মণ, অজীবিক এবং জৈন্যদের উদ্দেশেও তা উচ্চারিত। অতএব, অশোক যে ব্রাহ্মণ এবং সমনদের প্রতিও উদারতা প্রদর্শনের আহ্বান জানাবেন সেটি খুবই স্বাভাবিক। শেষোক্ত শব্দটি সাধারণভাবে সমস্ত অব্রাহ্মণ সাধু, সন্ন্যাসিনী এবং যোগীদের বোঝায়। প্রায় সাতটিরও অধিক অনুশাসনে এই একই অনুরোধ বা আদেশ (আমাদের সারণির ৪ নং সূত্র) ধ্বনিত। এদের তিনটিতে (গিরনার এবং সোপারা ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থানের চতুর্থ, নবম এবং একাদশ প্রস্তর অনুশাসন) এই শব্দ-যুগ্মের ক্রমিক অবস্থান বিপরীত অর্থাৎ সমনেরা রয়েছেন প্রথম স্থানে; অষ্টম প্রস্তর অনুশাসনে অন্য একটি প্রসঙ্গেও এরা এরকম ক্রমপর্যায়ে রয়েছে। সমনদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের জোট বাঁধায় প্রতিভাত হয় যে, সাধারণভাবে সমগ্র ব্রাহ্মণকুল নয় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের (যোগী সহ) সাহায্য-দানের কথা চিন্তা করা হয়েছে। প্রায় অর্ধেক উল্লেখে এই বিপরীত ক্রমপর্যায় (সমন এবং ব্রাহ্মণ) লক্ষ্য করা যায়।

থেকে বোঝা যায় যে, অশোকের মনে এই দুই শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মানুষ সম্পর্কে এক ধরনের সাম্যভাব ছিল এবং কোনো সহজাত প্রবৃত্তিতে ব্রহ্মদেয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। অর্থশাস্ত্রে (II ১.৭) ভূমিদানের বিষয়টি (তাৎপর্যজনকভাবে একে ব্রাহ্মণদের বলা হয়েছে) কেবল ব্রাহ্মণ উপাসক, বিধান-দাতা, পুরোহিত এবং বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণ'-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল; বাদ পড়েছিলেন সমনরা। অতএব অর্থশাস্ত্রের এই ঘোষণার সঙ্গে অশোকের একটা নিশ্চিত দ্বন্দ্ব রয়েছে।

অশোক তাঁর সপ্তম প্রস্তর অনুশাসনে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'সমস্ত (ধর্মীয়) গোষ্ঠীর মানুষেরা (পসম্দ) সর্বত্র বসবাস করবে।'' ''ধনচারী (ব্রাহ্মণ) মুনি ব্যতিরেকে কোনো যোগী সম্প্রদায় (প্রব্রাজিতভব)''-কে জনপদে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এই (অব্রাহ্মণ) সম্প্রদায় যাদের বর্ণনে তাৎপর্যপূর্ণ' 'পসম্দা' শব্দটি ব্যবহৃত, তারা অন্যান্য পতিত (চণ্ডাল) সহ কোনো শহরে কেবলমাত্র শ্মশান ব্যতিরেকে আর কোথাও বসবাস করতে পারবে না—অর্থশাস্ত্রের (যথাক্রমে II ১.৩২ এবং II ৪.২৩) এই ঘোষিত নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীতে রয়েছে অশোকের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে সাধারণ বাতাবরণ প্রতিষ্ঠা অশোকের আকাঙ্ক্ষিত ছিল, বসবাসের ক্ষেত্রে সমস্ত সম্প্রদায়ের এই স্বাধীনতা ভোগ তারই আংশিক প্রকাশ। এমন সম্প্রীতির কারণেই অশোক আত্ম সংযম (সায়াম), বিশেষত কথনে আত্মসংযমকে (বাচিগুটি) একটি প্রয়োজনীয় শর্ত (আমাদের সারণিতে ১০ নং) হিসাবে গণ্য করতেন। দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনে তিনি পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন যার সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে সমৃদ্ধ হতে পারে (নিষ্কর্ষ ২.৪ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বৈরিতা ছিল কি ছিল না এবং ইতিমধ্যেই সর্বত্র পারস্পরিক সহনশীলতা বিদ্যমান ছিল কি না, সে আলোচনা অনুশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়।

'ধম্ম'-এর নামে কোনো রাজনৈতিক দাবির অনুপস্থিতিও অশোকের এই নির্দেশের অন্য একটি আশ্চর্যজনক উপাদান। কোথাও কোনো রাজা তাঁর প্রজাবৃন্দকে তাদের 'ধম্ম'-এর অংশ হিসাবে তাঁর আদেশ মান্য করার আহ্বান জানাননি। একথা সত্য যে একটি নির্দেশে (১৫ নং) 'উপরোক্ত সংস্থাপিত' (আগভূত) সমস্ত নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে, এই আনুগত্যকে পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হবে এমন প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাকাংশটি একবারই মাত্র দৃষ্ট। সেকারণে আগভূত-এর অন্য কোনো ব্যাখ্যাও সম্ভব। অন্যদিকে অপর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অশোক দ্বারা নিজেকে সমগ্র মানবজাতির কাছে ঋণে আবদ্ধ মনে করেছেন, এমনই এক ঋণ যার পরিশোধের (অননিয়াম) জন্য সমস্ত মানুষের সুখের (ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসন : নিষ্কর্ষ ২.৫) ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে এবং তাদের প্রতি তাঁর করুণার হাত প্রসারিত

করতে হবে (পৃথক প্রস্তর অনুশাসন নবম)। 'সামাজিক চুক্তি'-র একটা আদিম রূপ যেন দেখতে পাচ্ছি এমন অনুভব জাগে, যেখানে রাজা তাঁর প্রাপ্য খাজনার পরিবর্তে প্রজাদের কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করতে দায়বদ্ধ। প্রথম পৃথক প্রস্তর অনুশাসনে তিনি যখন তাঁর আধিকারিকদের আদেশ পালনের মাধ্যমে নিজেদের ঋণ পরিশোধের কথা বলেন, তখন ঐ একই চিত্রকল্পের ব্যবহারে আমাদের এই অভিমত আরো শক্তিশালী হয়। ঋণ বলতে সম্ভবত রাজার নিকটে আধিকারিকদের প্রাপ্য বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তিমানুষের অন্তরাত্মার নিকটে অশোক যে দাবি করেছিলেন, সেটিও তাঁর 'ধম্ম'-এর অন্য একটি দিক। আমাদের ২.১ নং সারণিতে আমরা দেখি তিনি দাবি করেছিলেন সত্যকথন (৮ নং); আত্মসংযম, বিশেষত কথনে আত্মসংযমের চর্চা (১০ নং); শুদ্ধতা, বিশেষত চিন্তনে শুদ্ধতা (৯ নং); হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, গর্ব এবং ঈর্ষার মনোভাব ত্যাগ (১৬ নং)। নবম প্রস্তর অনুশাসনে, তিনি স্বীকার করেন যে শুভ লক্ষণের (মঙ্গল) জন্য কিছু আবার সম্পাদন করা যেতে পারে—তিনি বলছেন যে, যাইহোক না কেন নারীরা এমন অসংখ্য আচার পালন করে। কিন্তু বস্তুত তিনি এ জাতীয় আচারের কার্যকারিতাকে বাতিলই করে দেন। ধম্ম-নির্দেশিত আচরণেই একমাত্র প্রকৃত ফললাভ সম্ভব। প্রতি পরিবারে এই বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য তিনি 'পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী (সুভামিকা), বন্ধু, পরিজন, এমনকি প্রতিবেশীদের' উদ্দেশ্যেও আবেদন জানিয়েছেন। প্রথম প্রস্তর অনুশাসনে পশুবলির উদ্দেশে আয়োজিত (পজোহিতভিয়ে) ধর্মীয় সম্মিলনকে (সমাজ) তিনি অভিযুক্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অশোকের ধম্মের প্রাথমিক যে ধারা (১ নং ঘোষণা) জীবে অনাঘাত তার সঙ্গে এই টিকে থাকা বৈদিক আচারের নিশ্চিত দ্বন্দ্ব ছিল। সাহায্য দানের প্রতিকল্প বা অনুষঙ্গ হিসাবে একটিমাত্র আচারই মনে হয় অশোকের অনুমোদন লাভ করেছিল, তা হলো উপবাস পালন (১৭ নং)

ব্যক্তিমানুষের উদ্দেশ্যে 'ধম্ম' অনুসরণের আবেদন জানানোর সময় অশোক প্রায়শই এর 'ফল'-এর কথা বলতেন। এখানে এই জগতে (হিদলোক) ফললাভের প্রতিশ্রুতি তিনি দিতেন। অবশ্য শুভাচার পালনের উদ্দেশ্যও যে তাই সে কথাও তিনি স্বীকার করতেন। কিন্তু 'ধম্ম'। সেইসঙ্গে পরজগতে (পরতা, পরলোক)-ও ফলদায়ী (নবম প্রস্তর অনুশাসন দ্রষ্টব্য; সেইসঙ্গে ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন, পৃথক প্রস্তর অনুশাসন দুটি এবং চতুর্থ ও সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসন)। অশোক এমনকি স্বর্গলাভেরও (স্বগা) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (মাইনর প্রস্তর অনুশাসন ১ম এবং ষষ্ঠ ও নরম প্রস্তর অনুশাসন)। এখানে আপাতদৃষ্টিতে, অশোক অর্থশাস্ত্রে (I ৩.১৪) স্বীকৃত এই সাধারণ বিশ্বাসকে হয়ত উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন যেখানে বলা হয়েছে যে, 'মানুষ তার ধর্ম পালন করলে স্বর্গ আর অনন্ত সুখের পথে ধাবিত হয়।' কৌটিল্যের ধর্ম সংক্রান্ত

ধারণার থেকে অশোকের ধম্ম যে একেবারেই আলাদা সেটা অবশ্য অন্য বিষয়। এছাড়া, আমরা এ কথাও অনুমান করতে পারি যে, অশোকের নিজের ধম্ম-এ ঈশ্বর অথবা কোনো মূর্তি বা পবিত্র আত্মার স্থান না থাকায় কর্মতন্ত্রের সক্রিয়তায় পরজগতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চয়ই অশোকের মনে ছিল। প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনে দেবস-এর (দেবগণ) সঙ্গে মানুষের একত্র মেলামেশার উল্লেখ এবং চতুর্থ প্রস্তর অনুশাসনে সাধারণ মানুষের 'দৈবীরূপ' (দিব্যানি রূপানি) প্রদর্শন অবশ্যই একধরনের আলঙ্কারিক অভিব্যক্তি। বুদ্ধ যেহেতু 'আত্মা'কে অংশত অস্বীকার করেছিলেন, সে কারণে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি অশোক। যে সমস্ত গোষ্ঠীর বিশ্বাস স্বতন্ত্র, তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতিও স্বভাবতই ভিন্ন ধরনের। কান্দাহার দ্বিভাষিক শিলালিপির গ্রিক বয়ানে, পরজীবনের কোনো উল্লেখ নেই, অথচ এর আরমী বয়ানে জরথুষ্টীয় মতবাদের দিকে দৃষ্টি রেখে ধর্মপ্রাণ মানুষদের শেষ বিচার (এর দিন) থেকে অব্যাহতি দেবার প্রতিশ্রুতি আছে। (নিষ্কর্ষ ২.১ (খ)) দ্রষ্টব্য।

আচার-আচরণের যেসব নীতির কথা অন্যান্য নৈতিক বিশ্বাসে বলা হয়েছে অশোকের প্রচারিত নীতির সঙ্গে কখনো কখনো তাদের মিল পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। এমনকি অর্থশাস্ত্রেও I ৩.১৩ এমন শব্দ রয়েছে যেগুলিকে অশোকের অনুশাসন থেকে উদ্ধৃত মনে হতে পারে : 'সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ (নিয়ম) হলো (ধর্মের) অহিংসা, সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্বেষহীনতা, করুণা এবং ক্ষমা'। অবশ্য অর্থশাস্ত্র এত দীর্ঘকাল যাবৎ সংকলিত হয়েছে যে, এই নীতিগুলি হয়তো অশোক-পরবর্তীকালের সংযোজন এমন বিতর্ক উঠতেই পারে। কিন্তু এমন কিছু যদি ঘটেও থাকে তবু একদিকে অর্থশাস্ত্রের প্রারম্ভিক আটটি ধারা যেখানে মানুষের ধর্ম তাদের বর্ণে এবং জীবনের চারটি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ (আশ্রয়), আর অন্যদিকে অশোকের ধম্ম-এর অভিব্যক্তি, এদের মধ্যে কোনো সাধারণ মিলই নেই। অতএব এই আংশিক সমাপতনের ঘটনা নিছকই দুর্ঘটনা।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অশোক তাঁর ব্যক্তিগত আসক্তির (পরের ২.৩ দ্রষ্টব্য) কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করায়, তারই ভিত্তিতে বৌদ্ধ পরম্পরায় অশোকের অনুশাসনের উৎস সন্ধানে আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতই অধিক তৎপর হয়ে উঠেছেন। ঐ চারটি মহান সত্যের উল্লেখ অশোক করেননি এ কথা সত্য। অবশ্য পৃথক প্রস্তর অনুশাসনের প্রথমটিতে নিরপেক্ষ, ন্যায় অথবা শুভ অর্থে আমরা মঝম (আক্ষরিক অর্থে মধ্যম) শব্দের ব্যবহার পাই। বুদ্ধের মহান সত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, অষ্টমার্গের অনুমোদিত সংজ্ঞায় এই শব্দের যে অর্থ তারই প্রভাব ঐ অনুশাসনে লক্ষ্য করা যায়। অশোকের শিলালিপিতে প্রচুর সংখ্যায় এমন বাক্যাংশ শনাক্ত করা যায়, প্রাচীন পালি অনুশাসনে যাদের জুড়ি রয়েছে। সুতরাং বুদ্ধের শিক্ষা সংক্রান্ত গাথা যেগুলি তাঁর সময়কালেই একত্রিত করা হয়েছিল, তারই প্রভাব যে অশোকের অনেক বাণী এবং

নির্দেশের সূত্রায়নে পড়েছে সে কথাও প্রতিষ্ঠিত হয় (এই প্রসঙ্গ পববর্তী অধ্যায় ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অশোকের বৈরাট অনুশাসন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রভূত মৌখিক বাদবিসংবাদের পর বুদ্ধের সাতটি 'ধম্ম পরিত্যাগ'-এর নির্বাচিত তালিকা ঐ অনুশাসনে অশোক প্রস্তুত করেছেন। এই সাতটি পাঠ শনাক্ত করতে দীর্ঘদিন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেননা এদের কয়েকটির শিরোনাম পরিবর্তিত হয়েছে অথবা অনেকগুলি পাঠে একই শিরোনাম রয়েছে। যে অনুচ্ছেদগুলি অশোক নিজের 'ধম্ম' সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ এবং ভাবনার সমীপবর্তী বলে মনে করেছেন, সেগুলি নির্বাচনের একটি প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়। এখানে চক্রাকার বিতর্কের একটি বিপদ রয়েছে; কিন্তু একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত যে, পালি অনুশাসনে সাধারণ মানুষ (উপাসক) কিংবা সংসারী মানুষের জন্য মঙ্গলময় নৈতিক জীবন সম্পর্কে যেসব কথা বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বলা হয় তারসঙ্গে অশোকের ধম্ম অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। দীর্ঘনায়কের সিগালবধ সূত্রটি সম্ভবত অশোকের সাতটি নির্বাচিত পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ এখানে আমরা দেখতে পাই যে বুদ্ধ একজন সাধারণ গৃহস্বামী সিগালকে উপদেশ দিচ্ছেন কীভাবে সে (১) তার মাতাপিতা, (২) তার শিক্ষকগণ, (৩) সমন এবং ব্রাহ্মণ, (৪) বন্ধু, আত্মীয় ইত্যাদি এবং (৫) দাস ও ভৃত্যদের প্রতি তার কর্তব্য পালন করবে— এসবই অশোকের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।

বুদ্ধের বাণী এবং অশোকের ধম্ম-এর মধ্যে যোগসূত্রের প্রমাণ বিচারের সময় আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, বৌদ্ধ ধর্মে জনসাধারণ একেবারেই উপরমহলের বিষয়—এ এক সন্ন্যাস ধর্ম যেখানে মানুষ চলেছে নির্বাণ অভিমুখে অথবা জন্ম পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি এবং সেকারণেই জনসাধারণের নৈতিক গুণাগুণ বৃদ্ধির চেয়েও 'সংঘ'-এর শৃঙ্খলা, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের ক্রমপর্যায় এসবই তাদের সে অধিক ভাবনার বিষয়। অশোক যে ধম্ম প্রচার করেছেন, যাতে তাঁর আগ্রহ, সেটি এর বিপরীত। নিতান্ত সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন জানিয়েছেন এবং মানুষটির সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা বজায় রেখেই, অশোক তাকে আপন ধম্মের ছত্রচ্ছায়ায় আনতে চান। নিশ্চিতরূপে ঠিক সেই কারণেই অশোক তাঁর শ্রোতাদের এমন একটি নৈতিক পথে চলবার জন্য আহ্বান জানান যে পথ কোনো সাধকের পথে নিব্বানে পৌঁছয়নি, সে পথ গেছে স্বর্গ-অভিমুখে— এই প্রথমোক্ত শব্দটি অশোকের অনুশাসনের কোথাও স্থান পায়নি। বুদ্ধ কখনো কখনো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যা প্রচার করেছেন অশোক সম্ভবত তারই ভিত্তিতে এই নৈতিকতা গড়ে তুলেছেন— কিন্তু কখনোই তিনি তাঁর মৌলিকত্ব থেকে বিচ্যুত হননি। এমনকি আমরা যদি এ কথাও স্বীকার করে নিই যে, অশোকের ধম্মের বৃহদাংশের উৎস হলো বুদ্ধের শিক্ষা, তবুও সেই উৎসে যা উপরিতলে ছিল তাকেই

তিনি বিশিষ্ট নির্বাচনে কেন্দ্রীয় করে তোলার অনবদ্য কাজ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে আরো বিশালতায় ব্যাপ্ত করেছেন তিনি। তদুপরি যা ছিল প্রচারের বিষয় তাকেই তিনি প্রাত্যহিক অভ্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলেন। কেননা তাঁর নিজের দৃষ্টিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয়কেই করুণার আহ্বানে সাড়া দেবার যোগ্য করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে আমাদের সন্দিগ্ধতার মাত্রা যাই হোক না কেন, এ প্রশ্নে যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন, তা এখনো পর্যন্ত অসাধারণ জীবনদৃষ্টির একটি উদ্যোগ বলেই মনে হয়। পরবর্তী উপ-অধ্যায় গুলিতে আমরা তাঁর এই উদ্যোগকে পুনরায় বিন্যস্ত করার চেষ্টা করবো।

২.৩ অশোকের রাজ্যশাসন

অশোকের রাজ্যশাসন বিষয়ে আমাদের প্রধান উৎস হলো তাঁরই শিলালিপি। অবশ্য নিজ প্রজাবৃন্দকে সম্বোধনের সময় অশোক যতই আন্তরিক এবং বিনয়ী হোন না কেন, আমরা আরো কিছু নিরপেক্ষ সাক্ষ্য এখনো পেতে চাই যার নিরিখে তাঁর বিবৃতিগুলি পরীক্ষা অথবা এদের সঙ্গে আরো কিছু তথ্য যুক্ত করা যায়। এ কাজে আমাদের একমাত্র দলিল দুটি— শ্রীলঙ্কার থেরাভাডা বৌদ্ধ মঠের বৌদ্ধ পরম্পরা হিসাবে রক্ষিত কিছু নথি এবং উত্তরের মহাযান ঘরানার সাহিত্য। শ্রীলঙ্কার পরম্পরাগত ধারণা বস্তুত দুটি পালি রচনায় বিধৃত—দিপবংশ (৪০০ খ্রিস্টাব্দের সংকলিত) এবং এর বেশ পরবর্তী সময়কালের মহাবংশ; যার প্রথম অংশটি দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত। দুটিই ধারা বিবরণীমূলক উপাখ্যান এবং সেখানে প্রায়শই বিশিষ্ট ঘটনার সনতারিখ উল্লিখিত। মূল কেন্দ্রস্থল নিঃসন্দেহে অশোকের সময়কালে, তার জীবৎকালে সংস্থাপিত। যাইহোক উভয় বিবরণেই এত বেশি পরিবর্তন, অলঙ্করণ এবং কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে এই রচনাদুটিতে যা কথিত তাকে মূল্য দেওয়াই কঠিন, যদি না অশোকের শিলালিপিতে ঐ ঘটনার কোনো সমর্থন থাকে। অশোকের কাহিনী উত্তরের বয়ানটির ক্ষেত্রেও অধিক দৃঢ়তায় একই কথা বলা চলে। অশোক বন্দনা-য় এ কাহিনী সংরক্ষিত। সংস্কৃত দিব্যবদন মারফত বিবরণটি আমাদের কাছে এসেছে। এই শেষোক্ত রচনাটি প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যেই সুদীর্ঘকাল যাবৎ সংকলিত হয়েছে। চিরাচরিত এই দুটি রচনা শেষাবধি একই মৌলিক সংগ্রহ থেকে গৃহীত। কিন্তু উত্তরোত্তর সংযুক্তি ও বিয়োজনের ফলে এদের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে বিহ্বল হতে হয়। ফলে অশোকের শিলালিপি থেকে যে তথ্য আমরা পেয়েছি সেগুলি সংশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য পরম্পরাগত ধারণার ওই পাহাড় প্রমাণ রচনা কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। অতএব অশোকের শাসনকাল সম্বন্ধে এবার যেসব কথা বলা হবে সেগুলো অশোকের অনুশাসন আমাদের বিষয়ে যা বলেছে তারই সঙ্গে তথ্যসূত্রে যুক্ত থাকবে।

আমাদের স্বভাবতই প্রারম্ভিক কাহিনী রাজত্বের অষ্টম বর্ষের কলিঙ্গ যুদ্ধ। সেখান থেকেই ১.৫ অধ্যায়ে আমরা অশোকের জীবনের প্রথম পর্যায়ের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান শুরু করেছি। এ ঘটনা যে নির্বিচার হত্যা এবং অপরিসীম যন্ত্রণার জন্ম দিল তার গভীর প্রভাব পড়েছিল অশোকের জীবনে। প্রবল অনুশোচনায় তিনি দেশ বিজয় অভিযান বন্ধ করে দিলেন এবং এরপর শুরু হলো তাঁর ধম্মবিজয় বা ধর্ম বিজয়। এটিই ছিল তাঁর উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে, তাঁর প্রজাবৃন্দের প্রতি উদার এবং ক্ষমাশীল হতে হয়; ধম্ম-প্রচারে সদাসক্রিয় থাকতে হয় (ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন দ্রষ্টব্য : নিষ্কর্ষ ১.৪)। অশোকের ধম্ম-এর প্রধান প্রতিপাদ্য ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে (পূর্বের ২.২) বৌদ্ধধর্মে সাধারণের আচরণ সম্পর্কে উচ্চারিত নির্দেশ ও অশোকের ধম্ম-এর মধ্যে যে যোগসূত্র সে বিষয়টিও আলোচনায় স্পর্শ করা হয়েছে।

আমরা যাকে হালকাচালে অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ বলে থাকি তার প্রধান তথ্যসূত্র হলো তাঁর প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসন। কান্দাহার দ্বিভাষিক শিলালিপি, যেখানে দুটি মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের সারাংশ রয়েছে, সেখানে দেখা যায় যে প্রথম অনুশাসনটি তাঁর রাজত্বের দশমবর্ষে জারি করা হয়েছে (খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দে c)। প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসন আমাদের বলে যে, অশোক একজন উপাসক ছিলেন অথবা আড়াই বছর যাবৎ অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের সপ্তম বা অষ্টম বছর থেকে তিনি বুদ্ধদেবের একজন সাধারণ শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মাত্র এক বছর কাল অতিবাহিত হলেই অর্থাৎ তার রাজত্বের অষ্টম বা নবম বর্ষ থেকে তিনি নিজের সমস্ত উদ্যোগকে অধিক পরিমাণে ধম্ম-এর জন্যই নিয়োজিত করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার এক অংশে ২৫৬ রাত্রির পরিভ্রমণও ছিল (প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের ২৫৬টি চিত্রের ব্যাখ্যায় এখন সাধারণভাবে এ তথ্যটি স্বীকৃত)। সপ্তম প্রস্তর অনুশাসনেও তাঁর রাজত্বের দশম বর্ষে তাঁর ধম্মাত্যা (ধম্ম-এর ভ্রমণ অথবা তীর্থযাত্রা)-র বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পরিভ্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হলো সম্বোধি অর্থাৎ বুদ্ধগয়ার কোটিবৃক্ষ (বিহার)। "ব্রাহ্মণ এবং সমনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাদের কিছু দান করা এবং বয়স্ক মানুষজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অর্থ (হিরণ্ন) দান আর জনপদের মানুষদের মধ্যে ধম্ম প্রচারের এবং তাদের নিকটে ধম্ম বিষয়ে জানতে পরিভ্রমণ"—এসবই ছিল তীর্থযাত্রার অন্তর্গত। এ যেন আমাদের সময়কালের রাজনীতিকদের গণ-সাক্ষাৎ কর্মসূচী। একে ঠিক চিরাচরিত তীর্থযাত্রা বলা চলে না।

বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে অশোকের বিশেষ সম্বন্ধটি লক্ষণীয়ভাবে বৈরাট প্রস্তর অনুশাসনে পাওয়া গেছে। সেখানে অশোক সংঘের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন এবং সপ্ত সংলাপের প্রশংসা করছেন অথবা বুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁর রাজত্বকালের চতুর্দশ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫২ অব্দ c) তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে

অবস্থিত বুদ্ধ কোনাকামানের স্তূপটি মেরামত করে দেন কিংবা এর আয়তন বর্ধিত করেন। এরপর রাজত্বের বিংশবর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ c) গৌতম বুদ্ধের জন্ম-স্থান লুম্মিনী (লুম্বিনী) ভ্রমণে যান। (রুম্মিনদেই স্তম্ভ : নিষ্কর্ষ ৩.৩)।

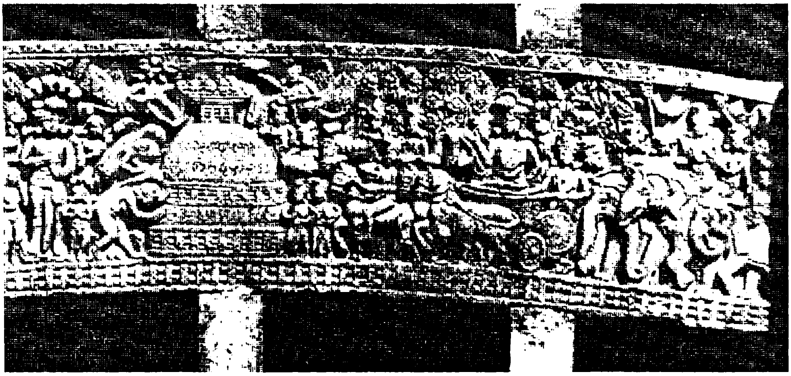

চিত্র ২.২ : রামগ্রামের স্তূপে অশোকের আগমন : ১ নং স্তূপের দক্ষিণ-তোরণে অশোকবন্দনার কাহিনীটি রিলিফে পরিস্ফুট : সাঁচী, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক [অনুকৃতি ও ব্যাখ্যা, J. Marshall এবং A Faucher]

সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসন যেটি তাঁর রাজত্বের সপ্তবিংশতি বর্ষে জারি হয়েছিল (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c), সেখানে ধম্ম-মহামাতদের পরিচর্যার প্রথম প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিল বৌদ্ধ সঙ্ঘ। পরিশেষে এলাহাবাদ, সারনাথ এবং সাঁচি স্তম্ভগাত্রে আবিষ্কৃত ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন, যেটি তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠবিংশতি বর্ষে জারি করা হয়েছিল, সেখানে অশোক সঙ্ঘের একতা রক্ষা করা এবং ধর্মীয় উপদলে সমস্ত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের নির্বাচনকে যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তার প্রভাব থেকে সঙ্ঘকে সুরক্ষিত রাখার কাজে তাঁর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। সারনাথ শিলালিপির এই অনুশাসনের শেষে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন যুক্ত রয়েছে। এই প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, এই অনুশাসনের ধারাগুলি আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ্যে বলবৎ করার প্রয়াসে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের দল (মহামাত) রাজত্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বেন এমন আশা করা হচ্ছে। এইভাবে, অশোক বস্তুত সঙ্ঘের নানান কার্যকলাপে একটি মাত্রাবধি কর্তৃত্বের দাবি করতেন। কিন্তু তিনি যে কখনো কোনো 'বৌদ্ধ উপাসনাগৃহের প্রধান' হয়েছিলেন এমন অনুমানের কোনো ভিত্তিই নেই। ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন যে পরিস্থিতিতে জারি করা হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীলঙ্কার সেই চিরায়ত রচনাবলীতে। সেখানে কথিত আছে যে, সঙ্ঘে প্রতি অশোকের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ভাগ পাবার লোভে সেখানে অনেক অবাঞ্ছিত জনসমাগম হয়েছিল এবং তারা সঙ্ঘকে তার অভীষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত করেছিল (মহাবংশ V.২২৮-২৩০, ২৬৮-

২৭১)। অন্য অনেক বিষয়েই বৌদ্ধ পুরা কাহিনীতে কথিত তথ্যের সঙ্গে অশোকের অনুশাসনের এমনকি সামান্য পরিমাণেও সাযুজ্য মেলে না। বিশেষত সঙ্ঘ-এর প্রতি তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতার যে বিশাল পরিমাণের গল্পকথা সেখানে ব্যক্ত হয়েছে সেটি অনুশাসনে মোটেই সমর্থিত হয় না। শ্রীলঙ্কা এবং উত্তরাঞ্চল, উভয়স্থানের এই চিরায়ত উপাখ্যানে কথিত যে, তিনি ৮৪,০০০ আরাম অর্থাৎ বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার উপাখ্যানে একথাও বলা হয়েছে যে, তাঁর রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদের সভা হয়েছিল। এ বিষয়েও অনুশাসনে কোনো স্পষ্ট স্বীকৃতি নেই (কিন্তু পরবর্তী ৩.৩ অধ্যায় এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি ক্রমবর্ধমান আনুগত্যের কারণেই অশোক তাঁর দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনে ঘোষিত অন্যান্য ধর্মের প্ররোচনার (পসামদা) তাঁর সহনশীলতার নীতি সে সময় সংস্কার করেন এমন বিশ্বাসেরও কোনো কারণ নেই (নিষ্কর্ষ ২.৪)। যেটিকে তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন বলা হয়, রাজত্বের সপ্তবিংশতি বছরে (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩) জারি-করা সেই সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনেও তিনি 'সর্ব সম্প্রদায়'-এর জন্য তাঁর শুভেচ্ছার আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন যে শুধুমাত্র সম্ঘ-এর প্রতি মনোযোগ দিলেই হবে না, ব্রাহ্মণ, অজীবিক এবং জৈন্যদের প্রতিও সমান যত্নবান হতে হবে (নিষ্কর্ষ ২.৭ (গ))। এমনকি তাঁর রাজত্বের দশমবর্ষে, বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থসমূহের মধ্যে পবিত্রতর বোধিবৃক্ষ ভ্রমণকালেও তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তাঁদের দান করতে বিস্মৃত হননি। ইতিপূর্বেই তাঁর এই আচরণ আমরা দেখেছি। অজীবিকদের প্রসঙ্গটি তো দারুণ আগ্রহের বিষয়। কেননা, বৌদ্ধ পরম্পরায় এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তীব্র বৈরিতা ছিল। তবুও অশোক গয়ার নিকটস্থ পাহাড়ে দুটি অথবা তিনটি গুহা এদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। অতএব তাঁর পশ্চাতে যে কীর্তি তিনি রেখে গেছেন তন্মধ্যে এটিও অন্যতম স্থান অধিকারের যোগ্য (অধ্যায় ৩.৫ দ্রষ্টব্য)। এরমধ্যে প্রথম দুটি রাজত্বের ১২ বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ c) উৎসর্গ করা হয়েছে এবং তৃতীয়টি রাজত্বের ১৯ বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫১ অব্দ c)। অশোকের বৌদ্ধধর্মে 'ধর্মান্তরণের' দীর্ঘকাল পরের ঘটনা এগুলি।

'ধম্ম'-এর অনুগমনে অশোকের 'প্রচেষ্টার' আর একটি লক্ষণীয় দিক হলো এর প্রচার। লেখনের ব্যবহার তখন শুরু হয়েছে; কোনো কিছু লেখার অর্থই হলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা : ধম্ম অনুশাসন, পর্বতে, শিলাফলকে এবং শিলা-স্তম্ভে খোদিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ সেগুলো পড়তে পারতো (মাইনর প্রস্তর অনুশাসন ১ম, স্তম্ভ অনুশাসন ৭ম)। তাঁর অনুশাসন-খোদিত শিলালিপি এত বহুল সংখ্যায় পাওয়া গেছে যে এটিও এক অর্থে যথেষ্ট প্রামাণিক যে বিপুল মাত্রায় এই শিলালিপি খোদিত হয়েছিল এবং তাদের এমন স্থানেই রাখা হয়েছিল যেখানে নানা কারণে মানুষ একত্রিত হয় অথবা সেটি তাদের যাতায়াতের পথ। রাজত্বের বিশ বছর থেকে

(খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ c) পরবর্তী সময়কালে প্রাকৃতে লিখিত শিলালিপি কেবলমাত্র অশোকের অপূর্ব সব স্তম্ভগাত্রেই পাওয়া যায় (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বুনেরের ব্রাহ্মী প্রস্তর ভগ্নদশাটি এর একমাত্র ব্যতিক্রম)। অতএব প্রস্তর লিপির তুলনায় এদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। সম্ভবত কালাবর্তনে, যত্রতত্র অনুশাসনগুলি প্রদর্শনের উৎসাহ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল এবং উৎকীর্ণ শব্দগুলি আরো একটু সম্মানজনক স্থানে, স্তম্ভগাত্রে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করল, এমন হওয়াও সম্ভব।

স্বভাবতই সেই সময়কালে শিলাই লেখনের একমাত্র মাধ্যম ছিল না। নিয়ারখুশ কাপড়ের ওপর লেখনের প্রচলিত রীতির কথা আমাদের বলেছেন; অনেক দূর প্রান্তের লিপিকার অথবা খোদাইকরের দল যাতে শিলার ওপর অশোকের অনুশাসন নকল করতে পারে, সেজন্য এদের সম্ভবত তালপাতায় মূল অনুশাসনটি লিখে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো। একই অনুশাসনের বিভিন্ন উপস্থাপনায় ভিন্নতার ব্যাখ্যা এখানেই সবচেয়ে ভালো পাওয়া যায়। কাপড় বা তালপত্রে লিখিত মূল রচনার কয়েকটি বর্ণমালা লেখনভ্রান্তিতে পরিবর্তিত হয়ে গেলেই লেখনে এমন ভিন্নতা আসতে পারে। মৌখিক ভাষণে ধম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আধিকারিকদের বিভিন্ন স্থানে কর্মে নিযুক্ত করা হতো। এবার পড়ে শোনাবার জন্য তাদেরও লিখিত বক্তব্যের প্রয়োজন হতো। এ কাজের জন্যেও কাপড় বা তালপত্রে লিখিত বয়ান সম্ভবত প্রয়োজনীয় ছিল। পৃথক প্রস্তর অনুশাসন দুটিতে স্পষ্টতই এই নির্দেশ রয়েছে যে, তিনটি ঋতুর প্রত্যেকটিতে চারটি পূর্ণিমা রাত্রে এবং তিসা (তিস্যা) নক্ষত্রপুঞ্জের রাত্রি, যেটি খুবই পবিত্র মুহূর্ত সম্ভবত যখন মানুষজন একত্রিত হতো, সেইসময় এই অনুশাসন পড়ে শুনিয়ে দিতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুশাসনগুলি পড়ে শোনাতেই হতো। এমনকি যদি একজন মানুষ উপস্থিত থাকে তবুও পড়তে হতো। তৃতীয় প্রস্তর অনুশাসনে অশোক তাঁর আধিকারিকবৃন্দ যথা, ইউতা, রাজুক এবং পদেসিকদের নির্দেশ দিচ্ছেন, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ধম্ম-এর বার্তা প্রচারের জন্য তাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৭ অব্দ c) ধম্ম মহামাত নামে যে আধিকারিক পদটি তৈরি করা হয়েছিল, পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসন অনুসারে (নিষ্কর্ষ ২.৩) তাদের কাজের একটা অঙ্গই ছিল ধম্ম প্রচারের কাজে যোগ দেওয়া। রাজত্বের সপ্তবিংশতি বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c) স্থাপিত সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে সাধারণ মানুষকে ধম্ম নির্দেশ দানের জন্য অশোকের আধিকারিকের (পুরিষ এবং রাজুক) প্রয়োজন হয়েছিল। ধম্ম নির্দেশ দানের কাজটি মূলত মৌখিক এমন ধারণাই হয় এবং প্রস্তরে নিজের অনুশাসন লিপিবদ্ধ করার তুলনায় এ প্রক্রিয়া অনেক স্বতন্ত্র ছিল। স্থানীয় কথ্য ভাষাতেই এই মৌখিক প্রচার সংঘটিত হতো নিশ্চয়ই— এমন অনুমানই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ প্রসঙ্গে অনুশাসনের কোথাও কিছু লেখা নেই।

সাম্রাজ্যর পরিধির বাইরে অন্যত্র যেমন, আন্টিওখুশ এবং অন্যান্য মাসেডোনীয় শাসকদের সাম্রাজ্যে, দক্ষিণ ভারতের রাজধানী-শহরে এবং তাম্বপামনিতে (শ্রীলঙ্কা) পাঠানো দূতেরা সম্ভবত মৌখিক এবং লিখিত উভয় পদ্ধতিতেই কাজে লাগাতো। ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে এর উল্লেখ আছে (নিষ্কর্ষ ১.৪)। কিন্তু এই বার্তাপ্রেরণের কথা যেহেতু দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনেও রয়েছে (নিষ্কর্ষ ২.২), অতএব রাজত্বের দ্বাদশ বছরে বা তারও পূর্বে (c. খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮) এই দৌত্য পাঠানো হয়েছিল। একেও সম্ভবত তাঁর ধম্ম প্রচারের প্রথম পর্যায়ের উদ্দীপনার আর এক বহিঃপ্রকাশ বলা চলে। রাজত্বের ২৬ এবং ২৭ বর্ষে স্থাপিত (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪-২৪৩ অব্দ c) প্রস্তর অনুশাসনগুলিতে এই দৌত্যের কোনো উল্লেখ নেই। এখন আফগানিস্তানে অশোকের গ্রিক এবং আরমীয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমিত হয় যে, হেলেনীয় পশ্চিম এশিয়া এবং আরো দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরিত তাঁর দূতেরা এই দুটি ভাষাতেই সমান দক্ষ ছিল। শ্রীলঙ্কায় পাঠানো অশোকের দৌত্যের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শ্রীলঙ্কার পরবর্তী বর্ষপঞ্জীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে এটি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হেলেনীয় রাষ্ট্রসমূহে পাঠানো অশোকের দৌত্যের গ্রিক রচনায় অনুল্লিখিত অথচ প্রথম আন্টিওখুশের রাজত্বকালে পাঠানো বিন্দুসারের দৌত্যের উল্লেখ কিন্তু কালান্তরেও টিকে আছে।

অশোক প্রচারিত ধম্মে প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি মানুষের আচরণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজাও নিজে একজন ব্যক্তি আর ধম্মের জন্য অশোকের সমস্ত প্রচেষ্টার এটাই হলো একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক যে তিনি তাঁর প্রজাবৃন্দের মতো নিজেকেও এই ধম্ম-এর অনুশাসনে আবদ্ধ করেছিলেন। ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৫) তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী যেসব রাজারা নিজেদের অবসরের মুহূর্ত উপভোগের সময় যেমন রাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ (অথকাম্ম) সম্পূর্ণ অবহেলা করতেন, তিনি কিন্তু তাদের মতো নন। তিনি এই মর্মে আদেশ জারি করছেন যে, প্রজার কল্যাণকর্মে যে-কোনো সময় যে কোনো কর্মে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। জীবে দয়া প্রসঙ্গে প্রথম প্রস্তর অনুশাসনে তিনি আপন দোষ স্বীকার করে বলেন যে, খাদ্যের জন্য তাঁর পাকগৃহে প্রতিদিন 'শত সহস্র প্রাণী' (সংখ্যাটি নিশ্চিত একটু বাড়িয়ে তোলা) হত্যা করা হয়। এই প্রাণীহত্যার সংখ্যা দুটি ময়ূর এবং একটি হরিণে কমিয়ে এনেছেন এমন দাবিও করেন তিনি এবং ভবিষ্যতে প্রাণীহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

ধম্ম-এর কারণে যে ধরনের আচরণ প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত স্তরে তার দায় বহন করা ছাড়াও, অশোক ধম্ম-এ যে করুণার বার্তা প্রচারিত তাকে বাস্তব জীবনে ফলপ্রসূ করার জন্য রাষ্ট্রের যা যা করণীয় সে বিষয়েও সরব হয়েছেন। একেবারে পার্থিব

রূপে এ প্রসঙ্গে তিনি যা কিছু বলেছেন সে সবই আমাদের গভীর আগ্রহের বিষয়। তাঁর ষষ্ঠ প্রস্তর অনুশাসনে তিনি 'সব মানুষের কল্যাণের' (সব লোকহিত) আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের নিষ্কর্ষ ২.৭ এবং ২.৭ (খ)-এ তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসন খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ c) এবং সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনের একটি অনুচ্ছেদ (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c) যেখানে জনকল্যাণের পার্থিব ব্যবস্থাগুলি নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাদের অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাদির সারাৎসারে আছে চিকিৎসার সহায়তা এবং মানুষজন ও পথিস্থ গবাদি পশুর জন্য ত্রাণ ও আরামের ব্যবস্থাপনা।

চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা আবার দু'জাতীয়। প্রথমত মানুষ এবং গবাদি পশু উভয়কেই চিকিৎসার (চিকিসা) সুযোগ দেওয়া। আমরা অনুমান করতে পারি যে এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসক এবং পশু বিশেষজ্ঞেরা (আদিম পশু চিকিৎসক) বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিল। দ্বিতীয়ত মানুষ এবং গবাদি পশু উভয়ের জন্যই ভেষজ উদ্ভিদ ওষধানি) সরবরাহ কথা হতো এবং যেখানে সেই ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যেত না সেখানে তাদের বপন করা হতো। এছাড়া যেসমস্ত শিকড়বাকড় এবং ফলমূল চিকিৎসাশাস্ত্রে উপকারী হিসাবে চিহ্নিত, তাদেরও যোগান দেওয়া হতো। সেসময় অবধি মানুষ চিকিৎসা এবং ঔষধ বিদ্যায় যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছিল তাকেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করে বিবিধ অঞ্চলে এইরকম চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

পথের ক্ষেত্রে, দুপাশে বৃক্ষ বিশেষত বটবৃক্ষ রোপণ করে তাকে ছায়াস্নিগ্ধ করে তোলা হয়েছিল। পথের ধারে আম্রবীথিও ছিল। মানুষ এবং গবাদি পশুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পথপার্শ্বে কূপ খনন করা হয়েছিল। কথিত আছে যে অর্ধ কোশা আধুনিক হিন্দীতে কোশ) অন্তর কূপগুলি অবস্থিত ছিল। অর্ধ কোশা বলতে ঠিক কতটা দূরত্ব বোঝায় তা ঠিক নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু সম্ভবত এ দূরত্ব তিন কিলোমিটারের বেশি হবে না। আশ্রয়স্থল সম্ভবত সরাইখানা নয়, ছাউনি দেওয়া পাটাতন। প্রশংসনীয় পরিশ্রমে নির্মিত অন্যান্য প্রচলিত নির্মাণও চোখে পড়ে : আপানানি বা পানীয় জলের নির্দিষ্ট স্থান বা স্টেশন, যেখানে বর্তমান সময়েও বিশেষত গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণের জন্য জলপূর্ণ পাত্র রাখা থাকতো। অশোক দাবি করেছেন যে, সেখানে গবাদি পশুর তৃষ্ণা নিবারণের জলও থাকতো।

এই সব গৃহীত ব্যবস্থাদির ঠিক কী মাত্রায় প্রসারিত ছিল তা অবশ্য আমরা জানতে পারি না। কিন্তু একে যে রাষ্ট্রেরই একটা দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে, অশোক একটু তির্যকভঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী শাসকেরাও তাদের প্রজাবৃন্দের 'সুখ'-এর জন্য এমনই সব কাজ করেছেন এবং তাঁর সপক্ষে যে-কোনো বিশেষ উদ্ভাবন বা মৌলিকত্ব

রয়েছে তেমন কোনো দাবিও তিনি নস্যাৎ করেছেন। তিনি শুধু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকেই বিশিষ্টতায় ভূষিত করেছেন : সাধারণ মানুষকে ধম্ম-এর অভিমুখে চালিত করা। ঠিক এই নির্দিষ্ট কারণেই, আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, এই উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব সঙ্গতির বিনিয়োগ সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরিদের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল।

সেচের জন্য নির্মিত কূপগুলি তাঁর জনকল্যাণমুখী কাজের আরো একটি উপস্থাপনা। সৌরাষ্ট্রের গিরনারে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে নির্মিত সুদর্শন হ্রদের (গিরিনগর) বাঁধ অশোকের সময়কালে জল-কপাট বা পরিখায় পরিমার্জিত হয়েছিল। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় প্রস্তাব অনুশাসনেই আমরা এসব বিশদ বিবরণ পাই। সেচের কাজে জন-নির্গমণের জন্যই সম্ভবত এই জলকপাটগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্রশাসনে প্রধান উপাদান হলো বিচারের বিধান। অশোক যখন বলেন যে, সমস্ত প্রজাবৃন্দই তাঁর সন্তান (পৃথক প্রস্তর অনুশাসন), সেইসঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেন, 'পাপ কাজ করা বস্তুত সহজ' (পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসন : ২-৩ নিষ্কর্ষ দ্রষ্টব্য)। ধম্ম-কে অমান্য করা যে পাপ, তার মধ্যে অবশ্যই অন্য মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধও পড়ে। অশোক উপলব্ধি করেছিলেন যে, এরপরেই শাস্তিদানের প্রসঙ্গটি আসবে। তাঁর চতুর্থ স্তম্ভ অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৬) অশোক তাঁর রাজুকদের নিকটে দাবি করেছিলেন যে বিচার এবং শাস্তিদান, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা যেন অবশ্যই সাম্য (সমতা) বজায় রাখে। এই অনুশাসনের একটি অনুচ্ছেদের অর্থ এখনো পর্যন্ত এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মৃত্যুদণ্ড যদি দিতেই হয় তবে সেক্ষেত্রে দণ্ডাজ্ঞা পালনের জন্য তিনদিন সময় নিতে হবে যাতে যিনি বিচারক, সেই রাজুক এই কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন কিংবা সেই মানুষটি যাতে শেষ ধ্যানের জন্য যথেষ্ট সময় পায় এবং উপবাস ও দান করতে পারে। কে. পি. নরম্যান অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেটি আমাদের ২.৬ নিষ্কর্ষে সংযোজিত হলো। তিনি বলেছেন যে, 'বধ' এই নির্ণায়ক শব্দটির অর্থ হত্যা নয়, প্রহার। তাঁর পৃথক প্রস্তর অনুশাসনের প্রথমটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির কারাবাস ও দৈহিক পীড়নের (পলিকিলেসা) শাস্তি হতে পারে। শেষোক্ত কথাটি অনেকটা প্রহারের মতোই শোনায়। অন্যদের ব্যাখ্যায় 'ইওতা' অর্থে অনিচ্ছুক কিন্তু নরম্যান এটিকে সংস্কৃত 'ইয়োতক' বা যৌতুকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, এখানে যার অর্থ আগাম বেতন। তিনি এখানে যে ভাবার্থ প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা হলো, দৈহিক শাস্তি দেবার পর তাদের তিনদিনের জীবিকার সংস্থান করতে হবে। অতএব এই অনুচ্ছেদে দেখা যায় যে, নির্ধারিত শাস্তিদানের পর অপরাধীদের অর্থমূল্যে দায়মুক্ত হবার বিষয়েও অশোক আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য অত্যুক্তিতে এটিই 'উত্তর-কারাবাস পরিচর্যা ব্যবস্থা' হিসাবে বর্ণিত হতেও পারে।

চতুর্থ স্তম্ভ অনুশাসনে কোথাও মৃত্যুদণ্ডের নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, অশোক এই শাস্তি বিলোপের বিষয়েও যে কিছু বলেননি, এটিও লক্ষণীয়। বিপরীতে, তাঁর ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ১.৪) তিনি অরণ্যবাসীদের উদ্দেশে এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, তারা যেন এমন কোনো আচরণ না করে যাতে তাদের হত্যা করতে হয় (হন্নহেয়াসু)।

কিন্তু তাঁর ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন এবং চতুর্থ স্তম্ভ অনুশাসন যেখানে তিনি ক্ষমার্হ সকলকেই ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেখানেই তাঁর অন্তরের বাসনা সুপরিস্ফুট। করুণার এই নীতি অনুসরণেই বেশি সংখ্যক মানুষকে, বিশেষত কারার অন্তরালে বন্দী মানুষদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করে, তাদের মুক্ত করবেন এই মর্মে সর্বত্র তিনি তাঁর মনোবাসনা ঘোষণা করেছেন। পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে নবনিযুক্ত ধম্ম-মহামাতদের কাজের মধ্যে তিনি আরো একটি কাজ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে কাজটি হলো, যে সমস্ত বন্দীর পোষ্য কিংবা সন্তানাদি রয়েছে কিংবা যারা জাদু ব্যবহারের জন্য অপরাধী! (কতাভিকারা) অথবা বৃদ্ধ সেইসব— "বেড়ি পরানো বন্দীদেরও পরিচর্যা করা, বেড়ি থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং তাদের মুক্ত করা" (নিষ্কর্ষ ২.৩)। তাঁর রাজত্বের ২৬ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪ অব্দ) স্থাপিত পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে, অশোক দাবি করেন যে, পঁচিশ বারের বেশি তিনি ঢালাও বন্দীমুক্তির আদেশ দিয়েছেন।

জীবে-দয়ার নীতিতে পরিচালিত হবার কারণে তাঁর রাজত্বে জীবহত্যা বন্ধ করা কিংবা অন্ততপক্ষে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা এবং তাঁর প্রজাদের নানান নিষ্ঠুর কাজ বন্ধ করার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল অশোককে। এইসব ব্যবস্থাদির মধ্যে, এমন অনেক ব্যবস্থাও আমরা দেখতে পাবো যেগুলি বিশেষ কোনো কোনো শ্রেণীর মানুষের রীতি-নীতি, বিশ্বাস এমনকি তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর আঘাত হানতে বাধ্য হয়েছিল। সম্ভবত রাজত্বের ১২ বর্ষে স্থাপিত পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে, অশোক তাঁর পাকগৃহে ও রাজপ্রাসাদে বিপুল সংখ্যক প্রাণীহত্যার সংখ্যা হ্রাস করে তিনটি প্রাণীতে স্থির করেছেন, এই মর্মে একটি ঘোষণা রয়েছে। রাজত্বের দশম বর্ষের (খ্রীস্টপূর্ব ২৬০ অব্দ c.) কান্দাহার দ্বিভাষিক অনুশাসনেও এই ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে এবং এর গ্রিক অনুবাদে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এরপর থেকে রাজা শিকারী ও মৎস্যশিকারীদের আর ডাক পাঠাতেন না।

পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হলো সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দে (c)। ডিক্রী জারি হলো, (প্রথম প্রস্তর অনুশাসন) এরপর থেকে বলিদানের উদ্দেশ্যে 'এখানে' কোনো জীবহত্যা চলবে না। 'এখানে' অর্থে সম্ভবত রাজধানী পাটলিপুত্রকেই বোঝানো হয়েছে। এই আচার পালনের উদ্দেশ্যে কোনো উৎসব বা জমায়েতের (সমাজ) আয়োজন করা যাবে না, যদিও অন্যান্য জমায়েতের যথাবিহিত অনুমতি দেওয়া

হলো। এবার অশোক যা করলেন সেটি হলো, মহান বৈদিক উৎসর্গ বিধির সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক প্রাণীহত্যাকেই নিষিদ্ধ করেছিলেন। বৌদ্ধ পুরাকাহিনীতে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধ অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে এই আচারকে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনার অভিঘাত এড়িয়ে-যাওয়া সত্যিই কঠিন।

নাগপুরের (মহারাষ্ট্র) দেওতেকে আবিষ্কৃত একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলক লিপিতে সম্ভবত রাজ্যপাল বা অধিনায়কের (সামি) কয়েকটি আদেশ রয়েছে। চিকাম্ববির (দেওতেক) আধিকারিকদের আদেশ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন (প্রাণীর) বলপূর্বক অধিকার এবং হত্যা বন্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিশদ বিবরণ লুপ্ত হয়েছে। এখানে তারিখ হলো ১৪ (সম্ভবত অশোকের রাজত্বের বর্ষ এবং সুতরাং খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬ অব্দ c.)। এই ভগ্ন বয়ানটি আবার আরমীয় অনুবাদে দুটি পথপ্রান্তে সম্ভবত স্থাপিত হয়েছিল। লাঘমানে (আফগানিস্তান) এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে বিবৃত রয়েছে যে, অশোক তাঁর রাজত্বের ষোড়শ বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৪ অব্দ c.) যেসব জনগোষ্ঠী পশু ও মৎস্য শিকারে জীবন নির্বাহ করতো তাদের উচ্চমর্যাদার আসন থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অশোকের সাবধান বাণীর সুরটি এই শিলালিপি থেকে ধরা যায়। এর বেশ কয়েক বছর পূর্বে জারি করা তাঁর ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে অশোক যে বনচারী মানুষজনের বিরুদ্ধেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেটি বেশ বোঝা যায় কেননা বন্য জাতিগোষ্ঠী মূলত শিকারের সাহায্যেই জীবনযাপন করতো আর জীবিকানির্বাহের এই বিশেষ পদ্ধতির জন্যই তারা নিন্দার্হ ছিল।

রাজত্বের ষষ্ঠবিংশতি বর্ষের (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪ অব্দ c.) পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে, অশোক প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এখানে খাদ্যের জন্য গ্রামীণ ও নাগরিক গোষ্ঠী যে গৃহপালিত পশু হত্যা করে তাদের সঙ্গে যারা খাদ্যের জন্য বলপূর্বক পশু ধরে এবং তাদের চামড়া তুলে নেয়, সেই অরণ্যচারী 'সংগ্রাহক' জনগোষ্ঠীর স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমোক্তদের কথা সাধারণভাবেই অশোকের স্মরণে ছিল এবং সেকারণেই তিনি ডিক্রী জারি করেছিলেন যে, কোনো চতুষ্পদ "যতক্ষণ না ভোগের পর্যায়ভুক্ত (পতিভোগম) এবং ভুক্ত হয়" ততক্ষণ তাকে হত্যা করা যাবে না। এদের মধ্যে যেসব পশু হত্যা করা যাবে তাদেরও তালিকাবদ্ধ করে বলা হলো যে, ছাগল, ভেড়া, ও শূকরের স্ত্রী-প্রজাতি যতদিন দুগ্ধবতী বা যৌবনবতী থাকবে ততদিন তাদের হত্যা করা যাবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও ছয়মাস বয়স পর্যন্ত অব্যাহতি দিতে হবে। কৌতূহলের বিষয় হলো ষাঁড় বা মহিষ নিধনে কোনো নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ নেই। অবশ্য সেগুলি সম্ভবত খাদ্যের জন্য ছাড়া অন্য কোনো পশুহত্যা করা যাবে না সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় ইতিমধ্যে সুরক্ষিত।

গৃহপালিত পশুদের ওপর যে ধরনের নিপীড়ন চলে তাকেও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। কোনো অবস্থাতেই মোরগকে খাসি করা যেতো না। আর ছাগল, ভেড়া ও শূকরদের পুরুষ প্রজাতিকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্বীর্য করা যেতো না। অবশ্য ঐসব দিনেও ঘোড়া এবং বলদের ক্ষেত্রে এ নিষেধ কার্যকর ছিল না। তবে এই নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিতরূপেই বসতিস্থাপনকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

যেসব প্রাণীহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, অতি সতর্কতায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকা বিশদ পরীক্ষার পর নর্মান জানিয়েছেন যে, এদের মধ্যে রয়েছে কথা-বলা পাখি, তিনটি প্রজাতির কবুতর-পরিবার; জলজ পাখিদের কয়েকটি, যার মধ্যে বাদুড়ের একটি প্রজাতিও আছে; কিছু জলজ প্রাণী এবং কয়েকটি সরীসৃপ। এই তালিকায় তাদের অন্তর্ভুক্তির কারণ সম্ভবত এই যে, এরা স্থায়ী বাসিন্দাদের খাদ্য ছিল না, এদের ভোক্তা ও খাদক ছিল বনচারী জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন। নতুবা এই নিষেধাজ্ঞা একটা অর্থহীন উদ্যোগ হয়ে যেতো। সাধারণভাবে মাছ-ধরা নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট ছিল, যখন মাছ-ধরা ও বিক্রয় করা চলবে না। 'হস্তীসমাকুল অরণ্য প্রদেশে' এই জাতীয় কোনো প্রাণী (সম্ভবত অশোক স্বয়ং হরিণ এবং ময়ূর জাতীয় যেসব প্রাণী ভক্ষণ করতেন তারাও এই তালিকায় রয়েছে) হত্যা করা যাবে না।

অরণ্যচারী এই জাতিগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন প্রবাহে বাধাদানের উদ্যোগ আরো একটি বাক্যে প্রতিফলিত হয়: "অকারণে কিংবা ক্ষতি (প্রাণীদের) করার জন্য অরণ্যে আগুন লাগানো চলবে না।" মাংস বা চামড়ার কারণে পশু ধরার জন্য ধোঁয়া সৃষ্টি করতে অরণ্যে আগুন লাগানোর কাজে বাধা দানের জন্য মনে হয় এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। অরণ্যের আদিম কৃষিজীবীদের 'কাটা-এবং-পোড়ানো' (ঝুম) রীতির বিরুদ্ধেই এ নিয়ম করা হয়েছিল।

'ধম্ম' সংক্রান্ত যে পরিকল্পনা তিনি আরম্ভ করেছিলেন সেটি চালু রাখার উদ্দেশ্যে, অশোক বিশেষ প্রয়োজনে অনেকবারই প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন। অনুশাসনগুলিতে, তিনি মৌর্য প্রশাসনে একটু মানবিক স্নিগ্ধ বাতাস আনতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জনগণের কাছে ঋণী, আর তাদের সুখের জন্য কাজ করেই যে তাঁকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে একথা তিনি স্বীকার করেছেন (চতুর্থ প্রস্তাব অনুশাসন এবং দ্বিতীয় পৃথক অনুশাসন)। ২.২ উপ-অধ্যায়ে এটি উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম পৃথক প্রস্তর অনুশাসনে তিনি তাঁর আধিকারিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের কাজের সুবাদে তাঁর কাছে এরকমই ঋণী এবং তাঁর আদেশ পালন করেই তাদের সেই ঋণ শোধ করতে হবে। জনকল্যাণ সুরক্ষিত করার জন্য একটি চুক্তিমূলক সম্পর্কের মধ্যে আবার আবেগের মিশেল দেওয়া হলো। দ্বিতীয় পৃথক প্রস্তর অনুশাসনে তিনি দাবি করেছিলেন যে, সমস্ত মানুষই তাঁর সন্তান এবং আপন

সন্তানদের মতো তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেও তাঁকে লড়াই চালাতে হবে। এমন সাধারণ বিবৃতি শুনলে মানুষ সাধারণত সতর্ক হয়ে যায়; কিন্তু অশোকের কথার সুরে এমন বিনয়, অসার আত্মশ্লাঘার এত অভাব যে তাঁর বিবৃতিগুলির মধ্যে অদ্ভুত এক আন্তরিকতার উপাদান সঞ্চারিত হয় আর সেকারণেই তাঁর বক্তব্যকে অশ্রদ্ধা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাঁর বজ্রকঠিন আমলাদের মন অশোক ঠিক একই উদ্দীপনায় পূর্ণ করতে পেয়েছিলেন কি না সেটা অবশ্য অন্য বিষয়। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং ভেবেছিলেন; পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৩) সেকথা তিনি আমাদেরও বলেছেন যে, ধম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধম্ম-মহামাত নামে নতুন একদল আধিকারিকের সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে এটা করা হয়েছিল (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৭ অব্দ c.)। ঐ একই অনুশাসনে সেকথাও বলা আছে। সেখানে এই নতুন আধিকারিকদের প্রধান প্রধান দায়িত্ব সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে। এখানে বর্ণিত তাদের কাজের তালিকা দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসন (নিষ্কর্ষ ২.৪) এবং সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনেও (নিষ্কর্ষ ২.৭) উল্লেখিত। আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল, সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী সীমান্তবর্তী মানুষজন সহ সমস্ত শ্রেণীর এবং সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধম্ম-এর বার্তা প্রচার করা। কাজটি প্রধানত মৌখিক প্রচারের মাধ্যমেই করা হতো। তাদের অন্যান্য মানবিক কাজেও যুক্ত করা হতো, যেমন দরিদ্র, বয়স্ক ইত্যাদি মানুষদের পরিচর্যা করা, বন্দীদের প্রতিও যত্নবান হওয়া এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। একতার ভাবনা প্রচার করা এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান-বিনিময়ের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষভাবে তাদের বলা হয়েছে। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে অত্যন্ত উৎসাহে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৌদ্ধ সঙ্ঘ, ব্রাহ্মণ, অজীবিক এবং জৈনদের কী প্রয়োজন তা দেখাশুনার কাজে এইসব আধিকারিককে যুক্ত করা হতো। এই সমস্ত কাজে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। অতএব ধম্ম-মহামাতদের উপর রাজকীয় দান-তহবিলের অর্থ বন্টনের দায়িত্ব ছিল। রানী, রাজপুত্র এবং রাজকন্যাদের নিজস্ব অঞ্চলেও যে এদের নিয়োগ করা হতো সেকথা পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে উল্লিখিত হয়েছে। সপ্তম প্রস্তর অনুশাসনে আবার এ বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা হচ্ছে যে, রানী এবং রাজ-অন্তঃপুরিকা ইত্যাদিদের নিজস্ব আধিকারের এলাকা যা "এখানে (পাটলিপুত্রে) এবং প্রদেশগুলিতে" অবস্থিত সেখানেও এইসব আধিকারিকেরা দাতব্য বা দান বন্টন করবেন। রানীর স্তম্ভ অনুশাসন (এলাহাবাদ) এ বিষয়ে আমাদের কিছু সাহায্য করে। রাজপরিবার কী ধরনের দান-ধ্যান করতো যে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে জানানো হচ্ছে— যেমন 'আম্রবীথি, আশ্রয়াবাস, অনাথ-আশ্রম, ইত্যাদি।"

ধম্ম-মহামাতদের কর্তব্যকর্মের বিস্তারিত বর্ণনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত

আমলাতন্ত্রের কোনো কাজই তাদের করতে হতো না। (এ বিষয়ে ১.৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রশাসনিক কাজে একটা নতুন পর্ব শুরু করা, প্রস্তর এবং স্তম্ভ অনুশাসন লিপিবদ্ধ করা, ধম্ম প্রচারের জন্য পরিভ্রমণে যাওয়া, বিচার বিভাগীয় প্রশাসনে সাম্য এবং স্বচ্ছতা আনা ইত্যাদি সব কাজের জন্য, এই নতুন শ্রেণীর অধিকারিকদের প্রয়োজন হয়েছিল। ধম্ম বিজয়ের কাজে যোগ দেবার জন্য তারা প্রচণ্ড কাজের চাপে ছিলেন। কিন্তু কতটা সাফল্য তারা পেয়েছিলেন, সে বিচার আমরা করতে পারি না।

ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ১.৪) ধম্ম বিজয়কে সাধারণ বিজয় বা অঞ্চল জয় কিংবা অস্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত বিজয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে সমান গুরুত্বে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অতএব অশোকের পরিকল্পিত অভিযানের মধ্যে সেনাবাহিনীর অবস্থান ঠিক কোথায়, এই অনুশাসনের বক্তব্যে সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হই। চারিত্রিক বিচারে অশোকের ধম্ম ব্রাহ্মণ্য পরম্পরায় এর যা অর্থ তার থেকে স্বতন্ত্র। অতএব "ন্যায়পরায়ণ বিজেতা" (ধর্মবিজয়ী) যিনি তাঁর বিজয়ে পরাজিত প্রতিপক্ষের জমি এবং সম্পত্তি অধিকার না করে কেবল তাদের আত্মসমর্পণেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর যে কাজের বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে XII ১.১১ দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে ধম্মবিজয়ের কোনো সাধারণ সাদৃশ্য নেই। অশোকের ধম্মবিজয়, এর ঠিক বিপরীতে, নৈতিক জগতের বিজয় বা সাফল্যের কথা বলে। সাম্রাজ্যবিস্তারী নীতির মধ্যেও ধম্মবিজয়ের নীতির কিছু সুস্পষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে অশোক সেই কথা ব্যক্ত করেছেন। কোনো নতুন অঞ্চল জয় করার প্রয়োজন নেই, অশোক বলছেন; তাঁর উত্তরসূরিরাও অবশ্যই অস্ত্রের সাহায্যে বিজয়ের পথ পরিত্যাগের শপথ নেবে। কিন্তু বাস্তবের বিচারে অশোক বিজয়ের এই পথকে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা কি তখনও অস্ত্রের সাহায্যেই রাজ্য বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেবে, অশোক অনুরোধ জানাচ্ছেন, যদি করতেই হয়, তবে যেন "নম্রভাবে এবং সামান্য শাস্তি-বিধানে সেটি সম্পন্ন হয়। একজন শাসক যিনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্য কোনো সৈন্যদলই রেখে যাচ্ছেন না, তাঁর মুখে এমন কথা কদাচিৎ শোনা যায়। সীমান্তে নিযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ, অমতামহামাতদের সকলের থেকে পৃথক করে তাদের উদ্দেশ্যে প্রথম স্তম্ভ অনুশাসনে পরামর্শের শেষ শব্দগুলি উচ্চারিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে অশোকের বিশেষ কিছু ভাবনা বা পরিকল্পনা ছিল। অনুশাসনের এই শেষ বাক্যটি পড়ার বিষয়ে কারোর ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ ছিল না। অতএব এখানেই অশোকের অভিপ্রায়ের একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত মেলে যে তাঁর অধিকারিকগণ ধম্ম-এর সাহায্যেই সীমান্ত এলাকা রক্ষা করুন, এই ছিল তাঁর মনোবাসনা।

ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন একটি বিষয় আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজশক্তির বজ্রমুষ্টি দুর্বল করা মোটেই অশোকের উদ্দেশ্য নয়। যাদের ক্ষমা করা চলে, তাদের সকলকেই তিনি ক্ষমা করতে চান এবং অরণ্যের আপাতভাবে অবজ্ঞেয় প্রতিপক্ষ মানুষজন কলিঙ্গ-হত্যার পর তাঁর যে অনুশোচনা সে সংবাদ অবহিত হোক এটিও তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর 'শক্তি'-র (প্রভাব) কথাও তাদের জানানো হবে যাতে তাদের নিহত না হতে হয়। পৃথক প্রস্তর অনুশাসনেও বস্তুত সীমান্ত অঞ্চলের অদমিত মানুষজনদের (অমতা-অবিজিতা) উদ্দেশ্যেও অনুরূপ আবেগ ব্যক্ত হয়েছে। আবেদন নিবেদনের সাহায্যে দমনের নীতি যদি পরাভূত হয়, তবে উপায় হিসাবে, সেকারণেই সামরিক শক্তিকে মজুত রাখতে হয়েছিল। আমাদের স্মরণ থাকতে পারে যে, অন্তিম পর্যায়ের একটি অনুশাসন, ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসনে (সারনাথ ভাষ্য) অশোক "কোটবিশ্য" অর্থাৎ 'দুর্গ পরিবৃত জেলা'-র উল্লেখ করেছিলেন; অতএব প্রয়োজনে দমন করার উদ্দেশ্যে নানান অঞ্চলে দুর্গগুলি যে বেশ অটুট ছিল, আবার সে ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত অশোকের গ্রিক এবং আরমীয় শিলালিপি-সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, আফগানিস্তানে বিশাল অংশ নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অশোক সামরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনের কিয়দংশ আরমীয় কান্দাহার বাজার শিলালিপিতে পাওয়া যায়। অতএব অশোকের রাজত্বকালের সপ্তবিংশতি বছর (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c.) অবধি ঐ অঞ্চলে অশোকের অধিকার অব্যাহত ছিল। বুনের থেকে পাওয়া একটি ব্রাহ্মী প্রস্তরখণ্ডের ফলকে দেখা যায় ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনের কিয়দংশ। অন্তত তাঁর রাজত্বের ২৬ বর্ষেও (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪ c.) কিংবা অন্তত সেসময় অবধি যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উত্তরাংশে অশোকের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রয়েছে, এটি তার আর একটি সাক্ষর। মৌর্য সশস্ত্র বাহিনীর অবিরাম উপস্থিতি ব্যতিরেকে এতো সংকটময় এবং এত দূর-অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না।

অবশ্য দাক্ষিণাত্য থেকে সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্যকে পিছু হটতে হয়েছিল। কেননা, চোদ্দটি প্রস্তর অনুশাসন, দুটি পৃথক অনুশাসন এবং দেওটেক শিলালিপি এগুলির পরে নর্মদার দক্ষিণে আমরা আর কোনো অশোকের শিলালিপির সন্ধান পাই না। এর অর্থ হলো, খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬ অব্দের (c.) পর ঐ অঞ্চলে মৌর্য অধিকার টিকে ছিল কি না তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অবশ্য ভগ্নপ্রায় অমরাবতী স্তম্ভ লিপিতে যদি অশোকের কোনো অনুশাসন থাকে তবে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দের পূর্বে তটবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মৌর্য শক্তির সরে আসার ঘটনা সম্ভব নয়। অশোকের যে কোনো ব্রাহ্মী স্তম্ভলিপিতে প্রাচীনতম ওই সময়কালই পাওয়া যায়।

অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, ধম্ম-এর কাজে অশোক নিজেকে এইভাবে

উৎসর্গ করার ফলে সামরিক শক্তিকে তিনি অবহেলা করেছেন এবং তারই ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কালটি দ্রুত এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিছকই অনুমান নির্ভর, আমাদের প্রাপ্ত সাক্ষ্যে একে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যায় না।

অশোকের অর্জনের পরিমাণ বিচারের সময় এবার এসেছে। এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিচার খোদিত আছে দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪ অব্দ c.)। অত্যন্ত সাধারণ এবং শোভন সে বিচার। মানব জাতি এবং প্রাণীদের জন্য তিনি কী সুবিধা দিতে পেরেছেন কেবল সে কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত অনুশাসনে নিশ্চিতরূপে, যেটুকু অর্জন করা গেছে সে বিষয়ে 'হামবড়া ভাব' বা ক্রমবর্ধমান আত্ম-শ্লাঘা প্রদর্শনের পরিবর্তে বেশ সন্তোষের মনোভাব ঘোষিত হয়েছে। প্রথমোক্ত বিচারটি যে যথেষ্ট রুক্ষ সেটিও সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৭) ব্যক্ত হয়েছে। দীর্ঘতম এই অনুশাসন, কিন্তু এর যৌক্তিক ভাবনার কথা মনে রাখলে, এটিকেই সম্ভবত গঠনকাঠামোয় অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন বলা যায়। রাজত্বের সপ্তবিংশতি বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c.) এটি জারি করা হয়েছে। অশোক এখানে বলেছেন যে, ধম্ম প্রচারের জন্য কীভাবে তিনি অনুশাসন জারি করতে শুরু করেন; জনকল্যাণের কাজ করেন; সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দেখাশুনা করেন; দান এবং দাতব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করেন; নিয়ন্ত্রণ (নিয়মা) এবং আবেদন-নিবেদন (নিঝাতি) উভয় পদ্ধতিতেই ধম্ম প্রচার করেন। তিনি স্বীকার করেই নেন যে, আবেদন নিবেদনের তুলনায় কিছু কিছু প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধকরণ জাতীয় নিয়মকানুনে (উদাহরণ হিসাবে এই ঘটনার কথা তিনি বলেছেন) 'সামান্য ফল'-ই পাওয়া গেছে। তিনি ততদিনে যথেষ্ট কৌশলী; স্পষ্টই অনুভব করেছেন, যে বিশাল ফললাভ তাঁর লক্ষ্য নিছক প্রশাসনিক নির্দেশে তা অর্জন করা যাবে না। লিখিত ভাষ্যে ও মৌখিক কথনে আবেদন-নিবেদনের যে প্রবল প্রচেষ্টা তিনি করেছেন সেটিই তাঁর বিপুল সাফল্য হিসাবে পরিগণিত হলো। আধুনিক জগতে নানান বিষয়ে যারা প্রচারের কাজ করছেন তারা নিবিড় বিবেচনায় তাঁরই প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করেছেন।

অশোকের সমসাময়িক জগতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে তাঁর এই চেষ্টা কতটা সফল হয়েছিল? শ্রীলঙ্কা এবং মহাযান চিরায়ত রচনায় তাঁর সর্বোত্তম সাফল্য হলো : বৌদ্ধধর্মের বিস্তার। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অশোক একেবারেই নীরব। এই প্রশ্নটি ৩.৩ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে আমরা এইমাত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেটি বিচার-বিবেচনা করে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, নিছকই মেনে-নেওয়া একটা অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অবস্থান থেকে অশোকের ছত্রচ্ছায়ায় বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রপ্রধানের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যতম ধর্ম হয়ে উঠেছিল (সপ্তম প্রস্তর অনুশাসনে কীভাবে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বৌদ্ধ সঙ্ঘের অবস্থান একেবারে প্রথমে— নিষ্কর্ষ ২.৭)। এর পরবর্তী দশ বছর বা তারও পরে শাসকবর্গ এবং সাধারণ মানুষের কাছে

যত দান সেই সঙ্ঘ পেয়েছে, যত কীর্তি স্থাপন করতে পেরেছে, সবই পূর্ববর্তী সময়কালে যে কর্তৃত্বময় অবস্থান এই সঙ্ঘ অর্জন করতে পেরেছিল তারই সাক্ষ্য বহন করে। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে এই ধর্মীয় বিপ্লবে অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের উন্নতি যেভাবে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে বিচারে অশোকের ধম্ম-এর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অভিঘাত নির্ধারণ করা অত সহজ কাজ নয়। বর্ণের প্রশ্নটি তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন অথচ নিজে 'দাস এবং ভৃত্য'সহ নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন (পূর্বের ২.২ দ্রষ্টব্য)।আবার সেই সঙ্গে অরণ্যচারী মানুষজন, সংখ্যার বিচারে সেসময় জনসমষ্টিতে যাদের অনুপাত যথেষ্ট বেশিই ছিল তাদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে সরাসরি আদেশ জারি করেছিলেন। তবে সাধারণভাবে অশোক অনুসৃত নৈতিকতা সেসময়ের ক্রম-জাগরূক বর্ণ ব্যবস্থার বিপরীত ধারাকেই উপস্থাপিত করেছিল, এভাবেই যুক্তি বিন্যাস করাই সঙ্গত (এর আলোচনায় পরবর্তী ৩.২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অশোকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সর্বজনীনতার উপাদান ছিল তার সঙ্গে এই সমস্ত কাজের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইওনাদের (গ্রিক) প্রতি, সাম্রাজ্যের বহিঃস্থ ইওনা শাসকদের প্রতি তিনি যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন সেটিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। গ্রিক এবং ইরানীয় প্রভাবের সামনে ভারতবর্ষকে তিনি উন্মুক্ত করেননি; কেননা আকামেনেদীয় অনুপ্রবেশ এবং আলেকজান্ডারের আক্রমণ এর পূর্বেই ভারতবর্ষ সে দ্বার উন্মুক্ত করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে এই উন্মুক্ততার পরিসর প্রসারিত করেছিলেন। যে শিল্পের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তার মধ্যেই এই প্রসারণ প্রতিফলিত হয় (পরবর্তী ৩.৫ অধ্যায়)। এ ক্ষেত্রটিতে তাঁর অবস্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ কেননা একমাত্র তাঁরই হাত ধরে ভারতবর্ষের শিল্পকলার ইতিহাস শুরু হয়েছিল। তাঁর সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে অশোক তাঁর সাফল্যের যে কাহিনী আমাদের বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অর্জন সেসবের চেয়েও অনেক অনেক মহত্তর। তাঁর গুণাগুণের কোনো বিশেষণের প্রয়োজন নেই। সেসব ব্যতিরেকেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব হয়ে রয়েছেন।

২.৪ অশোকের উত্তরাধিকারীবৃন্দ এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

অশোকের অনুশাসন থেকে তাঁর পরিবার সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছি স্বাভাবিক কারণেই তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১.৬ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, অনুশাসনগুলিতে কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, কুমারগণ অর্থাৎ রাজপুত্রেরা উজ্জয়ন, তক্ষশিলা এবং তোমালি (উড়িষ্যা)-তে কর্মে নিযুক্ত থাকবেন, এবং একজন আয়পুত্র (প্রভুর সন্তান) তিনি থাকবেন সুভন্নগিরিতে (দক্ষিণ ভারত)। একজন মাত্র

রাজকুমার কুমার শাম্ব, তাঁর নামের উল্লেখ আছে (পাঙ্গরুরিয়া শিলালিপি)। কিন্তু ঐসমস্ত রাজকুমারের সঙ্গে অশোকের সম্বন্ধ আমাদের অজানা। তাছাড়া এ-সমস্ত উল্লেখই রয়েছে তাঁর রাজত্বের ১০-১৩ বছরে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ২৬০-২৫৭ অব্দে (c.)। তাঁর ষষ্ঠ (নিষ্কর্ষ ২.৫) এবং ত্রয়োদশ (নিষ্কর্ষ ১.৪) প্রস্তর অনুশাসনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে 'পুত্রগণ এবং দৌহিদ্রগণ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পঞ্চম প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৩) রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (c. খ্রিস্টপূবল ২৫৭) ধম্ম-মহামাতদের কর্মে নিযুক্ত করার বিজ্ঞপ্তি জারির সময় তিনি উল্লেখ করলেন যে, কেবলমাত্র তাঁর অন্তঃপুরিকা (ওরোধনা) এবং তাঁর ভ্রাতা, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়দের অন্তঃপুরিকাদের এলাকায় এইসব ধম্ম-মহামাতগণ কাজ করবেন। সম্ভবত সেসময় তাঁর পুত্ররা বয়সে এতই নবীন ছিল যে তারা উপযুক্ত হয়ে উঠেনি; ফলে তাদের পৃথক গৃহস্থালিও ছিল না। রাজত্বের ২৭ বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c.) জারি করা তাঁর সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে, তিনি 'আমার রানীগণ (দেবী), এবং আমার সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণ" এবং তাঁর "সন্তানগণ এবং রানীদের গর্ভজাত রাজকুমারগণ (দেবীকুমার)" ও এদের অন্তঃপুরিকাদের দানের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভ্রাতা এবং ভগ্নীদের কথা আর উল্লিখিত হয়নি। সম্ভবত ততদিনে তাঁদের আর বিশেষ গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে একটি বিষয় যথেষ্ট পরিষ্কার যে, তাঁর নিজস্ব ওরোধনা যেটি সম্ভবত তাঁর কম গুরুত্বপূর্ণ পত্নী এবং গৃহস্থালির অন্যান্য নারীদের বাসস্থান, সেই গৃহ থেকে তাঁর রানীদের এবং সন্তানদের গৃহস্থালি পৃথক হয়ে গেছে।

তথাকথিত রানীর অনুশাসন-এ এই পরিস্থিতির একটি নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যায়। এলাহাবাদ স্তম্ভে যে ক্রমপর্যায়ে এর অবস্থান সেটি বিচার করে বলা যায় যে, রাজত্বের ২৬ বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪ অব্দ c.) জারি-করা ১ম ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনগুলি খোদিত করার পরেই সম্ভবত 'ঐ অনুশাসনটি এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ হয়েছে। এই অনুশাসনে "দ্বিতীয়া রানী (দুতিয়া দেবী) কালুভাকি (কারুবাকি); তিভালা (তিভারা)-র মাতা"-এর দানের উল্লেখ রয়েছে। আম্রকানন, আশ্রয়ভবন, ত্রাণ-শিবির ইত্যাদি রূপে রানীর এই দান বিষয়ে তাঁরই অনুরোধে অশোক চেয়েছিলেন যে, 'মহামাতগণ সর্বত্র' যেন এই দানকে স্বীকৃতি দেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় এই অনুশাসন পড়া যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর মর্যাদা পেয়েছেন কালুভাকি। এর অর্থ হলো যাঁর নিম্নে তাঁর অবস্থান তিনি নিশ্চয়ই অশোকের প্রথমা রানী যদিও তাঁর নাম আমাদের অজানা। অশোকের শেষ জীবনে তরুণী ও প্রধানা মহিষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রতিহিংসা পরায়ণা তিস্যারাক্ষা, বৌদ্ধ চিরায়ত কাহিনীতে যার চিত্র আমরা পাই— কারুভাকির মধ্যে সেই তিস্যারাক্ষার ছায়া সন্ধান করার একেবারেই কোনো যুক্তি নেই।

আবার আমরা সেই পুরাতন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াই— বৌদ্ধ চিরায়ত বিবরণগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য— সময়ের বিচারেও সেগুলি অনেক পরবর্তীকালের এবং প্রায়শই গল্পকথা এবং কল্পকাহিনীতে পূর্ণ। তিস্যারাক্ষার সম্পর্কে অন্তত একটা কথা বলা চলে যে, শ্রীলঙ্কার মহাবংশ, XII ৩-৬ (এর পূর্ববর্তী দীপবংশে নেই) এবং মহাযানী দিব্যবদন, উভয়স্থানেই তাঁর নাম উল্লিখিত। তিনি এবং পবিত্র বোধিবৃক্ষ সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ— তাঁকে ঘিরে এই যে গল্পকথা সেটির হয়ত মূল কোনো উৎস রয়েছে। কিন্তু অশোকের পুত্র কুনালের বিরুদ্ধে তাঁর কাহিনী শুধুমাত্র দিব্যবদনেই সীমাবদ্ধ। অথচ কুনাল কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ পুরাণের তালিকায় অশোকের পুত্র এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্ণিত। সুতরাং তিনি সম্ভবত একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেও তিনি এমনকি তক্ষশিলার শাসক-প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিব্যবদন সেরকমই দাবি করছে। বৌদ্ধ মঠে সাধ্যাতিরিক্ত দান করার জন্য অশোকের তহবিল শূন্য হয়ে গিয়েছিল— এই মর্মে উচ্চারিত দিব্যবদনের বিবৃতিও অল্পস্বল্প বিশ্বাসযোগ্য হতেও পারে। কথিত আছে যে, মন্ত্রীরা শেষাবধি কুনালের পুত্র, যুবরাজ সম্পাদি অথবা সম্পাতির নিকট আবেদন করেন কেননা তিনি তহবিল থেকে আর অর্থ-নিষ্কাশন বন্ধ করে দয়েছিলেন। সুতরাং জীবনের শেষ কয়েকটি বছরে অশোক একেবারেই ক্ষমতাহীন ছিলেন, যদিও মৃত্যুর পূর্ব অবধি (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪ অব্দ, c.) তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সম্পাতি উজ্জয়নের শাসক হিসাবে স্মর্তব্য এবং জৈন পুরাকাহিনীতে তাঁকে জৈন ধর্মের মহান পৃষ্ঠপোষক অভিধায় (হেমচন্দ্রের, দ্বাদশ দেশ-এ লিপিবদ্ধ) ভূষিত করা হয়েছে। পৌরাণিক ‘ক ভাষ্য’ (আমাদের নিষ্কর্ষ ১.১)-এর তালিকায় অশোকের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর নামের উল্লেখ আছে। সেখানে অবশ্য তাঁকে কুনালের পুত্র বলা হয়নি। তিনি দশরথের সন্তান এবং আপাত বিচারে অশোকের প্রপৌত্র।

দশরথ আবার আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে ফিরিয়ে আনেন। কেননা তাঁর সিংহাসনে আসীন হবার বছরেই, দক্ষিণ বিহারে নাগার্জুন পর্বতের তিনটি গুহায় খোদিত সংক্ষিপ্ত শিলালিপি তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সিংহাসনে আরোহণের বছরে চিহ্নিত ওই গুহাগুলি অজীবিকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে। অতএব একেবারে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বলে দেওয়া যায় তিনি হলেন দাশরথা দেবনামপিয়া। অশোক পরবর্তী বিভিন্ন শাসকদের রাজত্বের সে সময়সীমা মৌর্য বংশের দুটি কাহিনীতেই লিপিবদ্ধ করা আছে, তার নিরিখে দেখা যায়, ‘ক’ ভাষ্যের পৌরাণিক তালিকাটি ক্রমশ দীর্ঘতর এবং উভয় রচনাতেই সমগ্র মৌর্য রাজবংশের রাজত্বকালের যা দৈর্ঘ্য, দশরথের রাজত্বকাল তদপেক্ষা দীর্ঘতর। সুতরাং আমরা বাস্তবিকই দশরথের সিংহাসন লাভের তারিখটি নির্দিষ্ট করতে পারি না। অবশ্য

ঘটনাটি খ্রিস্টপূর্ব ২১১ অব্দের (c.) বেশ কিছু পূর্বেকার হবেই (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪ অব্দের (c.), যে বছরে অশোকের মৃত্যু হয় তার পর থেকে দশরথের পূর্ব অবধি অশোকের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীগণের রাজত্বকাল যদি আমরা সরাসরি বাদ দিতে পারি তবেই ওই তারিখটা পাওয়া যায়)। দশরথের শিলালিপির ভাষা এবং লিপি-চিত্র অবশ্য অশোকের সময়কালের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার আভাস দেয়।

পৌরাণিক কাহিনী এবং দিব্যবদন, এই দুই স্থানে বিধৃত অশোকের উত্তরাধিকারীগণের তালিকায় এই যে বিভিন্নতা, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী মৌর্য রাজপুত্রদের উত্থানের নিরিখে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং মৌর্য শাসকদের কয়েকটি সমান্তরাল ধারার আবির্ভাব ঘটছিল। ক পৌরাণিক ভাষ্যে যেহেতু দশরথের নামোল্লেখ রয়েছে, সুতরাং সেটি মৌর্য সাম্রাজ্যের মূল বা মগধের বংশসূত্রটি আপাতভাবে চিহ্নিত করছে। দশরথের গুহালিপিতেও মগধে তাঁর শাসনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত।

অশোকের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সম্ভবত খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল। কলহন রচিত কাশ্মীরের বিখ্যাত ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। এই ইতিহাসে কথিত (I ১০১-১৫২) যে, বৌদ্ধধর্মে অনুগত রাজা অশোক 'যিনি সারা পৃথিবী শাসন করতেন', তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র জলৌকা সিংহাসনে বসেন। তিনি কাশ্মীরের শক্তিশালী শাসক এবং ভগবান শিবের একজন ভক্ত ছিলেন। একথা যদি সত্য হয় যে কাশ্মীরও পূর্বে মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, তবে এই কাহিনীর প্রস্তাবনায় এ অঞ্চল একজন মৌর্য রাজপুত্রের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু এই পুরাকথা অনেক পরবর্তীকালের এবং এছাড়া জলৌকার নাম অন্যত্র কোথাও কখনো শোনা যায়নি।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পরবর্তী উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে অন্য সাক্ষ্যটি গ্রিক-সূত্র থেকে এসেছে এবং সেটি বেশ শক্তিশালী। অশোক তাঁর দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে যখন সেলুকসীয় শাসক দ্বিতীয় আন্টিওখুশের (খ্রিস্টপূর্ব ২৬১-২৪৭ অব্দ) কথা বলেন, তখন তিনি তাঁকে প্রতিবেশি হিসাবেই গণ্য করেন। কিন্তু প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫৫ অব্দে, মাসেডোনীয়রা অথবা বাকট্রিয়ার গ্রিকরা (উত্তর আফগাস্তিান) ডিওডোটাসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। আরো পশ্চিমে পার্থিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে খ্রিস্টপূর্ব ২৪৮-২৪৭ অব্দে পার্থিয়ান বর্ষপঞ্জীর সূচনা করেছে। আফগানিস্তানে মৌর্য-অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্ত রেখা অভিমুখে সেলুকাসের যাত্রাপথ এই শেষোক্ত ঘটনায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। গ্রিক ভৌগোলিক এরাটোসথেনস ঠিক সেই সময়কালে বা তার সামান্য পরে পূর্ব ইরান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। কিন্তু তাঁর যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরবর্তীকালের লেখকদের রচনার মাধ্যমে আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে সেখানে সে অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

একটি বাক্যও লেখা হয়নি। আমরা অন্যসূত্রে জানতে পারি যে, তাঁর রাজত্বকালের শেষ পর্বে পার্থিয়া পুনর্দখলের জন্য দ্বিতীয় সেলুকাসের প্রচেষ্টা (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭-২২৬ অব্দ) শেষাবধি ফলপ্রসূ হয়নি। তবে তাঁর উত্তরাধিকারী তৃতীয় আন্টিওখুস ('মহান') (খ্রিস্টপূর্ব ২২৩-১৮৭ অব্দ), পূর্বাঞ্চলে সেলুকাসীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ বিজয়-অভিযান শুরু করলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২১০-২০৯ অব্দে (c.) তিনি পার্থিয়ান শাসক আর্সাকেসকে একজন সামন্ত রাজার অবস্থান মেনে নিতে বাধ্য করলেন; এবং তারপর আরিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে (পশ্চিম আফগানিস্তান) দু-বছরের দীর্ঘ যুদ্ধে (খ্রিস্টপূর্ব ২০৮-২০৬ অব্দ), অনুরূপে ব্যাকট্রিয় রাজা ইউথিডেমুসকে তাঁর অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য করলেন। এরপর তৃতীয় আন্টিওখুস খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

প্রায় সমসাময়িক একজন গ্রিক ঐতিহাসিক পলিবিউসের পৃথিবীর ইতিহাসের একাংশে (XI. ৩৪) কথিত ছিল যে, আন্টিওখুস হিন্দুকুশ পর্বতমালা (ককেশাস) অতিক্রম করে সম্ভবত কাবুলের নিকটে "ভারতীয়দের রাজা সোফাগাসেনুসের সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন"। কিন্তু মৌর্য শাসকদের প্রচলিত তালিকায় সুভাগসেনা (সম্ভবত ওই নামটির সংস্কৃত রূপ) নামে কোনো শাসক পাওয়া যায় না; এক্ষেত্রে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন হয় মৌর্য রাজপুত্রদের একটি সমান্তরাল শাসকগোষ্ঠী কিংবা স্বতন্ত্র কোনো রাজবংশের অধীনস্থ ছিল। পলিবিউসের বিবৃতি অনুযায়ী, সোফাগাসেনুসের কাছ থেকে আন্টিওখুস কিছু হাতি পেয়েছিলেন, ফলে তাঁর সংগৃহীত হস্তী সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫০ (কয়েকটি তিনি ইউথিদেমুসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন)। অনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদেরও অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। এরপর আন্টিওখুস এগিয়ে চললেন আরাকোসিয়া (কান্দাহার) অভিমুখে, পেরিয়ে গেলেন ইরিমানথুস (হেলমন্দ) নদী এবং ইরান প্রত্যাগমনকালে অতিক্রম করলেন দ্রাজেনে (ঝারাং = সেইস্তান) খ্রিস্টপূর্ব ২০৫ অব্দ c.)। আরাকোশিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রাপথ— এই তথ্যে বোঝা যায় যে কান্দাহার (অশোকের শিলালিপির স্থান) পুনরায় সেলুকাসীয় সাম্রাজ্যের অধীনে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ যেহেতু আর এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কারণে সীমান্ত অঞ্চলে এইসব ঘটনাবলী সম্পর্কে পাটলিপুত্রের মৌর্য রাজসভার সম্ভবত কোনো চিন্তা ছিল না। পৌরাণিক তালিকায় দেখা যায় যে, মৌর্য যুগের শেষ তিনজন শাসক সময়ের একই পরিসরে রাজ্যশাসন করেছেন এবং তাঁদের নামও এক (সামান্য কিছু পার্থক্য ছাড়া) (নিষ্কর্ষ ১.১ দ্রষ্টব্য)। কথিত আছে যে, শেষ শাসক বৃহদ্রথ সাত বছর রাজত্ব করার পর তাঁরই সেনানায়ক (সেনানী) পুষ্যমিত্রের বিদ্রোহে সিংহাসনচ্যুত হন। পুষ্যমিত্র হলেন শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পৌরাণিক বিবরণে

যেহেতু একথাও স্বীকৃত যে, মৌর্যগণ ১৩৭ বছর রাজত্ব করেছিল, সে কারণে এই ঘটনার সময়কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দ (c.)।

অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যে এত দ্রুত মৌর্য সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল এবং তার পতন ঘনিয়ে এল, তার কারণ অনুসন্ধান খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এতই সামান্য শেষাবধি আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে অনুমানেরও একটা সীমা আছে। প্রশাসনের নীতির প্রভাবে সামরিক শক্তির বিষয়ে অশোকের যে উপেক্ষা, তারই ওপর সমস্ত দোষ চাপানো একটা সাধারণ এবং বেশ প্রচলিত প্রবণতা। পূর্বে আমরা দেখেছি, এই উপেক্ষার কোনো বাস্তব সাক্ষ্য নেই। তাছাড়া আমরা পর্যন্ত বিচার করতে পারি, তাতে অশোক তাঁর শাসনকালের শেষ পর্যায়েরও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রীতিমত নিজ অধিকারে রেখেছিলেন।

অন্য অভিমতটিও সমপরিমাণে অস্পষ্ট। এক্ষেত্রে অনুমান করা হচ্ছে যে, অশোকের বৌদ্ধ-ঘেঁষা নীতির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতে মৌর্য সাম্রাজ্য ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অশোকের ব্যবহার যে খারাপ ছিল কিংবা তাদের নির্যাতন করা হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। অশোক তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ অনুশাসন ৭ম (রাজত্বের ২৭ বছর : খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c.)-এ সমনদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও দান করার কথা বলে চলেছেন। যাই হোক, অশোকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ তাঁর মতো এমন অনুশাসন রেখে যায়নি (দশরথের তিনটি গুহা-লিপি ব্যতিরেকে) যাতে বোঝা যায় যে, তাঁর ধম্ম-সংক্রান্ত পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত রাখতে অন্য কেউ আগ্রহী ছিল। যাই হোক, ব্রাহ্মণ অসন্তোষের কোনো সামান্যতম কারণও পাওয়া যায়নি। তবুও যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শুঙ্গদের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের' পুনরুত্থানে মৌর্যগণ সিংহাসনচ্যুত হয়েছিল, তাহলে পুরাণেও নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও এ ঘটনার সামান্য স্বীকৃতি পাবার প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু এমন কোনো অনুমোদন কোথাও নেই। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যবদন এমনকি পুষ্যমিত্রকেও (পুষ্পমিত্র) মৌর্য রাজবংশের কোনো একটি ধারার অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। অবশ্য যদিও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তাদের বৈরিতার মনোভাব লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত ভারহুতের স্তূপ (একই জেলা, মধ্যপ্রদেশ) যে 'শুঙ্গদের একাধিপত্যে' প্রধানত নির্মাণ করা হয়েছিল সেকথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। যে শাসনব্যসস্থা সমুদ্র তটবর্তী অন্ধ্রে মৌর্যদের সাফল্য এনে দিয়েছিল, সেটিই আবার অমরাবতী স্তূপ-এলাকার প্রসারণে কোনোভাবেই বাধা দিতে পারেনি। বস্তুত পার্থিব অবশেষের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, উত্তর-মৌর্য যুগের নানান বৈরিতার মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের এই উপাসনাস্থলসমূহ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখতে পেরেছিল।

আরেকটি কারণ সম্ভবত রাজ পরিবারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দিব্যবদনে কথিত কুনালের কাহিনীকে মর্যাদা না দিলেও এ ঘটনা ঘটতে পারে। অশোকের নিজের অনুশাসনে দেখা যায় যে রাজপুত্রগণ (কুমার, আয়পুত্র) শাসক-প্রতিনিধি এবং রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত আছেন। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে, আমরা তাদের পৃথক গৃহস্থালী এবং স্বতন্ত্র দানের জন্য যথেষ্ট সম্পদের প্রমাণ পাই। এমন একটা পরিস্থিতিতে স্বভাবতই নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজপুত্রগণ ক্রমশ অধিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং নানান পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করবেন। ফলে সিংহাসনের প্রতি তাদের দাবির ভিত্তি প্রস্তুত হবে এবং শেষাবধি সাম্রাজ্যের বিভাজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মৌর্য আমলাতন্ত্র যেহেতু বিবিধ জাতি ও ভাষাভাষী মানুষে গঠিত ছিল, সে কারণেই হয়ত এমন দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। ১.৬ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মগধের প্রাচীন অভিজাতদের পাশাপাশি প্রশাসনে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আধিকারিকদের একটি বিশাল গোষ্ঠী ছিল। সম্রাটের মুকুট যদি একবার বিবদমান রাজপুত্রগণের উচ্চাশার বস্তু হয়ে ওঠে কিংবা কোনো কারণে যদি রাজকীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে যায় তবে এইসব বিবিধ গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ শুরু হতে পারে।

দূরত্বের বিষয়টিও বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ায় প্রভূত সাহায্যকারীর ভূমিকায় নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে মৌর্য সেনাবাহিনী এইসব অসুবিধা জয় করেছিল। তখন তারা অস্ত্রশস্ত্রে এবং যুদ্ধবিদ্যায়, বিশেষত তাদের অশ্বারোহী এবং সেনাসমৃদ্ধ রথ— এরই সঙ্গে তাদের পদাতিক বাহিনীর বিন্যাসে এবং মাসেডোনীয় এবং গ্রিকদের কাছে শেখা ব্যূহ রচনার কৌশল— ইত্যাদি কলাকৌশলে অনেক উন্নত ছিল (অধ্যায় ১.৬ দ্রষ্টব্য)। মৌর্য সেনাদল যখন বিভিন্ন ভাগে বিভাজিত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল কিংবা স্থানীয় শাসকবৃন্দও তাদের সামন্ত-পদের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য ওই একই ভঙ্গিমায় অনুরূপ পদ্ধতি ও প্রকরণে তাদের সেনাবাহিনী সংগঠিত করার কাজ শুরু করল, তখন মৌর্য বাহিনীর তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব একমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। এমত অবস্থায় দূরত্বের কারণে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাকে দূর করার মতো যথেষ্ট উন্নত সামরিক বাহিনী রাজ কর্তৃপক্ষের হাতে অবশিষ্ট রইল না।

পরবর্তীকালে, অন্যান্য আরো কারণ দেখা দিল, যেমন ক্ষমতা থেকে মৌর্যদের অপসারণের সপক্ষে স্থানীয় সমর্থন। দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে আপন অধিকার সুরক্ষিত রাখতে একজন সম্রাটকে যাতায়াতের পথ, বার্তা-বিনিময় এবং যানবাহনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। সাধারণত সে কারণেই সম্রাটেরা বাণিজ্যেও খুব পোক্ত হতেন। কিন্তু এমন এক বিশাল সাম্রাজ্যের শক্তি কেন্দ্রে ক্রমশ নমনীয়তার অভাব ঘটে; তার আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থানীয় সুবিধা-অসুবিধা গুরুত্ব পায় না। তাই এক বা দুই প্রজন্ম অতিবাহিত হবার পরে বৈয়াকরণ পতঞ্জলি (মহাভাষ্য V. ৩.৯৯) (খ্রিস্টপূর্ব

১৫০ অব্দ c.) মৌর্যদের ‘স্বর্ণের প্রতি লোভ’-এর (অথবা অর্থের, হিরণ্য) কথাই শুধু স্মরণে রাখেন। সাধারণের ওপর যে বিশাল ভার চাপানো হয়েছিল হয়ত এটি তারই প্রতিফলন। অবশ্য যে প্রসঙ্গে (সোনার দেবমূর্তি বিক্রয়) এ কথা বলা হয়েছে সেটি সুপ্রযুক্ত নয়। যাই হোক আঞ্চলিক শাসকেরা স্থানীয় পরিস্থিতিকে ঠিকমতো বুঝে, মানুষকে খুব বেশি দুর্দশায় নিমজ্জিত না করেই অধিকতর উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার কাজে সফল হয়েছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে দূরবর্তী শাসকদের আনুগত্যের প্রশ্নে কেন যে এমন টানাপোড়েন ক্রমাগত বাড়তে লাগল, তার অন্যতম কারণ হয়ত এই সাফল্য। ফলে মৌর্যদের শাসন থেকে অপসারণের স্থানীয় প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি জিতে নিল।

এ জাতীয় সমস্যা নিরসনে মৌর্য শাসকদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার ব্যর্থতাও এক্ষেত্রে যে একটি গুরুত্ব ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই কারণটি যদিও অগ্রাহ্য করা যায় না তবু একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, অশোকের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত করে কিছুই জানতে পারি না। সে কারণে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে তাদের বিচারের প্রশ্ন অমীমাংসিতই রাখতে হয়।

২.৫ দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা

মেগাস্থিনিস যখন তাঁর ভারত-বিবরণী লিখলেন, সেই খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষের বছরগুলির পূর্বে দক্ষিণ ভারত লিখিত ইতিহাসের সীমানায় পদার্পণ করেনি, এমনই কথিত আছে। মেগাস্থিনিসকে উদ্ধৃত করে আরিয়ান (ইন্ডিকা, VIII) বলেন যে, মহান নায়ক হেরাক্লেস্ (হারকিউলিস)-এর ভারতবর্ষে এক কন্যা আছেন যাঁর নাম পান্ডাইয়া। সমুদ্র-মুক্তার সম্ভারে সমৃদ্ধ এক শক্তিশালী রাজত্বে তিনি তাঁর কন্যাকে রানীর পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। এছাড়া মেগাস্থিনিস একথা বলেন যে, সেই মুক্তায় ভারতবর্ষ এমনই সমৃদ্ধ ছিল, এমনই মূল্যবান ছিল সে মুক্তা যে ওজনের হিসাবে তিনগুণ পরিশুদ্ধ সোনার বিনিময়ে তাদের পাওয়া যেতো। পাণ্ডিয়া রাজত্ব মাদুরাই যার রাজধানী), যার সমুদ্রতটে তুতিকোরিনে মুক্তার চাষ হয়, এখানে নিশ্চিতরূপে আমরা তার প্রাচীনতম উল্লেখ দেখতে পাই।

এই রাজত্ব এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রধান নগরীর উল্লেখ এর পরে অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে, অশোক তাঁর সীমান্ত এলাকার পরবর্তী “চোড়াস, পামদ্রিয়া সতিয়াপুটাস, কেরালাপুটাস এবং তাম্বাপান্নি”, (শেষোক্ত অঞ্চল শ্রীলঙ্কায়) এইসব অঞ্চলেও তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা প্রসারিত করার কথা বলেন। ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে, তিনি ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী রাজার এলাকাতেও দৌত্য পাঠানোর উল্লেখ করেছেন। এইসব প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে তিনি

"চোড়াস পামডিয়া এবং দূরবর্তী তাম্মাপান্নি"-র নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, চোড়াস (চোল) এবং পামডিয়া (পাণ্ডিয়া) দক্ষিণ ভারতের প্রধান দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। তুলনায় সতিয়াপুটাস এবং কেরালাপুটাস গুরুত্ব ছিল কম। সে কারণে এগুলি পুনরায় উল্লেখের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। কাবেরীর ব-দ্বীপে অবস্থিত চোড়দের (তামিলে "চোল") পারস্পরিক এলাকা, পরবর্তীকালের তাঞ্জাভুর নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ঘটনাচক্রে নামের উল্লেখে ইংরাজিতে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ার (যেমন ১.৫ অধ্যায়ে কলিঙ্গ-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে) অর্থ এই নয় যে, সেগুলি তাদের 'গোষ্ঠী'-নাম। অঞ্চলের উল্লেখে সচরাচর তাদের নাম বহুবচনে লেখা হতো; ইরানী ভাষার বিকাশেও অনুরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে অঞ্চলের নামগুলি, মুক্রান, কিরমান, খুরাসান, ইরান ইত্যাদি রূপে উল্লেখিত। এখানে শেষের 'আন' হলো বহুবচনের রূপ। অন্যদিকে, 'সতিয়া', 'কেরালা' এদের শেষে 'পুতো' (পুত্রেরা) যুক্ত হওয়ায় এক্ষেত্রে একটি বংশানুক্রমিক শাসনের ইঙ্গিত মেলে। নামের প্রথম অংশটি শাসক পরিবারের আনুমানিক পূর্বসূরীর নামানুসারে সৃষ্ট। বস্তুত জাম্বাই-তে (ভিলুপ্পুরম জেলা, তামিলনাড়ু) প্রাপ্ত খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতকের একটি তামিল ব্রাহ্মী শিলালিপিতে 'সতিয়াপুতো' পদবী দেখা যায়। এতে শুধুমাত্র যে সতিয়াপুতা অঞ্চলটি সনাক্ত করতে সুবিধা হয় তাই নয় (দীর্ঘকাল যাবৎ অনুমানের বিষয় ছিল), ধ্রুপদী তামিল 'আতিয়ামান'-এর সঙ্গে সতিয়াপুতো-র চিহ্নিতকরণও নিশ্চিত হয়। অনুরূপে অশোকের 'কেরালাপুতা' তামিল 'চেরামান'-নামে টিকে থাকে। চেরাগণ মূলত কেরালার মানুষ নয়, তাদের বসতি ছিল তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলায় (২.৫ নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

কর্ণাটক এবং দক্ষিণ অন্ধ্রের বহুস্থানে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলই ১৪° উত্তর অক্ষাংশ রেখায় অর্থাৎ বাঙ্গালোরের অনেকটা উত্তরে অবস্থিত। এইসব শিলালিপি ছাড়া, তটবর্তী অন্ধ্রের অমরাবতীতে সম্ভবত অশোকের স্তম্ভের কাটা অংশ ফলকাকারে পাওয়া গেছে (পূর্বের ২.১ দ্রষ্টব্য)। অশোকের ব্রাহ্মী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বেশ কিছু শিলালিপি অমরাবতীতে পাওয়া গেছে। অতএব সেগুলিকে অন্তিম মৌর্য পর্বের অথবা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্দ্ধের সামগ্রী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সবগুলিই একটি বৌদ্ধ স্তূপের সঙ্গে যুক্ত। এর সন্নিকটেই ভাত্তিপ্রলু। সেটিও আবার প্রাকৃতে লিখিত ক্ষুদ্র বাক্সে খোদিত লিপি। এখানে অশোকের যে ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে বঞ্জনবর্ণের সহজাত অ স্বরবর্ণটি বাদ গেছে। এমত ব্যবহারে নিশ্চিতরূপে প্রাচীন তামিল বা দ্রাবিড়ীয় শুদ্ধ বানানের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

যৌক্তিক বিচারে, তামিলনাড়ুতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপিভিত্তিক বর্ণলিপির নিরিখে ভাত্তিপ্রলু মধ্যপন্থী। তামিল-ব্রাহ্মী শিলালিপি হিসাবে যেগুলি পরিচিত,

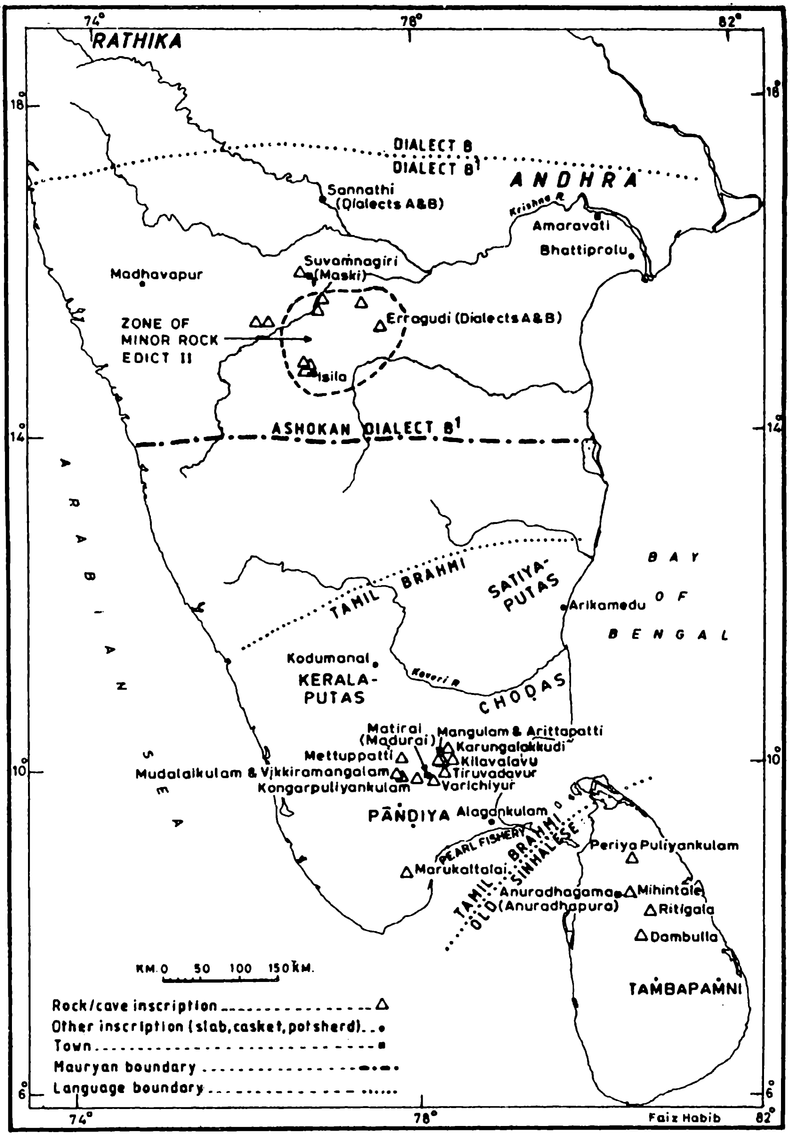

মানচিত্র২.৫ দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-১০০ (c)

তাদের পাঠোদ্ধার করা গেছে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত অর্থ এই মর্মে স্বীকৃত হয়েছে যে: (ক) ভাত্তিপ্রলুর মতো তামিলনাড়ুতে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী ব্যঞ্জনবর্ণে সহজাত-অ যুক্ত থাকে না; (খ) তামিলনাড়ুর ল, ল্ল, ণ এবং ঢ় ব্যাঞ্জনবর্ণের উপস্থাপনায় অতিরিক্ত বর্ণ বা

অক্ষর যুক্ত করা হয়; (গ) অশোকের প্রাকৃতের প্রভাব সত্ত্বেও ভাষাটি মূলত তামিল। অশোকের ব্রাহ্মীর সঙ্গে নৈকট্যের কারণেই তামিল ব্রাহ্মী শিলালিপির প্রাচীনতম বর্ণগুচ্ছ যে মৌযযুগের শেষ দশা অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের এই তথ্য বোঝা সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতের ঠিক পরেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষা তামিল এই শিলালিপিতে উপস্থাপিত।

মৌয যুগের শেষ পর্ব অথবা ঠিক পরবর্তী উত্তর-মৌর্য সময়কালের প্রস্তরে উৎকীর্ণ তামিল ব্রাহ্মী শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান মাদুরাই জেলার মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ। এর বাইরে মাত্র দুটি স্থানে এদের পাওয়া গেছে। একটি উত্তরের সীমান্তে আর অন্যটি আরো দক্ষিণে, তিরুনেলভেলির সন্নিকটে তাম্বপর্ণী নদীর তীরে। অতএব চিরাচরিত পাণ্ডিয়া (তামিল : পান্টিয়া) দেশের মধ্যে এই সমস্ত শিলালিপি অবস্থিত। অন্যদিকে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তামিল ব্রাহ্মী লেখা সমৃদ্ধ ভগ্ন পাত্র অধিকতর বিস্তৃত অঞ্চল আরিকামেডু (পণ্ডিচেরী), কোডুমানাল (এরোড জেলা) আলাগানকুলম (রামেশ্বরম এর নিকটে) এইসব স্থানে পাওয়া গেছে।

পর্বত অনুশাসনগুলি সাধারণত দানের স্মৃতিতে রচিত এবং জৈন যোগীদের গুহা এবং আশ্রমের সঙ্গে এগুলি সংশ্লিষ্ট। পাণ্ডিয়া রাজত্বে জৈনধর্মের সাদর অভ্যর্থনা চিত্তাকর্ষকভাবে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের যে আদর তার সঙ্গে তুলনীয়। এ বিষয়ে এবার আলোচনা করা হবে। যাইহোক, যুক্তি বিচারে বলা যেতে পারে যে, 'পাম্ডিয়া' এবং রাজত্বের রাজধানী 'মাতিরাই' (আধুনিক মাদুরাই) নামগুলি মহাভারত-কাহিনীর 'পাণ্ডব' এং মাদুরাই-এর কথা মনে করিয়ে দেয় এবং এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের প্রাচীনতর অভিঘাতের বিষয়টি আমাদের জানায়। অন্যান্য বিষয়েও তামিল ব্রাহ্মী শিলালিপি আমাদের সামান্য কিছু তথ্য অবহিত করে। ওইসব তথ্যে একজন পাণ্ডিয় শাসকের নাম উল্লেখিত। নামটি সম্ভবত 'নেতুনচালিয়াম'। এছাড়া একজন 'মুক্তা-তত্ত্বাবধায়ক'-এর উল্লেখ রয়েছে। পাণ্ডিয় রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিতে তুতিকোরিন মুক্তা-চাষের গুরুত্ব এই নামোল্লেখে বুঝতে পারা যায়। ওই একই আধিকারিক আবার একটি বণিক সভার (নিকামা) প্রধান। 'রাজমিস্ত্রী'-র বৃত্তি একটি পরম্পরাগত বিদ্যা হিসাবে স্বীকৃত। স্থান-নির্দেশক অল্পকটি নামের মধ্যে একাধিক স্থানে মাতিরাই (মাদুরাই) এসেছে। ইতিমধ্যে সে স্থান হয়ত একটি শহর এবং পাণ্ডিয়া রাজত্বের রাজধানী। কৃষিজ উৎপন্নের মধ্যে, শত পরিমাণ গম (নেল) দানের কথা উল্লেখ করে একবার মাত্র ধানের কথা বলা হয়েছে। শিলালিপিতে একটি গ্রামের (উর) কথা বলা হয়েছে। সেখানে মিলিত উদ্যোগে একটি 'বিশাল দীঘি'' (পের-আয়াম) খনন করানো হয়েছে। কিন্তু সেই দীঘি সেচের প্রয়োজনে না জৈন সাধুদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত সেটা স্পষ্ট নয়। সে সময়েই যে পাণ্ডিয়া রাজত্বে অন্যরূপে বর্ণব্যবস্থার বীজ রোপণ করা হয়, সেটি প্রতিষ্ঠিত করার যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়নি।

দীপবংশ এবং রাজবংশ নামক বর্ষ-পঞ্জীতে শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস যেভাবে চিত্রিত তাতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতীয় সম্রাট অশোকের সহায়তায় ওই দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের ঘটনা অত্যন্ত গর্বিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। উত্তর ভারতের সিংহপুরা নামে একটি অনির্দেশিত শহর থেকে বিজয় নামের একজন রাজপুত্রের প্রাচীনতর আগমনে বিষয়টি বেশ গল্প কাহিনীর ভঙ্গিমায় ওই বিবরণে লিপিবদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুকালে (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমাংশ) তিনি তার অনুচরবৃন্দ সহ ওই দ্বীপে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীলঙ্কার সিংহলী ভাষা যে একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, সেটি এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য চিরায়ত বিবরণে একথাও বলা হয়েছে যে, বিজয় তাঁর সঙ্গে পাণ্ডিয়া (পাণ্ডু) রাজত্ব যার রাজধানী মধুরা (মহাবংশ, VII ৪৮-৭৪) সেখান থেকে বিপুল সংখ্যক নারী এনেছিলেন। অনুরাধাপুরা (অনুরাধাগাম, প্রাচীন সিংহলী রাজত্বের চিরাচরিত রাজধানী)-তে সাম্প্রতিক পুরাতাত্ত্বিক কর্মে যে সাক্ষ্য উন্মোচিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে শ্রীলঙ্কায় প্রাচীন ইন্দো-আর্য উপস্থিতির নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০-২৭৫ অব্দের (c.) প্রাচীন ব্রাহ্মী চিত্রাঙ্কন সমৃদ্ধ একটি ভগ্ন মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। লিখিত অংশ খুবই সামান্য কিন্তু ভাষাটি নিশ্চিতরূপে প্রাকৃত হিসাবে চিহ্নিত। অনুরাধাপুরা ক্রমশ একটি প্রকৃত শহর হয়ে ওঠে। এর বসতি অঞ্চলটির বিস্তৃতি প্রায় ৭০ হেক্টর। এর সমৃদ্ধি একটি বিশালাকার বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত। আফগানিস্তান কিংবা বেলুচিস্তান থেকে আমদানীকৃত নীলকান্তমণি এবং গুজরাট থেকে আসা কর্ণেলিয়ানের আবিষ্কারে এই বাণিজ্য-চক্র চিহ্নিত করা যায়।

ভারতবর্ষের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সম্পর্কেও লেখন ও ভাষার সাক্ষ্যে নতুন প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় যে প্রাকৃত ভাষা বহুল প্রচলিত, শিলালিপি অনুসারে সে ভাষা অশোকের অন্তিম পর্বের সমসাময়িক হিসাবে প্রতিভাত হয়। মগধি ভাষার মতো এ ভাষাতে যদিও কোনো যুগ্ম শব্দ (যেমন ক্ষ) নেই, তবু এর ওপর মগধি ভাষার যেমন কোনো প্রভাব চোখে পড়ে না। কিন্তু এখানে দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং সন্ধ্যক্ষর (যেমন আ, ঐ, ঈ, ঊ) না থাকায় অশোকের খরোষ্ঠী শিলালিপিতে বাহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাকৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে ঘোষবর্ণ (ভ, ধ, ঘ ইত্যাদি, ঝ ব্যতিরেকে) পরিহার এবং স স্থলে হ সংক্রান্ত লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দুটিই ইরানীয় প্রভাবের দৃঢ় সংকেত। এই তথ্যে এই সম্ভাবনা ব্যক্ত হয় যে : (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাকৃত কথ্য বাচনভঙ্গি থেকেই শ্রীলঙ্কার মূল প্রাকৃত ভাষা গড়ে উঠেছে, (২) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতকে শ্রীলঙ্কায় যে ব্রাহ্মী লিপি প্রতিষ্ঠা পায় সেটি আরমীয় প্রভাবে সৃষ্ট হওয়ায়, এরই প্রভাবে হ্রস্ব স্বরবর্ণের অসংজ্ঞাত সম্মিলন এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অ-সংযুক্তি ব্রাহ্মীতে প্রচলিত। এখনো পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে শ্রীলঙ্কার কোথাও প্রাক-

অশোক ব্রাহ্মীলিপির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি (অশোকের অনুশাসন সংক্রান্ত লিপি ব্যতিরেকে)। অতএব, মৌর্যযুগের ভারত যে শ্রীলঙ্কা থেকেই এই লিপি পেয়েছিল এমন সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করে দেওয়া যায় না। পিপ্রাহওয়া এবং সোহগৌরা এই দুই স্থানের মৌর্য পর্বের ব্রাহ্মী শিলালিপিতেই (অশোকের অনুশাসন সংক্রান্ত লিপি ব্যতিরেকে) দীর্ঘ স্বরবর্ণের অনুপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এদের ওপর শ্রীলঙ্কার ব্রাহ্মীলিপির প্রভাবের এ হলো একটা লক্ষণ। অতএব, অশোকের ব্রাহ্মী লিপি আমদানি করা লিপির ভিত্তিতে নিশ্চিতরূপে একটি আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তবে কিছুকাল পরেই নতুন কিছু অক্ষর এবং দীর্ঘ-স্বরবর্ণের চিহ্নও এই লিপির সঙ্গে যুক্ত হয় (পরবর্তী ৩.৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সম্ভবত অশোক তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ c.) 'ধম্ম'-এর বার্তা প্রচারে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা পাঠাতে 'তাম্বাপান্নি' (শ্রীলঙ্কা)-তে দৌত্য পাঠিয়েছিলেন (দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসন; নিষ্কর্ষ ১.৪ এবং ২.২)। শ্রীলঙ্কার চিরায়ত সাহিত্য অনুসারে (দীপবংশ, XI) সে সময় শ্রীলঙ্কার শাসক ছিলেন মুতাসিবা, তাঁর পুত্র দেবনামপিয় তিস্যা অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে পিতার সিংহাসনে বসেন (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৩ অব্দ c.)। তিস্যার নামের সামনে দেবনামপিয় যুক্ত হওয়ায় ইতিমধ্যেই মৌর্য রাজবংশের রীতির প্রভাব স্পষ্টতই বোঝা যায়। কথিত আছে যে, তিস্যা অনেক উপহার সমেত অশোকের নিকটে দৌত্য পাঠিয়েছিলেন। আর একই প্রতিদানে শেষাবধি অশোকের পুত্র মহেন্দ্র যিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি শ্রীলঙ্কায় পদার্পণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অশোক বুদ্ধের কিছু স্মৃতিচিহ্ন পাঠিয়েছিলেন এবং পরে তাঁর সন্ন্যাসিনী কন্যা সঙ্ঘমিত্তা পবিত্র বোধিবৃক্ষের একটি শাখাও সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কার বর্ষপঞ্জীতে তিস্যার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এবং এই ধর্মের প্রতি তাঁর ব্যাকুলতার বিশদ বিবরণ রয়েছে। দামবুল্লায় বৌদ্ধ সঙ্ঘকে উপহার হিসাবে 'দেবনামপিয় মহারাজা তিসা' কর্তৃক একটি গুহা-দান এবং রিতিগলা পর্বতে তাঁর পুত্র 'দেবনামপিয় তিসা আরায়া (?)' কর্তৃক আরেকটি গুহা-দানের বিবরণ যে লিপিতে নথিভুক্ত রয়েছে তার অক্ষরগুলি অশোকের ব্রাহ্মীলিপির এত সদৃশ যে উল্লিখিত এই রাজা নিশ্চয় বর্ষপঞ্জীর দেবনামপিয়া তিস্যা। তাঁর মৃত্যুর পর চল্লিশ বছরের শাসনকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২১৩ অব্দ c.) তাঁর ভ্রাতা উত্তীয় দশ বছর রাজত্ব করেন এমন কথিত আছে (খ্রিস্টপূর্ব ২১৩-২০৩ অব্দ c.); এই তিনটি দানপত্র সমৃদ্ধ শিলালিপি তাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত টিকে ছিল। সেই কারণে তাঁর নামের পূর্বে 'দেবনামপিয়' অভিধানটি যুক্ত আছে। বৌদ্ধধর্ম তখন শাসক রাজাদের দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করেছে। পরে উপনিবেশের সময়কালে ক্রমশ তার সেই প্রতিষ্ঠা হারিয়ে গেল।

সারণি ২.২ কালপঞ্জী

	অশোকের রাজত্বের বছর	খ্রিস্টপূর্ব (c.)
★ অশোকের সিংহাসনারোহণ	—	২৭০
★ কলিঙ্গ বিজয় (REXIII)	৮	২৬২
★ সম্বোধির পথে যাত্রা (REVIII); ধম্ম প্রচার শুরু (কান্দাহার দ্বিভাষিক); মাইনর প্রস্তর অনুশাসন জারির তারিখ	১০	২৬০
★ দ্বিতীয় আন্টিওখুশ ও অন্যান্য গ্রিক শাসকদের উদ্দেশ্যে এবং দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় দৌত্য পাঠানো— এই সময়কালে অথবা পূর্বে (REII এবং XIII)	১২	২৫৮
★ প্রস্তর অনুশাসনের প্রথম গুচ্ছ জারি (REIII, IV এবং PEVI); বারাবার পর্বতে (গুহা লিপি) অজীবিকদের দুটি গুহা-দান	১২	২৫৮
★ ধম্ম-মহামাতগণের নিয়োগ (REV)	১৩	২৫৭
প্রস্তর অনুশাসন V-XIV, এবং পৃথক প্রস্তর অনুশাসন ★ I এবং II জারি— এর মধ্যে অথবা পূর্বে	১৩	২৫৭
★ কোনাকামানা স্তূপের পরিবর্ধন (নিগালি সাগর PE); শিকারের বিরুদ্ধে আদেশ-দান (দেওতক শিলালিপি)	১৪	২৫৬
★ শিকারী এবং জেলেদের নির্বাসন (লাঘমান আরমীয় শিলালিপি)	১৬	২৫৪
★ দেবনামপিয়ার তিস্যার শ্রীলঙ্কার রাজার সিংহাসনারোহণ (দীপবংশ)	১৮	২৫৩
★ বারাবার পর্বতের তৃতীয় গুহার খনন (গুহালিপি)	১৯	২৫১
★ লুম্বিনী ভ্রমণ (রুম্মিনদেই RE)	২০	২৫০
★ প্রস্তর অনুশাসন I-VI জারি (PE I, IV-VI); এই বছেরর মধ্যে ২৫ জন সাধারণ বন্দীর মুক্তি	২৬	২৪৪
★ প্রস্তর অনুশাসন VII জারি (PE VIII)	২৭	২৪৩
★ ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন এবং রানীর অনুশাসন,		

সম্ভবত এই সময়ে বা পরে জারি করা	২৭	২৪৩
★ অশোকের মৃত্যু (পুরাণ, মহাবংশ)	৩৬	২৩৪
★ শ্রীলঙ্কার দেবনামপিয় তিস্যা মারা গেলেন; উত্তরাধিকারে উত্তীয়ের সিংহাসন-লাভ (মহাবংশ)		২১৩
★ দশরথ, মৌর্য শাসক : সিংহাসনারোহণ (পুরাণ) এর পূর্বে		২১১
★ ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশে তৃতীয় আন্টিওখুশের অভিযান (পলিবিউস)		২০৬-২০৫
★ বৃহদ্রথের উৎখাত, শেষ মৌর্য শাসক, পুষ্যমিত্র কর্তৃক, শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা (পুরাণ)		১৮৫

সংক্ষিপ্ত রূপ : স্তম্ভ অনুশাসন (Pillar Edict) = PE; প্রস্তর অনুশাসন (Rock Edict) = RE

নিষ্কর্ষসমূহ :

নিষ্কর্ষ ২.১

ধম্ম সূত্র-সংগ্রহ

(ক) শিলা অনুশাসন XI (১৩ রাজকীয় বৎসরে বা তার পরেও সময়ের)

রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করেছিলেন: ধম্মদানের মত আর কোন ভালো দান নেই, বা ধম্মের মধ্যে গড়েওঠা বন্ধুত্ব বা ধম্মে অংশগ্রহণ করা বা ধম্মের মধ্যদিয়ে আত্মীয়তা। এটা গড়ে ওঠে এইভাবে: দাস ও ভৃত্যদের প্রতি ভদ্রব্যবহারে; মাতা ও পিতার প্রতি সৎ ও বাধ্য হয়ে; বন্ধু, সহযোগী এবং আত্মীয়দের প্রতি, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের প্রতি সৎ ও বদান্য (দান) হয়ে; প্রাণী হত্যা না করে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, সহযোগী বা বন্ধু, বা এমনকী প্রতিবেশীকে বলা : 'এটাই ভালো, এটা করাই উচিত'। লোকে যদি এইভাবে চলে তাহলে জগৎ উপকৃত হবে এবং পরবর্তীকালে এই ধম্মদানের ফলে সীমাহীন সুকৃতি বৃদ্ধি পাবে।

(খ) আরমিয় ভাষায় নীতিসূত্রের বিবরণ

(কান্দাহার গ্রীক/আরমিয় দ্বিভাষিক শিলালিপি: আরমিয় সংস্করণ)

(তার রাজ্যাভিষেকের সময় থেকে) দশবছর কেটে গেলে আমাদের প্রভু রাজা প্রিয়দর্শী, আমাদের রাজা (মালিক) হয়েছিলেন সত্যের পথনির্দেশক। তখন থেকে সকল মানুষের মধ্য হতে পাপ দূর হয়েছে, এবং তিনি সকল দুরবস্থা দূর করেছিলেন; সমগ্র জগতে শান্তি ও আনন্দ ছিল। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে বলা হয়: আমাদের প্রভু মহারাজের জন্য কোন পশু হত্যা হয় না, এবং এটা দেখে সকলকেই পশুহত্যা বন্ধ করতে হয়' এবং জীবন্ত প্রাণী ধরাও নিষিদ্ধ হয়। সেইরকম, যারা তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসংযত তাদের অসংযম থেকে বিরত হতে হয়। এবং পিতামাতা ও বয়স্কদের

প্রতি বাধ্যতা বলবৎ হয়, কারণ প্রত্যেকেই নিয়তি নির্ধারিত। কর্তব্যপরায়ণ মানুষের পরকালে কোনো বিচার নাই। ইহা (ধর্মানুরাগ) সকলের উপকার করে এবং চিরকাল উপকারী হয়ে থাকে।

নিষ্কর্ষ ২.২
সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা

প্রস্তর অনুশাসন II (দ্বাদশ রাজকীয় বৎসরে বা তার আগের সময়ে)
রাজা দেবনামপিয় পিয়দশীর শাসনাধীন এলাকায় এবং চোল, পামদিয়াস, সত্যপুতাস, কেরালাপুতাস এবং তম্বপামনি, গ্রীক রাজা অমতিওক (আন্টিওখুশ) এবং অমতিওকের পরবর্তী গ্রিক রাজারা, এইসব প্রতিবেশীদের এলাকায়, সর্বত্র রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী দুই ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন : মানুষের চিকিৎসা এবং গবাদি পশুর চিকিৎসা। মানুষের পক্ষে কার্যকরী এবং পশুর পক্ষে সহায়ক ওষধি (ওষধানি) যোগান দেওয়া হবে এবং যেখানে তা পাওয়া যায় না যেখানে সেগুলির চাষ করার ব্যবস্থা করা হবে। সেইরকম (ওষধি) মূল এবং ফল যোগান এবং যেখানে তা পাওয়া যায় না তার চাষের ব্যবস্থা হবে। মানুষ এবং পশুগণের স্বাচ্ছন্দের জন্য রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন করা হবে এবং কূপ (উদুপানানি) খনন করা হবে।
(নিষ্কর্ষ ২.৭ খ দেখতে হবে।)

নিষ্কর্ষ ২.৩
ধম্ম-মহামাত্য নিযুক্তি

প্রস্তর অনুশাসন V (ত্রয়োদশ রাজকীয় বৎসর)
রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করেন : সুকর্ম (কায়ান) সাধন শক্ত কাজ। যে ভালোকাজ করতে শুরু করবে সেই কিছু অসুবিধায় পড়বে। আমি অনেক ভালো কাজ করেছি। যদি আমার পুত্র বা পৌত্র বা বংশধররা যারা আমার পরে আসবে সময়কালে আমার এই আচরণ একইভাবে অনুসরণ করে তাহলে তারা ভালোই করবে। কিন্তু যদি কেউ এবং অংশত অবহেলা করে তাহলে সে ভুলই করবে। পাপ করা বরং সহজ। দীর্ঘ অতীতে কোন ধম্ম-মহামাত্য নামে কেউ ছিল না। তেরো বছর রাজত্ব করে আমি ধম্ম-মহামাত্য নিযুক্ত করলাম। সকল (ধর্মিয়) গোষ্ঠির মধ্যে তারা ধম্ম প্রতিষ্ঠা ও ধম্মবৃদ্ধির দায়িত্ব নেবে; এবং ইয়োনাস, কম্বোজবাসী, গান্ধারবাসী এবং রথিকাস্-পিতিনিকাস ও অন্যান্য পশ্চিম সীমান্তবাসী (অপরমতা) যারা ধম্মের প্রতি বিশ্বস্ত তাদের মঙ্গল ও সুখের দায়িত্ব নেবে। ভৃত্য ও প্রভুর মধ্যে, ব্রাহ্মণ ও ধনবানের মধ্যে, দরিদ্র ও বয়স্কদের মধ্যে যারা ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বস্ত সকল বন্ধনথেকে

মুক্ত করে তাদের মঙ্গল ও সুখে তারা নিবিষ্ট থাকবে। তার অর্থ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে শৃঙ্খলিত বন্দীদের দেখভালে তারা নিবিষ্ট থাকবে এই কারণেই তারা তাদের মুক্ত করবে যদি তাদের সন্তান থাকে বা তাদের ওপর নির্ভরশীল কেউ থাকে, বা তারা সম্মোহনের শিকার হয় বা বৃদ্ধ হয়।

এখানে (পাটলিপুত্র) এবং বাইরের নগরগুলিতে, আমার রমনীদের মধ্যে, আমার ভাই, বোন এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যেখানেই ধম্মের প্রতি কেউ বিশ্বস্ত থাকবে সেখানেই তারা আসীন থাকবে। আমার রাজ্যে ধম্মপ্রতিষ্ঠার ভিক্ষাদানে এবং ধম্মের প্রতি আত্মোৎসর্গে তারা নিবিষ্ট থাকবে। এই ধম্মলিপির শেষে তাই লেখা হচ্ছে যাতে দীর্ঘ সময়কালের পরে আমার সন্ততিরা যথাযথভাবে কাজ করতে পারে।

টীকা: ভাতামায়েসু-এর মধ্যে লিখিত আয় শব্দটি সংস্কৃত আর্য হিসাবে ধরা হয়েছে; মাইনর প্রস্তর অনুশাসন ১ম-এ ব্রহ্মগিরি অংশের পাঠে একে আয়পুত বলা হয়েছে। বম্ভানিভিয়েসু— দ্বিতীয় অংশে ডি.ডি কোশাম্বী ইভিয়া শব্দের অর্থ করেছেন, নিম্নতম (Indo-Iranian Journal, V পৃষ্ঠা ১৮১-৮৪) কিন্তু সংস্কৃতে ইভ্যা শব্দের অর্থ ধনী এবং ইভিয়া সম্ভবত তারই প্রাকৃত রূপ।

নিষ্কর্ষ ২.৪
ধর্মিয় সহাবস্থান

প্রস্তর অনুশাসন XII (ত্রয়োদশ রাজকীয় বৎসরে বা পরে)

রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী নির্জনবাসী ও গৃহস্থ সকল ধর্মিয় গোষ্ঠিকে উপহার ও অন্যান্য নানা উপায়ে সম্মান জানান। দেবনামপিয় মনে করেন না যে যতটা উপহার বা সম্মান দেওয়া হয় ততটাই সকল গোষ্ঠির মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। জ্ঞানের বিকাশ নানা রকমের। কিন্তু তার মূল হচ্ছে বাক্‌সংযম, যাতে কেবল নিজের গোষ্ঠিকে সম্মান জানাতে যুক্তিহীনভাবে অন্যগোষ্ঠিকে দোষ দেওয়া না হয় বা সবসময় এই ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে অনুদ্ধত হতে পারে। এইভাবে অন্যগোষ্ঠিও সবদিক দিয়ে সম্মানিত হয়। যে এইভাবে কাজ করে তার নিজের গোষ্ঠি উন্নত হয় এবং অপর গোষ্ঠিগুলিরও উপকার হয়। যে নিজের গোষ্ঠিকে সম্মান দিতে এবং নিজ গোষ্ঠির বিকাশের কথা মাথায় রেখে নিজের গোষ্ঠিকে সম্মান করে এবং সে কারণে অপর গোষ্ঠিকে গোষারোপ করে। সে এই কাজ করে নিজের গোষ্ঠিরই ক্ষতি করে। সেইজন্য সৌহার্দ্যই (সমভায়) কেবল সুন্দর। সকলের উচিত পরস্পরের ধম্ম শোনা এবং অনুসরণ করা। দেবনামপিয়র ইচ্ছা সকল ধর্মিয় গোষ্ঠির কথা বহুশ্রুত হোক অর্থাৎ সকলেই তাদের কথা জানুক এবং সকলেরই অনুগত বিশ্বাসী থাকুক। এবং যারা বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠির তাদের জানানো হোক : দেবনামপিয় ভাবেন না যে যতটা

সম্মান ও দান করা হয় ততটা জ্ঞানের বিকাশ হয় না সব গোষ্ঠীতে। এই উদ্দেশ্যে অনেকেই জড়িত আছে : ধম্ম-মহামাত্যরা, নারীদিগের তত্ত্বাবধান করার মহামাত্য (ইথিধিয়াখা-মহামাত্র) তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। এরফলে একজনের গোষ্ঠি যেমন উন্নত হয় তেমনই ধম্মের গৌরব হয়।
(নিস্কর্ষ ২.৭ 'গ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

নিষ্কর্ষ ২.৫

অশোক এবং সরকারের আচরণবিধি

প্রস্তর অনুশাসন VI (ত্রয়োদশ রাজকীয় বৎসরে বা তার পরে)
রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করলেন : সাধারণত অতীতকালে এমনটি ঘটেনি যে সকল সময় (রাজ) কার্য (অথকম্ম) সংঘটিত হবে এবং প্রতিবেদন (পতিবেদন) গৃহিত হবে। এবং আমি এটা করলাম: সব সময় সে আমি যখন অন্নগ্রহণ করছি, বা অন্দরমহলে আছি বা বিশ্রামকক্ষে আছি, বা সাধারণের স্থান (গো-চারণ ভূমি)-তে আছি বা পালঙ্কে আছি বা উদ্যানে আছি, সব জায়গাতেই প্রতিবেদক (পতিবেদক) আমার কাছে জনগণের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন জানাবে। সব জায়গাতেই আমি জনগণের বিষয় শুনবো। তখন আমি অর্থসাহায্য বিষয়ে বা কোন নির্দেশ মৌখিক ভাবে দেব তা অবশ্যই মান্য হবে বা যখন মহামাত্যদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা জরুরী বিষয় এবং যদি সেখানে কোন থাকে বা পরিষদের যদি কোন বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি যেখানে যেখানেই থাকি আমাকে অবশ্যই জ্ঞাত করতে হবে। আমি এই আদেশ দিচ্ছি। রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কোন কাজ দ্রুত সম্পাদন করার বিষয়ে আমার প্রচেষ্টাতে আমি কখনই সন্তুষ্ট থাকি না। জনগণের মঙ্গলের (সবলোকহিত) জন্য এটাকে আমি প্রয়োজনীয় মনে করি। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিষয় দ্রুতসম্পাদন করার চেষ্টাই হচ্ছে মূলকথা। জনগণের মঙ্গলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। আমার প্রচেষ্টাই হবে সকল জীবের প্রতি আমার ঋণ পরিশোধ করা, যাতে তারা এখানে সুখ লাভ করে এবং পরজীবনে স্বর্গসুখ অর্জন করে। এই উদ্দেশ্যেই ধম্ম-অনুশাসন লিখিত হয়েছে যাতে দীর্ঘকালের জন্য এগুলি স্থায়ী হয় এবং যাতে আমার পুত্রগন, পৌত্রগন এবং প্রপৌত্রগণ জনগণের মঙ্গলের জন্য তাদের নিজেদের নিযুক্ত পারে কারণ কঠোর পরিশ্রম ব্যাতিরেকে ইহা অর্জন করা শক্ত।

নিষ্কর্ষ ২.৬

শাসন, বিচার এবং শাস্তি

স্তম্ভ অনুশাসন IV (২৬ রাজকীয় বৎসর)
রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ইহা ঘোষণা করেন : সিংহাসন আরোহনের ছাব্বিশ

বর্ষে আমি এই ধম্ম-অনুশাসন লিখছি। জনগনের মধ্যে শতসহস্র জীবের জন্য আমার 'রাজুক'রা নিযুক্ত হয়েছে। এখন থেকে অভিযোগ এবং শাস্তি দানের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হল, যাতে তারা নির্ভয়ে এবং শান্তভাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে পারে এবং দয়ার সঙ্গে জনপদের মানুষদের সুখলাভের পরামর্শ দিতে পারে। তারা তাদের আনন্দ এবং দুঃখের কথা জানবে, তারা জনপদের মানুষদের ধম্মের প্রতি প্রণোদিত করবে, যাতে তারা এখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরপরেও সুখ অর্জন করতে পারে। রাজুকরা আমার সেবা করতে সচেষ্ট থাকবে। আমার কর্মচারীরা (পুরিষ), যারা আমার ইচ্ছার কথা জানে, তারা তাদেরও মান্য করবে। একটা শিশু যেমন চতুরা ধাত্রীর কাছে এই ভাবনাতে বেড়েওঠে যে, চতুরাধাত্রী শান্তভাবে আমার, সন্তানকে বড় করে তুলবে', সেইরকম আমার 'রাজুক'রা নিযুক্ত হয়েছে জনপদের মানুষজনের জন্য সুখ এনে দিতে। রাজুকরা যেন শান্তভাবে, নির্ভয়ে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সমাধা করতে পারে, আমি তাদের ওপর ভার দিয়েছি অভিযোগ জানাবার এবং শাস্তিদানের। সুতরাং এটা আশা করা যায় যে বিচারের ক্ষেত্রে সমতা থাকবে এবং শাস্তি, পুরস্কারের ক্ষেত্রেও সমতা থাকবে। এখনো পর্যন্ত আমি নিজে যা অনুসরণ করেছি তা হল: বন্দী থেকে যেসব লোক তাদের শাস্তিকাল সম্পূর্ণ করেছে বা প্রহারিত হয়েছে, তারপর তিন দিন অতিরিক্ত সময় তাদের দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিজনরা যাতে তাদের পরবর্তী জীবন সুরক্ষিত রাখতে একটা আশ্রয়স্থলের জন্যে মধ্যস্থতা করতে পারে। বরং মৃত্যুকে শেষ বলে ভেবে তারা অপর জগতের জন্যে একটা উপহার দিতে পারে বা অনশন করতে পারে। আমার বাসনা হচ্ছে এই জগতের সংক্ষিপ্ত সময়কালে তারা অপর জগতকে অর্জন করতে পারে। এইভাবে জনগণের মধ্যে ধম্মাচরণের নানান পন্থা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভিক্ষাদান বৃদ্ধি পেতে পারে।

(উপরোক্ত অনুবাদে K.R. Norman-এর পূর্ববর্তী ভাষ্যের সংশোধনগুলি মনে রাখা হয়েছে।)

নিষ্কর্ষ ২.৭
কৃতির ঘোষণা

স্তম্ভ অনুশাসন VII (২৭ রাজকীয় বৎসর)

(ক) রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করেন : দীর্ঘ অতীতে রাজারা এই ইচ্ছা করেন যে জনগণ ধম্মে উন্নত হয়ে উঠবে; কিন্তু জনগণ সুসংগতভাবে ধম্মে উন্নত হয়নি। সেইজন্য রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করলেন: আমার জীবনে এটা সংঘটিত হয়েছে। অতীতে রাজার ইচ্ছা ছিল যে ভাবেই হোক জনগণ সুসংগতভাবে

ধম্মে উন্নত হবে, কিন্তু জনগণ ধম্মে সুসংগত হয়নি। তাহলে কীভাবে মানুষদের সচেতন করা যাবে? কীভাবে জনগণ সুসংগতভাবে ধম্মে উন্নত হবে? কীভাবে আমি তাদেরমধ্যে কয়েকজনকে ধম্মে উন্নত করব? এই ব্যাপারে দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করছেন: আমারই ক্ষেত্রে এইসব ঘটেছে। আমি ধম্মের ঘোষণা এবং ধম্ম-বিধানের নির্দেশগুলি প্রচার করব। এই উদ্দেশ্যে আমি ধম্মের ঘোষণা প্রচার করছি এবং 'ধম্ম' বিধির নির্দেশাবলী প্রচার করছি, যাতে কর্মচারীরা, যাদের জনগনের কর্তা করে রাখা হয়েছে, তারা যেন তাদের বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিতে পারে। 'রাজুক' রা, যাদের শত সহস্র লোকের ওপরে রাখা হয়েছে, যেন এইসব আদেশ দিতে পারে এবং জনগণকে 'ধম্ম' সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে। দেবনামপিয় পিয়দশী তাই বলছেন: এই ব্যাপারটা মনে রেখে আমি 'ধম্ম'-স্তম্ভ স্থাপন করেছি, 'ধম্ম-মহামাত্য' নিযুক্ত করেছি এবং 'ধম্ম'-ঘোষণা প্রচার করেছি।

(খ) রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করছেন : রাস্তার ধারে আমি বটগাছগুলি রোপন করেছি যাতে পশুর দল ও মানুষকে তা ছায়া দেয়, এবং আমবাগান তৈরী করেছি। আমি প্রতি অর্ধ ক্রোশ অন্তর কূপ খনন করিয়েছে এবং বিশ্রামাগার তৈরী করিয়েছি। পশু এবং মানুষের জন্য নানা জায়গায় অসংখ্য পানীয় জলের স্থল (আপাননি) তৈরী করিয়েছি। এই স্বাচ্ছন্দ ক্ষুদ্র বিষয়। সুখের উদ্দেশ্যে নানান উপায়ে আমি এবং পূর্বের রাজগণ প্রজাদের সুখী করেছি। কিন্তু আমি এটা করেছি এই অভিপ্রায়ে যে তারা যেন 'ধম্মে'র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

(গ) দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষনা করছেন : আমার 'ধম্ম মহামাত্যগণ' নির্জনবাসী ও গৃহস্থদের জন্য নানা কল্যাণকর কাজে যুক্ত আছে। তারা সকল ধর্মীয় গোষ্ঠির কথা ভাবে, অর্থাৎ আমি তাদের (বৌদ্ধ) সংঘের কাজে যুক্ত করেছি; সেইরকম আমি তাদের ব্রাহ্মণ এবং অজীবিকদের কাজে যুক্ত করেছি, আমি তাদের আরো যুক্ত করেছি— নিগমথাস (জৈন)দের কাজে। নানা ধর্মীয় গোষ্ঠির কাজে আমি তাদের যুক্ত করেছি। এইভাবে প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে মহামাত্যরা বিভিন্নভাবে যুক্ত। আসলে আমার 'ধম্ম-মহামাত্য'রা এই সকল এবং অন্যান্য গোষ্ঠির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(ঘ) রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করছেন : এই কাজে এবং অন্য (কাজে) অনেক উচ্চ আধিকারিক নিযুক্ত আছে যারা আমার পক্ষে, রাণীদের (দেবী) পক্ষে এবং আমার অন্দরমহলের নারীদের পক্ষে এখানে (পাটলিপুত্র) ও প্রদেশগুলিতে (দিশা) সেইসব যোগ্য প্রাপকদের যাদের কথা তারা জানতে পেরেছে, তাদের দানসামগ্রী বিতরণের অধিকার পেয়েছে। আমি তাদের আমার সন্তানের (দরকা) সঙ্গে সঙ্গে রানীদের জন্ম দেওয়া রাজকুমারদের (দেবীকুমার) হয়ে 'ধম্মে'র কর্ম হিসাবে এবং 'ধম্মানুসারে দানসামগ্রী বিতরণ করবার অধিকার দিয়েছি। এটাও 'ধম্মে'র

একটা কাজ এবং ধম্মানুসারে কৃত, যাতে জগতে পর দুঃখ কাতরতা, উদার চিত্ততা, সততা, পবিত্রতা, প্রসন্নতা এবং মঙ্গলময়তা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করছেন : যে সকল সুকর্ম আমার দ্বারা সাধিত হয়েছে জগত তা অনুসরণ করে এবং সেগুলির অনুবর্তী হয়। এরফলে মাতা-পিতার প্রতি মান্যতা, বয়ঃজ্যেষ্ঠ (গুরু)-র প্রতি মান্যতা, বয়স্ক মানুষদের সম্ভ্রম দেখানো, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের, এবং এমন কী (আভ) দাস ও চাকরদের প্রতি ভব্য ব্যবহার করার অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পাবে।

(চ) রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী ঘোষণা করছেন : মানুষের মধ্যে 'ধম্মে'র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃদ্ধি সাধিত হয় দুই উপায়ে: 'ধম্মে'র নিয়মে ও বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতায়। এর মধ্যে 'ধম্মে'র নিয়মগুলি হচ্ছে কম গুরুত্বের, বিশ্বাস উৎপাদনটা তার চেয়ে বড়। 'ধম্মের' নিয়ম হচ্ছে যেমন একটা নিয়ম পশুবধ হবে না। আমি আরো অনেক 'ধম্ম'-নিয়ম চালু করেছি। কিন্তু প্রাণীদের ক্ষতি করা বন্ধ করে এবং প্রাণীদের হত্যা নিষিদ্ধ করার বিশ্বাস উৎপাদনের দ্বারা 'ধম্ম' বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরো উন্নত হয়।

(ছ) এখন এই উদ্দেশ্যে এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ হয়েছে যাতে যতদিন আমার পুত্ররা এবং পৌত্ররা রাজত্ব করে এবং চাঁদ সূর্য থাকে ততদিন পর্যন্ত তা অক্ষয় থাকে, যাতে জনগণ সে অনুসারে চলতে পারে। এটা অনুসরণ করে চললে এই জীবনে এবং পরজীবনে লাভ হবে। সিংহাসনলাভের সাতাশ বছর পরে এই 'ধম্ম-অনুশাসন আমার দ্বারা লিখিত হল। এই সম্পর্কে দেবনামপিয় ঘোষণা করছেন : এই 'ধম্ম'-অনুশাসন যেখানে প্রস্তর স্তম্ভ আছে বা প্রস্তর ফলক আছে সেখানে খোদিত হবে যাতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

টীকা ২.১
উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞান

শব্দটির নিজস্ব ব্যঞ্জনায়, উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞান হল উৎকীর্ণ লিপি বা খোদিত লিপি সংক্রান্ত অধ্যয়ন। আক্ষরিক অর্থে খোদিত লিপি বলতে বোঝায় কোন খোদিত রচনা। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে কোন কঠিন উপাদান যেমন পাথর, ধাতু, ইঁট, পোড়ামাটি, মৃৎপাত্র এবং কাঠের ওপরে খোদিত যে কোন রচনাকেই এই নামে চিহ্নিত করা হয়। এরকম উপাদান (কাঠ ব্যতিরেকে) দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় কিন্তু এতে নিশ্চিতরূপে লেখনের পরিমাণ খুবই অল্প হয়। অন্য কোন উপাদান যেমন প্যাপিরাস, তালপত্র, ট্যান করা চামড়া (পার্চমেন্ট), কাপড় এবং কাগজ— এইসব উপাদানের ওপর লিখিত পাঠকে সাধারণভাবে খোদিত লিপি বলা হয় না। এইসব লিপি অনেক দীর্ঘ হতে পারে, খুব সংকীর্ণ স্থানে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অথবা কোন খণ্ড এক্ষেত্রে লেখা

হয়ে যায়। কিন্তু আবহাওয়া এবং জমির বিশেষ কয়েকটি শর্ত ব্যতিরেকে এইসব উপাদান দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। এই জাতীয় অর্থাৎ নরম উপাদানে খোদিত সমস্ত লেখন অধ্যয়নের যে পদ্ধতি, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সেটি উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরা প্রকৃত ইতিহাসের এলাকাভুক্ত অথবা যাকে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত লেখন উপাদান তার মূল রূপে টিঁকে রয়েছে, তাদের বেশিরভাগই পাথর এবং ধাতব গাত্রে লিখিত হওয়ায়, এই সমস্ত লিখিত রচনাই সঠিক প্রস্তাবনায় উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে।

খোদিত লিপির কয়েকটি উপশ্রেণী রয়েছে। গ্রাফিতি (ইতালীয় গ্রাফিতো শব্দের বহুবচন যার অর্থ আঁচড় কাটা) হল সাধারণভাবে এলোমেলো বা আটপৌরে ভঙ্গিতে দেওয়ালের ওপর কাটা আঁকিবুকি বা টুকরো লেখা। নামাঙ্কন হল মুদ্রা, পদক বা শিলমোহরে খোদিত লিপি যেখানে প্রায়শই যে রাজা এগুলি জারি করেছেন তার নাম লেখা থাকতো। সেকারণে উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি কিয়ৎ পরিমাণে মুদ্রাবিজ্ঞান, যেটি মুদ্রা অধ্যয়নের যে বিজ্ঞান, তারই সঙ্গে সমাপতিত হয়।

উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান শাখাটি হল প্রত্ন-লিপি-বিদ্যা অর্থাৎ প্রাচীন লিপি বা লেখন শৈলী অধ্যয়ন। সিন্ধু সভ্যতার ২.১ নং টীকায় আমরা দেখেছি যে, যৌক্তিক বিচারে এই সমস্ত লেখনকে (ক) ভাবলেখ (চিত্রলেখ সহ), (খ) অক্ষর-লেখ বা (গ) বর্ণলেখ এইভাবে বিভাজিত করা যায়। আদর্শগত বিচারে, বর্ণলিপিও কঠোর-ভাবে ধ্বনি অনুসারী, কেননা প্রতিটি স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণ নির্দিষ্ট এবং পৃথক পৃথক বর্ণে বা অক্ষরে উপস্থাপিত। কিন্তু কার্যত, নিখুঁত বর্ণলেখ কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব ব্রাহ্মী লিপিও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্রাহ্মীতে, স্বরবর্ণ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি অক্ষরের নির্দিষ্ট কিছু বিস্তৃতিতে উপস্থাপিত। অবশ্য ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিটি অক্ষরের শেষে স্বরবর্ণের কোন চিহ্ন ব্যতিরেকেই সর্বদা একটি গোপন সংক্ষিপ্ত স্বরবর্ণ-'অ', যুক্ত থাকে। অতএব, প্রারম্ভিক স্বরবর্ণ চিহ্ন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মীকে (এবং সেইসঙ্গে এর উত্তরসূরী দেবনাগরীকে) কঠোরভাবে ধ্বনি-লেখ হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে, যেখানে 'অ' ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ (ই, আ, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) যুক্ত থাকে সেখানেই একে একটি অক্ষর হিসাবে গণ্য করা হয় এবং শেষোক্ত অক্ষরটি সেমুহূর্তেই তার অক্ষর-লেখ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শুধুমাত্র একটি ব্যঞ্জনবর্ণে পর্যবসিত হয়, এবং যুক্ত স্বরবর্ণটি চিহ্নরূপে উপস্থাপিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে, ব্রাহ্মীলিপিও বর্ণলেখ-র শ্রেণীভুক্ত হিসাবে গণ্য হতে পারে।

বিস্তৃত অর্থে, প্রত্নলিপিবিদ্যার দুটি কাজ: প্রথমত, লিপির পাঠোদ্ধার; দ্বিতীয় লিপি-বিবর্তন অধ্যয়ন। ধ্বনি অনুসারী লিপির ক্ষেত্রে, সেটি ধ্বনি-লেখ বা বর্ণলেখ

যেমনই হোক না কেন, পাঠোদ্ধারের কাজে পর্যায়ক্রমে দুটি পর্যায় বিদ্যমান : (ক) ব্রাহ্মীর ক্ষেত্রে এইমাত্র যে জটিলতার কথা বলা হল, তেমন জটিলতাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিটি বর্ণ বা অক্ষরের জন্য উচ্চারিত নির্দিষ্ট ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করা; (খ) একবার পাঠ করা সম্ভব হলেই তার অর্থটি প্রতিষ্ঠিত করা। কার্যক্ষেত্রে, এই দুই পর্যায় পরস্পর গ্রথিত। বর্ণসমূহে সংশ্লিষ্ট ধ্বনি-সংক্রান্ত মূল্যটি পরীক্ষা করা হয় এবং প্রায়শই এটি যে ভাষায় লিখিত এমন অনুমান করা হচ্ছে, সেই ভাষার সম্ভাব্য শব্দাবলীর উল্লেখে তাকে সংশোধন করা হয়। এ ক্ষেত্রে অশোকের ব্রাহ্মীর পাঠোদ্ধার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়কালে এই লিপি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। একজন ইন্দো-গ্রীক অক্ষর-লেখনেই শাসক আগথোক্লেস-এর নিজস্ব মুদ্রায় গ্রীক এবং ব্রাহ্মী উভয় নামাঙ্কন খোদিত ছিল। এর থেকে সি. লাসেন ১৮৩৬ সালে কয়েকটি প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর সনাক্ত করেন। পরবর্তী বৎসরেই একটি নির্ণায়ক ছেদ এল। জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০), যিনি ১৯৩৪ সালে অশোকের শিলালিপি অধ্যয়ন শুরু করেন, তিনি প্রাচীন সাঁচীর খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করে ফেললেন। দুটি অক্ষর, যারমধ্যে দ্বিতীয়টি ছিল বিন্দু এবং সম্ভবত দানসংক্রান্ত শিলালিপির সংক্ষিপ্ত শেষাংশে বারবার যারা যুক্ত ছিল— তাদের চিহ্নিত করে তিনি পড়ে ফেললেন যে শব্দটি 'দানম' (পরবর্তী ভারতীয় লিপিতে এই বিন্দুটি 'অনুস্বার' হিসাবে উপস্থাপিত)— প্রাকৃতে যার অর্থ হল 'দান'। পূর্বেই প্রিন্সেপ ধ্বনি-নির্দেশক চিহ্নগুলিকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরসমূহ যেমন আ ইত্যাদিকে আনুমানিক বিচারে সনাক্ত করেছিলেন। এবার তাঁর এই কৃতির সাহায্যে প্রিন্সেপ 'সমগ্র বর্ণমালার অধিকারী হলেন' এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি দিল্লী-তোপরা স্তম্ভে খোদিত অশোকের অনুশাসন এবং প্রস্তর অনুশাসনগুলি পাঠে সাফল্য অর্জন করলেন। ১৮৩৯ সালের মধ্যে তিনি এই সমস্ত অনুশাসনের রচয়িতা বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সম্পৃক্ত অশোককে কেবল সনাক্ত-ই করলেন না, তদুপরি ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে উল্লিখিত মাসেডোনীয় শাসকদের নামগুলি ব্যাপক স্তরে সঠিকভাবে চিহ্নিত করলেন।

অশোকের অনুশাসনসমূহের পাঠোদ্ধার একবার হয়ে যাবার পর খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য সমসাময়িক লিপির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে সেটি কেন্দ্রীয় চালকের ভূমিকা গ্রহণ করল। দ্বিভাষিক ইন্দো-গ্রীক মুদ্রা থেকে মাত্র অল্প কয়েকটি খরোষ্ঠী শব্দ জানা ছিল। অবশ্য সেক্ষেত্রেও প্রিন্সেপ অগ্রগামী সৈনিক। কিন্তু ১৯৪৬ সালে এডউইন নরিস, অশোকের প্রস্তর অনুশাসনের, ব্রাহ্মী অনুলিপির সঙ্গে তাঁর খরোষ্ঠীতে লেখা শাহবাজগরহি অনুশাসনের তুলনামূলক বিচারে খরোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বর্ণমালা উদ্ধার করে ফেলেন।

অশোক যদি তাঁর প্রস্তাব অনুশাসন সমূহ অসংখ্য প্রতিলিপিতে প্রচার না করতেন,

তবে খরোষ্ঠীর পাঠোদ্ধারে অনেক দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত করতে হত। কেননা এর কোন সরলরৈখিক উত্তরসূরীর পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। অবশ্য একটি ব্যতিক্রম এক্ষেত্রেও রয়েছে— দশস্ত-ই-নাউর (আফগানিস্তান)-এর প্রাচীন কুষান যুগের তৃতীয় অনুশাসন যেটি খরোষ্ঠীতে লিখিত। সম্প্রতি জে. হারমাত্তা এর পাঠোদ্ধার করেছেন। অশোকের ব্রাহ্মীর ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি বেশ অন্যরকম। ভারতবর্ষের কাগজের নোটের পিছনে যে পনেরটি ভারতীয় লিপিতে এর মূল্য-মান লিখিত হয়, উর্দু এবং কাশ্মীরী ছাড়া, এদের প্রত্যেকটি অশোকের ব্রাহ্মী লিপির উত্তরসূরী। একমাত্র উর্দু এবং কাশ্মিরী আরবী লিপিতে লিখিত। তাহলে তামিল থেকে দেবনাগরী (হিন্দীর জন্য) পর্যন্ত পরিক্রমণে কত বিবিধ রূপে এই লিপি পাওয়া গেল। অতএব, এত দীর্ঘ সময় যাবৎ প্রতিটি অঞ্চলে মূল লিপিতে কত না বিবিধ এবং বিচিত্র পরিবর্তন অবশ্যই সাধিত হয়েছে, যার পরিণতিতে অবশেষে রূপের এই বৈচিত্র অর্জন সম্ভব হয়েছে (আধুনিক দেবনাগরী অক্ষরসমূহের সঙ্গে অশোকের ব্রাহ্মীর তুলনার জন্য সারণি ২.৩ দ্রষ্টব্য)। কাজেই প্রাচীন ব্রাহ্মীর পাঠোদ্ধার যে খরোষ্ঠীর পদ্ধতিতে করা যায়নি অত্যন্ত ন্যায় সংগত ভাবেই এ বিতর্ক উঠতে পারে। বস্তুত প্রাচীনতর ব্রাহ্মীর বিবিধ সমসাময়িক উত্তরসূরীদের থেকে উৎকীর্ণ-লিপি-বিশারদগণের স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসারেই ক্রমপর্যায়ে এই ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু এর পূর্বেই প্রিন্সেপের কৃতি সম্পর্কে যে প্রশংসাবাণী উৎসারিত হয়েছে, সেটি পরিমার্জনের কোন কারণই নেই। প্রিন্সেপের কাজ শুধুমাত্র এই আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত-ই করেনি, দ্বিমুখী কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মূল পাণ্ডুলিপি এবং এর সাম্প্রতিক বিচিত্ররূপ উভয় দিক বিচার করে মধ্যবর্তী লিপিসমূহ পাঠোদ্ধারে তাঁর উত্তরসূরীদের সক্ষম করে তুলেছে।

বিভিন্ন লিপিতে এই সমস্ত বর্ণ বা অক্ষর চিহ্নের এহেন রূপ-বিবর্তনই প্রত্ন-লিপি-বিদ্যায় দ্বিতীয় প্রধান কাজ। এ বিষয়টি আগেও উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্ন-লিপি-বিদ্যা যেহেতু লিপি-বিবর্তনের অনুক্রমিক পর্যায়গুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে, সেকারণে একটি লিপির অন্তর্গত প্রতিটি শৈলীর বিচারে এদের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে এদের নির্দিষ্ট সময়সীমার অন্তর্গত হিসাবে ঘোষণা করা যায়। অনুশাসনে ব্যবহৃত রূপের মধ্যেই এগুলি লুকিয়ে আছে। এমনকি যখন অত্যন্ত সংকীর্ণ সময়সীমার মধ্যে কোন যুগকে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না, তখনও প্রত্নলিপিবিদ্যা আমাদের বলতে পারে যে, কোন রূপটি প্রাচীনতর এবং সে কারণে পূর্ববর্তী সময়কালের কোনটি 'বিবর্তিত', অতএব পরবর্তী। ধরা যাক, আমরা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, উড়িষ্যায় অবস্থিত খারাভেলার হস্তীগুম্ফায় উৎকীর্ণ লিপি অশোকের শিলালিপির পরবর্তী সময়কালের। অশোকের শিলালিপির সময়কাল যেহেতু প্রতিষ্ঠিত। সেকারণে আমরা বেশ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করতে পারি যে,

সারণি ২.৩

রোমান	অশোকের ব্রাহ্মী	দেবনাগরী	রোমান	অশোকের ব্রাহ্মী	দেবনাগরী
a	𑀅	अ	ma	𑀫	म
ba	𑀩	ब	na	𑀦	न
bha	𑀪	भ	ṇa	𑀡	ण
cha	𑀘	च	ña	𑀜	ञ
chha	𑀙	छ	o	𑀑	ओ
da	𑀤	द	pa	𑀧	प
dha	𑀥	ध	pha	𑀨	फ
ḍa	𑀟	ड	ra	𑀭	र
ḍha	𑀠	ढ	sa	𑀲	स
e	𑀏	ए	sha	𑀰	श
ga	𑀕	ग	sha	𑀱	ष
gha	𑀖	घ	ta	𑀢	त
ha	𑀳	ह	tha	𑀣	थ
i	𑀇	इ	ṭa	𑀝	ट
ja	𑀚	ज	ṭha	𑀞	ठ
jha	𑀛	झ	u	𑀉	उ
ka	𑀓	क	va	𑀯	व
kha	𑀔	ख	ya	𑀬	य
la	𑀮	ल			

অন্তে স্বরবর্ণ সংযুক্তিতে ব্রাহ্মী ব্যঞ্জন-অক্ষরে অনুমিত রূপবদল 'দা' অক্ষরটির নিম্নলিখিত উদাহরণে পরিস্ফুট :

𑀤 *da* 𑀤𑀸 *dā* 𑀤𑁂 *de* 𑀤𑀺 *di* 𑀤𑀻 *dī* 𑀤𑁄 *do* 𑀤𑀼 *du*

খারাভেলা কখনোই খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের পূর্বে রাজত্ব করতেন না এবং সম্ভবত তাঁর রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দের পূর্বেও নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের কালপঞ্জী পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে, এইভাবে, প্রত্ন-লিপি-বিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে লেখন শৈলীর একটি পর্যায়ক্রম প্রতিষ্ঠা করে এবং তারপর তারিখযুক্ত উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখে প্রতিটি শৈলীর জন্য একটি আনুমানিক সময় নির্দিষ্ট করে।

উৎকীর্ণ-লিপি-বিদ্যার সংশ্লিষ্ট অথচ পৃথক একটি ক্ষেত্র হল খোদিত লিপির বিষয়বস্তুর ভাষাগত এবং সাহিত্যিক বিশিষ্টতা অধ্যয়ন। অশোকের সময়কালের প্রারম্ভ থেকেই, ভারতীয় ভাষাগুলির বিষয়ে আমাদের অবগতির জন্য খোদিত লিপিসমূহই আমাদের প্রধান সূত্র হয়ে উঠেছে। অশোকের শিলালিপি কেবলমাত্র আমাদের অশোকের প্রাকৃতের শব্দ-ভাণ্ডার এবং ব্যাকরণের কথাই বলে না, এর কথ্য বৈচিত্রসমূহকেও চিহ্নিত করে। সে সময়কালে বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য এবং লিখিত ভাষা-রূপটির নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জোরালো সূত্রের যোগান দেয় আমাদের। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় উৎকীর্ণ লিপির থেকে চতুর্থ শতকে খোদিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের লিপি পর্যন্ত উৎকীর্ণ লিপিসমূহে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের নথিভুক্ত তথ্য বিচারে সাহিত্যকর্মে ক্রমশ সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির একটা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত খ্যাতনামা রচয়িতাদের শৈলী বা কাব্য নকল করে অথবা তার থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে, মূল রচয়িতাগণের জীবৎকালের প্রান্ত সীমা নির্দিষ্ট করা যায়।

অন্য কারণেও এইসব উৎকীর্ণ লিপি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার যদি প্রত্ন-লিপি-বিদ্যা আমাদের দিতে না পারতো, তাহলে অশোক সম্পর্কিত আমাদের সমস্ত জ্ঞান যথেষ্ট ভুল এবং ভ্রান্ত হতো। আর উৎকীর্ণ লিপি-হীন গুপ্তযুগ আমাদের কাছে চির-অপরিচিত হয়েই থাকত। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের পরবর্তী সময়কাল থেকেই সিংহাসনারূঢ় রাজার এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রশস্তি রাজ-অনুশাসনের একটি বিষয়সূচী হয়ে উঠেছিল। রাজবংশের ইতিহাস সম্পর্কে এগুলিই আমাদের জ্ঞানের প্রধান অংশ। যেসমস্ত বিচিত্র ধরনের উৎকীর্ণ লিপির মুখোমুখি হয়েছি আমরা, তাদের সাহায্যে কৃষি-সম্পর্ক, প্রশাসনিক সংগঠন, কর্মী-সংঘ, হস্তশিল্পী ইত্যাদি বিষয়ে আমরা অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। ঐতিহাসিক ভূগোল অধ্যয়নে শিলালিপিতে খোদিত স্থানের নাম এবং সেগুলির প্রকৃত অবস্থান একেবারে প্রাথমিক সূত্রপাতেই গুরুত্বপূর্ণ। খোদিত লিপির অভ্যন্তরে দেবমূর্তি ইত্যাদির উল্লেখ এবং সেখানে নথিভুক্ত দান গ্রহণের ধর্মীয় আর্থিক মূল্য কোন বিশেষ যুগের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমাদের সাহায্য করে। গণিতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে, উৎকীর্ণ লিপিতে যেভাবে সংখ্যাগুলি (অথবা সংখ্যার চিহ্ন) লিখিত তারই নিরিখে অঙ্কের দশাংশ অবস্থান এবং শূন্যের ধারণা প্রচলনের দিনক্ষণ স্থির করার কাজে আমাদের প্রভূত সুবিধা হয়।

এইভাবে উৎকীর্ণ লিপি বিদ্যা, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, প্রায় চোদ্দশ বৎসর সময় কালে, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়নে কার্যত আমাদের শিক্ষিকা হয়ে ওঠে।

টীকা ২.২

গ্রন্থপঞ্জি

অশোক সম্পর্কে অনেককিছু লেখা আছে V.A. Smith এর 'Asoka' (তৃতীয় সংস্করণ, অক্সফোর্ড, ১৯২০; এবং বহু পুনর্মুদ্রণে), অংশত পুরাতন তবে এখনো পাঠযোগ্য। D.R. Bhandarkar (১৯২৫ তৃতীয় সংস্করণ কলকাতা ১৯৫৫) এবং Radhakumud Mookerji (লন্ডন ১৯২৮)-র লেখা অশোক সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অছে। এরপর আছে B.M. Barua-র 'Asoka and his Inscriptions', Vol.1' (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৫৫) এবং Vol II (কলকাতা ১৯৪৩) গ্রন্থ। Romila Thapar-এর লেখা 'Asoka and and the Decline of the Mauryas' (দ্বিতীয় সংস্করণ, দিল্লী ১৯৭৩) হচ্ছে অশোক সম্পর্কে সবশেষ বড় কাজ। এইসব বই-এ অশোকের অনুশাসনের অনুবাদ আছে।

অশোকের শিলালিপির মান্য সংস্করণ ও অনুবাদ এখনো পর্যন্ত E. Hultzsch-এর 'Inscriptions of Asoka, Vol-I' (Archaeological Survey of India-র Corpus Inscriptionum Indicarum সিরিজে, লন্ডন ১৯২৫; ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ পাওয়া যায়।) এই প্রকাশনা পর্যন্ত আবিষ্কৃত অশোকের শিলালিপিগুলির অনুবাদ ভাষ্য সহ পাওয়া যাবে B.N. Mukherjee-র 'Studies in the Aramaic Edicts of Asoka (কলকাতা ১৯৮৪) গ্রন্থে। হাল আমলে আবিষ্কৃত দুটি শিলালিপির জন্যে দেখতে হবে Indian Historical Review, XIV (1990), পৃষ্ঠা ৩৬-৪২ (সান্নথি শিলালিপি K.V. Ramesh সম্পাদিত) এবং South Asian Studies, IV (1998) পৃষ্ঠা ৯৯-১০২ (ব্রুনার প্রস্তর খণ্ড, K.R. Norman সম্পাদিত) Alfred C. Woolner এর 'Asoka : Text and Glossary' (কলকাতা ১৯২৪, দিল্লী ১৯৯৩ পুনর্মুদ্রিত) একটা উল্লেখযোগ্য তথ্যগ্রন্থ। আর একটা প্রয়োজনীয় বই হচ্ছে Radhagovinda Basak-এর 'Asokan Inscriptions' (কলকাতা ১৯৫৯- মূল পাঠ ও অনুশাসনের অনুবাদ সহ)। অশোকের শিলালিপির সম্পর্কে লেখার গ্রন্থপঞ্জি পাওয়া যাবে F.R.Allchin এবং K.R. Norman এর 'Guide to the Asokan Inscription' South Asian Studies-I (১৯৮৫) (পৃ. ৪৩-৫০।)

শ্রীলঙ্কা ঐতিহ্যে অশোক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ 'মহাবংশ'-এর সবচেয়ে ভালো অনুবাদ পাওয়া যায় Wilhelm Geiger (লন্ডন ১৯১২, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬, ১৯৯৩) এর অনুবাদে। P.H.L. Eggermont তাঁর Chronology of the Reign of Asoka Moriya (লিডেন, ১৯৫৬) গ্রন্থে শ্রীলঙ্কা ও মহাযানী ধর্মগোষ্ঠীর বৌদ্ধ ঐতিহ্যগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন, যদিও তাঁর যুক্তিগুলো অধিকাংশই চেষ্টাকৃত।

তামিল ব্রাহ্মী শিলালেখ সম্পর্কে দেখতে হবে Iravatham Mahadevan এর 'Early Tamil Epigraphy: from the Earliest times to the Sixth Century

A.D.' (চেন্নাই ২০০৩)। শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালেখ-এর লিপ্যন্তর, পাঠ ও অনুবাদ আছে S. Paranavitana-র 'Inscriptions of Ceylon' (কলম্বো ১৯৭০) গ্রন্থে। শ্রীলঙ্কায় সর্বশেষ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি আলোচনা করা হয়েছে F.R. Allchin-এর 'The Archaeology of Historic South Asia' (ক্যাম্ব্রিজ ১৯৯৫) গ্রন্থের R.A.F. Coningham এবং Allchin রচিত নবম অধ্যায়ে।

উৎকীর্ণ-লিপি-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় নাম করা যায় Richard Saloman-এর 'Indian Epigraphy : A Guide to the Study of the Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the other Indo Aryan Languages' (নতুন দিল্লী ১৯৯৮) এর। এতে পূর্বের কাজগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

৩

অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতি

৩.১ অর্থনীতি

মৌর্য সাম্রাজ্য যেভাবে বিস্তৃত হয়েছিল অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে এলাকাসমূহ অধিকৃত হয়েছিল তার ভিত্তিতেই এর অর্থনীতি প্রসঙ্গে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করা যৌক্তিক হিসাবে সমীচীন। নিঃসন্দেহে এর এলাকাভুক্ত অঞ্চলের বিশাল অংশ জুড়ে ছিল অরণ্য। এই অরণ্যের কারণেই, অশোকের ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে রাজ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণের মূল কেন্দ্র হিসাবে অরণ্যচারী মানুষজনের (অটবি) বিশেষ উল্লেখ বিস্ময়কর নয়। যে সমাজে স্থায়ী বসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে সেখানে অরণ্যের যে প্রধান উৎপন্নের চাহিদা সর্বাপেক্ষা অধিক হবার কথা, তা হলো কাঠ। বাড়ি তৈরির উপকরণ এবং গরুর গাড়ি, রথ, লাঙল এবং অন্যান্য যন্ত্র নির্মাণের প্রধান উপাদান হিসাবে প্রয়োজনীয় এই কাঠ। স্ট্রাবো কর্তৃক উদ্ধৃত মেগাস্থিনিসের বিবরণ আমাদের কাষ্ঠে নির্মিত পাটলিপুত্রের দীর্ঘ প্রাচীরের কথা বলে। যদি প্রাচীরের বিশাল দৈর্ঘ্যের তথ্যটি আমরা উপেক্ষাও করি, তবুও ওই প্রাচীর নির্মাণে যে যথেষ্ট কাঠের প্রয়োজন হয়েছিল এ যুক্তিতে আমরা অনড় থাকতে পারি (পূর্বের ১.৬ অধ্যায় এবং পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে ভারহুত এবং সাঁচীর প্রস্তর ভাস্কর্যে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী) এই কাষ্ঠ-নির্মিত স্থাপত্যকলার (এবং তার খোদাই কাজের) অধিকাংশ আদর্শ হিসাবে অনুসৃত হয়েছে। সে সময়ের ভবন নির্মাণে যে কী পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হতো, তারও একটা আন্দাজ এর থেকে পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রও (II. ১৭.৫-৮) আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অরণ্যভূমিতে বাঁশ এবং শরকাঠিও পাওয়া যেত, যেগুলি ঝুড়ি বোনার কাজে এবং কাজের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে কঠিন অথচ নমনীয় একটি উপাদানের কাজ করতো। হাতে বোনা পরিচ্ছদ এবং দড়ি প্রস্তুত করতে অরণ্যে একজাতীয় বন্য লতার সন্ধান পাওয়া যেতো যাদের থেকে সুতো তৈরি করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বন্য লতাটির নাম সনাক্ত করা যায়নি। অরণ্যে উৎপন্ন সামগ্রীর একটি তালিকাও রয়েছে অর্থশাস্ত্রে (II ১৭.১২-১৩)— ওষধি লতা, অসংখ্য বন্য প্রাণীর চামড়া ও দেহাংশ সবই সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্তটি গৃহসজ্জায় অথবা কোনো কুসংস্কারের সন্তুষ্টির কারণে প্রয়োজন

হতো। কয়েকটি বন্য প্রাণীর 'দাঁত'-এর তালিকায় 'হস্তীদন্ত' অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ওই কয়েকটি প্রাণীর একটি হলো হাতি।

'হস্তীদন্ত'-এর উৎস হিসাবে হাতি ছিল অরণ্যের একটি প্রধান অর্থনৈতিক উৎপন্ন। গৃহপালিত হওয়া সত্ত্বেও হস্তীর প্রধান প্রজনন-ক্ষেত্র ছিল অরণ্য। সেখান থেকেই তাদের ধরা হতো এবং এরপরে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং রাজকীয় প্রদর্শনে কাজে লাগাবার জন্য তাদের পোষ মানানো হতো (মেগাস্থিনিস : স্ট্রাবো, XV ১.৪১-৪৩; বরং আরিয়ান, ইন্ডিকা, XIII; অর্থশাস্ত্র, II. ৩২.১-৭)। হস্তী-সমাকুল অরণ্য (নগবন, স্তম্ভ অনুশাসন V; অর্থশাস্ত্র II. ২.৭, ১৩; অর্থশাস্ত্রে II. ১.৯৯, II. ২.৬ এবং II. ৩১.১ একে হস্তীবন-ও বলা হতো) সম্ভবত এমন অরণ্য নয় যেখানে হাতি ধরা হতো, এবং এ হলো এমন অরণ্য যেখানে এই হাতি ধরার ক্ষেত্রে রাজার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আজকের দিনে আমাদের কাছে ধারণাটি অদ্ভুত মনে হলেও, তৎকালে 'জাতীয় সম্পদ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল হাতি। এমনকি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সেনাবাহিনীতে ৯,০০০ হাতি সংক্রান্ত প্লিনির সংখ্যাটি যদি একটু অতিরঞ্জিত হয়েও থাকে, তবুও পরবর্তীকালে ইসপাসের নির্ণায়ক যুদ্ধে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০১ অব্দ) ব্যবহৃত ৫০০টি হাতি, যেগুলি সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলিও যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য কীভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো সে প্রসঙ্গে আমাদের কিছু আনুষঙ্গিক ধারণা দিতে পারে। পোষ মানানো হাতি যদি সংখ্যায় এদের কয়েক গুণ হয়ে থাকে, তবে বন্য হাতির সংখ্যা যে কত বিপুল ছিল এবং যে অরণ্য ছিল তাদের বাসভূমি, তার আয়তনও যে কত বিশাল ছিল, সে কথাও আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

কিন্তু অরণ্যের আয়তনও একইসঙ্গে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে অশোক অকারণে বা বন্য প্রাণী ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অরণ্যে আগুন লাগানোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। 'কাটা এবং পোড়ানো' পদ্ধতির প্রচলিত কৃষিকাজ এবং সেই সঙ্গে ধোঁয়ার সাহায্যে বন্য পশু খেদানোর জন্য শিকারীদের অরণ্যে আগুন-লাগানো সম্ভবত এ দুটি রীতিই ছিল অনুশাসনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। প্রচলিত উভয় রীতিতেই একভাবে অরণ্য-নিধন-কার্য ক্রমাগত সংঘটিত হতো। এই নির্মূলিত অরণ্যদেশের দীর্ঘ পরিসরের মধ্য দিয়ে যে ইতিমধ্যেই রাজপথ নির্মিত হয়েছে, পথের দুই পার্শ্ব বরাবর মানুষ ও গবাদি পশুর বিশ্রামের উপযুক্ত ছায়ার সন্ধানে বটবৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষ রোপণের ঘটনায় সেটি পরিস্ফুট (প্রস্তর অনুশাসন II : স্তম্ভ অনুশাসন VII : নিষ্কর্ষ ২.২ এবং ২.৭ [খ])।

ভূমি পরিষ্কার করে কৃষিকাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করার কাজে উৎসাহ-দান সূচক একটি বাক্যও অশোকের অনুশাসনে নেই। কিন্তু অন্য কোনো কারণে না হলেও, শুধুমাত্র আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থেই এমন উৎসাহদানের নির্দেশ

স্পষ্টতই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে (II ১.১-১৮) যে নীতি ঘোষিত হয়, সেটি মৌর্য রাষ্ট্রেরও নীতি হতে পারে। সেখানে বলা হচ্ছে যে, কোনো একটি জনপদ বা প্রদেশে রাজা ১০০-৫০০ পরিবার বাস করে এমন গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বহিরাগত, বিশেষত 'শূদ্র কৃষকদের (কর্ষকগণ)' আনতেন। 'শস্যদানা, গবাদি পশু এবং অর্থ'-এ তাদের ঋণ দেওয়া হতো। কিন্তু জমিতে তাদের শুধুমাত্র জীবৎকালে ভোগদখলের অধিকার থাকতো এবং শর্ত ছিল যে আজীবন তাদের সেখানে কৃষিকাজে যুক্ত থাকতে হবে। যে নীতিতে অরণ্যচারী জনসমষ্টির বিরোধিতায় কৃষকদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যার ফলে গ্রাম ও অরণ্যের মধ্যবর্তী পরিসর ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যায়, সামাজিক ক্ষেত্রে সে নীতির গূঢ়ার্থ থাকতে হবে (অর্থশাস্ত্রে প্রস্তাবিত, II ১.৬)।

অর্থশাস্ত্রে (II ২৪.৩) কোনো বিশেষ কৃষি-হাতিয়ারের (কর্ষণায়ন্ত্র) বিবরণ নেই। কিন্তু বলদের উল্লেখে আনুষঙ্গিক কিছু শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সেক্ষেত্রে বলদে-টানা লাঙলের কথাই ভাবা হয়েছে। কৃষিকাজে সহায়তার জন্য কর্মকার এবং ছুতোর-এর (কামারা-কুট্টাকা) প্রয়োজন হওয়ায় আমাদের স্মরণে আসে যে, এই কাজের হাতিয়ার কিন্তু প্রধানত কাঠেই তৈরি। তবে অনুষঙ্গে কিছু লোহা প্রয়োজন হতো আর সে কারণেই হাতিয়ার প্রস্তুতি ও মেরামতির কাজে এই দুই জাতীয় হস্তশিল্পীরই প্রয়োজন ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নথিপত্রে দেখা যায় যে, কৃষির হাতিয়ার হিসাবে লোহার ক্রমবর্ধিত ব্যবহারে লৌহজাত সামগ্রীও তখন চোখে পড়ছে। আত্রাঞ্জিখেরা নগরাঞ্চলের (উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ) মৌর্য-স্তরে লাঙলের কাষ্ঠ নির্মিত কাঠামোর সঙ্গে একটি লোহার ফলক যুক্ত রয়েছে। লোহার কাস্তেও সেইভাবে প্রস্তুত (চিত্র ৩.১)।

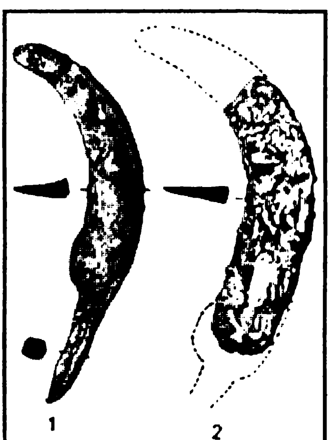

চিত্র ৩.১ আত্রাঞ্জিখেরায় প্রাপ্ত লোহার কাস্তে, NBP পর্ব (R. C. Gaur অনুসরণে)

জল-উত্তোলনের যন্ত্র সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে, II ২৪.১৮ একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে; বেশ আগ্রহোদ্দীপক রচনা। এগুলির নির্মাণ-ব্যয় অনুসারে যন্ত্রগুলি বিন্যস্ত করায় (এবং অধিক মূল্যের যন্ত্রে নিম্নতর হারে কর ধার্য করায়) অনুমিত হয়, যে যন্ত্রগুলি 'হাতে' চালাতে হতো সেগুলিই মহার্ঘ ছিল। পুলি-চাকার ওপর দিয়ে বলদের সাহায্যে যে জলপাত্রগুলি টানা হতো, এখানে নিশ্চয় সেগুলির কথাই বলা হচ্ছে। প্রাচীনকালেও সম্ভবত এই যন্ত্রটি পরিচিত ছিল (বৈদিক যুগ ১.৩ দ্রষ্টব্য)।

পরবর্তী যন্ত্রটি 'কাঁধের সাহায্যে গতিশীল' করতে হতো। এটি জলচক্র অর্থাৎ 'আরঘট'-এর প্রাথমিক রূপ হতে পারে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, "স্পোকে আবদ্ধ পাত্র সমন্বিত" একটি চক্র। প্রাচীন বৌদ্ধ রচনা, চুল্লাভাগ্গা নিকায়া (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ c.)-র মধ্যে এই জাতীয় যন্ত্রের প্রথম হদিশ পাওয়া যায়। তক্ষশিলার বীর স্তূপের মৌর্যযুগে এমন একটি চক্রের উপযুক্ত নাসপাতি-সদৃশ পাত্র বহুল সংখ্যায় পাওয়া গেছে। গিয়ার এবং পাত্র-সংলগ্ন শিকল না থাকায় পুকুর বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মধ্যেই জলচক্র কাজ করতে পারতো। মানুষের কাঁধের চাপে চাকাটি ঘুরত (ব্যাখ্যাসহ চিত্র ৩.২ দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় এবং সবচেয়ে কম-মহার্ঘ হলো পরিখায় জল প্রবাহের যন্ত্র (সোতযন্ত্র)। এটি সম্ভবত চালকের পায়ের আঘাতে ক্রিয়াশীল একটি কাষ্ঠনির্মিত সেচনী।

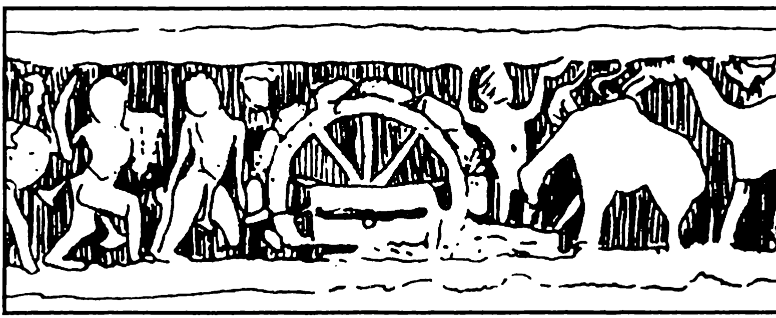

চিত্র ৩.২ জলচক্রের অন্তিম রূপ, মান্দোর প্রাচীর-চিত্র, দ্বাদশ শতাব্দী। দণ্ডহীন স্পোকের উপর থেকে পাত্রগুলির কাঠের দণ্ডে স্থানান্তরণ লক্ষণীয়, কিন্তু পাত্র-মালিকা (মালা) তখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়নি (যদিও খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতক থেকে এটি ভারতবর্ষে প্রচলিত) (আলোকচিত্র পরিস্ফুটনে পরীক্ষিত, T Schioler অনুসরণে)

অর্থশাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদে পরিখা এবং পুষ্করিণীর প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। অবশ্য অন্যত্র সাধারণভাবে এ বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র অবশ্যই একটি বাঁধ এবং (সেতুবন্ধ) তৎসংলগ্ন হ্রদের অভ্যন্তরে জলকপাটির মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি অন্তত নালী বা পরিখা নির্মাণ করবে অথবা এগুলি নির্মাণে সহায়তা করবে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আপাত চিত্রণে, স্ট্রাবো (XV, ১.৫০) ভারতীয় আধিকারিকগণকে বলেন, "প্রত্যেকে যাতে জলের সমপ্রবাহ পায়, সে কারণে প্রধান পরিখা থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্র শাখা-নালীতে জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজীয় স্লুইসগুলি যেন তারা পরিদর্শন করেন।" এই বিবরণ প্রসঙ্গে যদি মনে করা হয় যে, মেগাস্থিনিসের নির্দিষ্ট কোনো বিবরণ ব্যতিরেকেই ইজিপ্টে দেখা নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতেই স্ট্র্যাবোর এই মন্তব্য, তাহলে সেটিকে অন্যায় অপবাদ ভিন্ন আর কিছুই

বলা চলে না। যাই হোক, ১৫০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে চন্দ্রগুপ্তের আমলে সৌরাষ্ট্রে সুদর্শন হ্রদ নির্মাণ এবং অশোক-কৃত সংস্কারের বর্ণনা আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, মৌর্য যুগে রাষ্ট্রীয় আধিকারিকগণই বস্তুত জলবিভাজিকার মাধ্যমে বাঁধ সংলগ্ন পুষ্করিণী অবধি বিস্তৃত পরিখা নির্মাণ-সহ জলসেচের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করতেন। তবে এই জলসেচে উপকৃত মোট ক্ষেত্রের পরিসর খুব অধিক ছিল না। এটি অবশ্য স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

শস্যের ক্ষেত্রে আমরা দুটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাই। একটি তালিকা এরাটোস্থেনেস-কৃত, খ্রিস্টপূর্ব ২৩০ অব্দ c., যিনি দুটি মরসুমী ফলনের কথা বলেছেন, এবং উভয়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত শস্যের তালিকা দিয়েছেন (স্ট্রাবো, XV ১.১৩) :

বর্ষা ঋতুর ফসল ('খারিফ')	**শীতের ফসল ('রবি')**
তিসি	গম
ভুট্টা (রাগি?)	বার্লি
তিল	ডাল
ধান	অন্যান্য ভোজ্য শস্য
Bosmorun (বাজরা)	

Bosmorun নিঃসন্দেহে ওনেসিক্রিটাসের bosmoran (১.১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। স্ট্রাবোর (XV. ১.২০) উদ্ধৃতিতে দেখা যায় যে, অন্যত্র এরাটোস্থেনেস দীর্ঘ মিষ্ট নলখাগড়া অর্থাৎ আখের উল্লেখ করেছেন। অর্থশাস্ত্রেও একটি তালিকা আছে (II. ২৪.১২-১৪)। তালিকাটি দীর্ঘতর এবং এরাটোস্থেনেসের তালিকার সব কটি শস্যই সেখানে স্থান পেয়েছে। দুটি ঋতুর যে কোনো একটিতে শস্যটি বপনের পূর্ব-দৃষ্টান্ত অনুসারে নির্ধারিত তিনটি পর্যায়ে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাঁর বিবৃতির সারাৎসার ৩.১ক নং সারণিতে দেওয়া হলো।

এই তালিকা দুটিকে একত্রে বিচার করলে দেখা যাবে যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনে অদ্ভুত এক ভারসাম্য অর্জিত হয়েছিল। তিনটি প্রধান দানাশস্যের (ধান, গম, বার্লি) পাশাপাশি ছিল ভুট্টা ও ডাল। আত্রাঞ্জিখেরার মৌর্য-স্তর (NBP) থেকে 'Urad' ডাল (Phasesh mungo) চাষের তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতিটি মরসুমে (খারিফ এবং রবি), খাদ্যের সহজলভ্যতাকে অটুট রেখে, যে শস্যের পক্ষে মরসুমটি অধিক উপযুক্ত সেইমতো শস্য চাষের পরিকল্পনা তখন সম্ভব হয়েছিল। তবে ধানের সংকর চাষের প্রবর্তন হয়েছিল কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই। অর্থশাস্ত্রেও এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই। কিন্তু ২৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে স্ট্যাবো তাঁর রচনায় আরো পূর্ববর্তী এক লেখক মেগিলাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। মেগিলাস সেখানে বলছেন যে, ভারতবর্ষে ধানের জন্য 'সেচ এবং সংকরায়ণ প্রয়োজন হয়।'' খ্রিস্টপূর্ব প্রথম

শতাব্দীতে যদি ধানের সংকরায়ণ প্রচলিত থাকে, তাহলে মৌর্যযুগের ভারতবর্ষে যে তার অস্তিত্ব ছিল না সে কথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।

অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বিচারেই অর্থশাস্ত্রের (II. ২৪.২০-২১) বক্তব্য যে, ইক্ষু-চাষে ব্যয় ও ঝুঁকি দুটিই অত্যন্ত বেশি। অবশ্য মুনাফাও সেই মতে যথেষ্ট কেননা মৌর্য সময়কালে বিভিন্ন ধরনের শর্করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। পাণিনিতে গুড় প্রস্তুতির (গুড়, সান্দ্র শর্করা) উল্লেখ রয়েছে (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ c.) (IV .৪.১০৩)। অর্থশাস্ত্রে আবার খান্দা, (মিছরি) এবং শর্করা (শক্ত-দানা)-এর কথাও বলা হয়েছে (II.১৫.১৪)। মেগাস্থিনিসের বিবৃতি হিসাবে প্রচলিত একটি রচনায় ভূমিতে প্রোথিত মিষ্ট পাথরের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে প্রস্তুতি পর্বের শেষ পর্যায়ে মাটিতে বিছানো মিছরি-দানার কথাই সম্ভবত বলা হয়েছে। বস্তুত শর্করা জাতীয় উৎপন্নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ মনে হয় প্রথম সারিতেই ছিল।

কার্পাসের অবস্থানটি আরও জটিল। এরাটোস্থেনেস অথবা অর্থশাস্ত্র কেউই এটিকে কৃষিজাত শস্য হিসাবে চিহ্নিত করেননি। এক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের বিচার অবশ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে পাণিনি তিসি এবং শণের উল্লেখ করেছেন, অথচ কার্পাস যেন তাঁর নজরেই পড়েনি। আগেই দেখেছি যে, (অধ্যায় ১.১) আলেকজান্ডারের নৌ-সেনাধ্যক্ষ নিয়ারখুশের

সারণি ৩.১

	বর্তমান যে মরসুমকে সচরাচর চাষ করা হয়
প্রাথমিক বপন	
ধান (শালি-ব্রীহি)	খারিফ
'কোডো' ভুট্টা (কোদ্রাভা)	খারিফ
তিল	খারিফ/রবি
কউন (ইতালীয়) ভুট্টা (প্রিয়ঙ্গু)	খারিফ
উদারক (সনাক্ত করা যায়নি)	—
ভারাগু বা চিনা (সাধারণ ভুট্টা) (ভারাকা)	রবি/খারিফ
মধ্য পর্যায়ে বপন	
'মুগ' ডাল (মুদগা)	খারিফ
'কলাই' ডাল (মাশা)	খারিফ
'সানওয়ান' (দারিদ্রের ভুট্টা) (শাইম্যা)	খারিফ

শেষ পর্যায়ে বপন

লোধ্র (কুসুম্ভা)	রবি/খারিফ
মুসুর (মাসুর)	খারিফ/রবি
কুলথ কলাই (কুলখ)	রবি/খারিফ
বার্লি (যব)	রবি
গম ((গোধূম)	রবি
কলাই (সনাক্ত করা যায়নি)	—
তিসি বা শণ (অতসী)	খারিফ
সরিষা (সর্ষপ)	রবি

এছাড়া (II. ২৪.২১-২২)

আখ (ইক্ষু)	খারিফ
লঙ্কা (পিপ্পলি)	রবি

টীকা : এর সঙ্গে অর্থশাস্ত্র II. ১৫.২৫-৩০ দ্রষ্টব্য

বর্ণনায় কার্পাস বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত হয় বটে কিন্তু সে বৃক্ষ বর্ষজীবী, বার্ষিক শস্যের ক্ষুদ্র ঝোপ নয়। এমনকি আলেকজান্ডারের এক পার্শ্বচরের বিবরণ থেকে অ্যারিস্টটলের উত্তরাধিকারী থিওফারাসটুস (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ c.) যে উপসংহারে উপনীত হন তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি বলেন যে, Dog-rose সদৃশ একটি বর্ষজীবী বৃক্ষ থেকে ভারতবর্ষে কার্পাস সংগৃহীত হয় এবং সেই বৃক্ষগুলি আঙুরলতার মতো 'সারে সারে বিন্যস্ত' থাকে। এর অর্থ হলো, কার্পাসের চাষ তখন গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই প্রক্রিয়া, যে কোনোভাবেই হোক এমন উন্নত হয়েছে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর জন্য বার্ষিক কর্ষণও এখন স্থির করা যাচ্ছে। কাপড়ে রঙ করার জন্য 'নীল' ব্যবহারের উল্লেখ আছে পাণিনিতে (IV ১.৪২) অর্থাৎ নীল চাষের প্রচলন হয়েছে। কাত্যায়ণ-কৃত পাণিনির একটি টীকায় (IV ২.২) 'নিলি' বৃক্ষ হিসাবে গণ্য।

ফুলের চাষও সম্ভবত তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। অবশ্য অশোকের বৃক্ষ-রোপণের তালিকায় ওষধিলতা, মূলকন্দাদি এবং ফল ঠাঁই পেয়েছে, কিন্তু কোথাও ফুলের দেখা নেই (দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসন)। আম্রবীথি রোপণের কথাও তিনি বলেছেন (আম্বভাদিকা) (সপ্তম প্রস্তর অনুশাসন); আর রানীর অনুশাসনে এই আম্রবীথি 'দ্বিতীয় রানী' কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দানসামগ্রী হিসাবে উল্লেখিত (এলাহাবাদ স্তম্ভ)। আঙুরলতা-চাষের (মৃদভিকা) উল্লেখও রয়েছে অর্থশাস্ত্রে (II ২৪.২২)। কিন্তু অশোকের শিলালিপিতে একেবারে প্রথম দিকে প্রায়শই যে আম্রবৃক্ষের উল্লেখ পাই, তার কোনো উল্লেখ আপাতদৃষ্টিতে অর্থশাস্ত্রে নেই।

কৃষিকাজের উন্নতির ফলে, খাদ্য-যোগানের ক্ষেত্রে এর অংশ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কোশাম্বী উল্লেখ করেছেন যে, ডালের বর্ধিত চাষে (কড়াইশুঁটি, ছোলা এবং বিন সহ) প্রোটিনের বিকল্পের সন্ধান পাওয়ায় কীভাবে জনজীবনে মাংসের চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল। অবশ্য মরসুমের খামখেয়ালীপণায় কৃষিকাজ বিপুল মাত্রায় ব্যাহত হতো। সে তুলনায় আদিম স্বাভাবিক অরণ্যে স্থানীয় সঞ্চিত জলের সাহায্যে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বদাই নির্দিষ্ট ফলন পাওয়া যেত। সে কারণে খাদ্যের জন্য কৃষির প্রতি নির্ভরতা যতই বৃদ্ধি পেল, দুর্ভিক্ষের পৌণপুনিকতা এবং প্রকোপের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। মেগাস্থিনিস আমাদের বলছেন যে, মানুষজন তাদের 'দার্শনিকদের' নিকটে সম্বৎসর যে জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করত তা হলো, এবারে দুর্ভিক্ষ হবে কি হবে না। জৈন পুরাকাহিনীতে কথিত আছে যে, এক দীর্ঘ এবং প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিদারুণ মনোস্তাপে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী হয়ে যান।

এখন কৃষিতে জনসমষ্টির এক বৃহদংশকে যুক্ত করতে হলো। মেগাস্থিনিস সাতটি বর্ণের মধ্যে দ্বিতীয়কে এই শ্রেণীতে রেখেছেন যাদের নাম গিওরাগোই বা কৃষক। কথিত আছে যে এরা নাকি 'অন্যান্যদের তুলনায় অসংখ্য' ছিল (নিষ্কর্ষ ৩.১ দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রে (II ১.২) পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, শূদ্র কর্ষকদের জমির বন্দোবস্ত করে দেওয়া উচিত। গিওরাগোই-দের সঙ্গে এই শূদ্র কর্ষকদেরই যথার্থ তুলনা করা যায়। এরা খাজনা দিতো (করদ) এবং সর্বদা ভূমিকর্ষণে বাধ্য থাকতো কেননা অনুরূপ ক্ষেত্রে এদের ভূমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো (II ১.৮-১০)। এমন কৃষকের সন্ধান না পাওয়া গেলে, গ্রাম্য-ভৃত্য এবং ব্যাপারীদের (গ্রামভৃতক এবং বৈদেহক) ভূমি কর্ষণের অনুমতি দেওয়া হতো। 'বীজ ও গবাদি পশু' ছিল কৃষকদের নিজস্ব (ধান্যপশু); যদি কোনো কারণে এগুলি তাদের অধিকারে না থাকতো, তবে সামগ্রী বা অর্থ হিসাবে তাদের সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ দেওয়া হতো (II ১.১৮)।

অর্থশাস্ত্রে আরেকটি অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের একটি ছবি পাই আমরা। দাস, শ্রমিক (কর্মকার) এবং জরিমানা প্রদানের জন্য যাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে সেসব মানুষজন জমিতে কাজ করছে এমন বর্ণনাও আমরা পড়ি। এসব ক্ষেত্রে হাল, চাষের উপকরণ এবং বলদ সরবরাহের দায়িত্বে থাকতেন কৃষি সংক্রান্ত অধ্যক্ষ (সিতাধ্যক্ষ)। এইসব দাস এবং শ্রমিকদের সামান্য মাসিক মজুরি (১$^{১}/_{৪}$ পণ) সহ তাদের পোষ্য সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য দেওয়া হতো (II ২৪.২৮)। বিকল্প একটি ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে (II ২৪.১৬), যেখানে উৎপন্নের অর্ধাংশের বিনিময়ে কৃষকেরা (অর্ধসিতিকা) জমি চাষ করতো। কিন্তু যেসব ভাগচাষী 'কেবল শ্রম-দান' করত (স্বভিরিওপাজিবিনাহ্) তাদের জন্য উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট ছিল।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে ধরনের ব্যবস্থাপণার কথা বলা হয়েছে সেটি সাধারণভাবে রাজার নিজস্ব জমিতেই দেখা যেত। সে কারণেই অর্থশাস্ত্রে এটি কোনো নির্দিষ্ট পেশা হিসাবে চিহ্নিত হয়নি। 'সীতা' (কোশাম্বীর ব্যাখ্যায় এটি অন্য অর্থে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও) শব্দটির অর্থ কৃষি বা কৃষিজ উৎপন্ন ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। আমাদের অনুমান আরও একটু বিস্তৃত করে বলা যায়, অর্থশাস্ত্রে যে প্রচলিত রীতি বর্ণিত সেই ব্যবস্থার আদর্শই রাজপুত্র, উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং স্থানীয় প্রধানদের নিজস্ব ভূমিতে প্রচলিত ছিল। বস্তুত রাজনৈতিক পালাবদলে শেষোক্তদের অধিকৃত ভূমি অনেকক্ষেত্রে রাজাধিকারে এসে যেত। একই সঙ্গে রাজকীয় অনুদাদেন ভূমি-অধিকারের অন্যান্য অঞ্চল সৃষ্ট হতে পারে। অর্থশাস্ত্রে (II ১.৭) এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে, যেমন, ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মদেয়), আমলা, আঞ্চলিক আধিকারিক এবং অন্যান্যদের নিষ্করভূমি প্রদান। অশোকের শিলালিপিতে সম্রাট এবং রাজ-পরিবার কর্তৃক ভূমিদানের যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও সম্ভবত এইসব ভূ-দানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদিও ভূদানের একমাত্র নির্দিষ্ট যে রূপের উল্লেখ রয়েছে (রানীর অনুশাসনে) তা হলো আম্রকানন-দান।

জমি হাসিল করার ক্ষমতা অনুসারে যে কোনো জমিকে 'নিষ্কর' ঘোষণা করার অধিকার রাজার ছিল। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল, অনুদান প্রাপকেরা যেন রাজ-ভূমির মতো পতিত জমিকেও কৃষির আওতায় এনে নিজেদের মুনাফা অর্জন করতে পারে। উচ্চ মাত্রায় কর ধার্য করার (এব ং উদ্বৃত্তের বিরাট অংশ দাবী করার) ক্ষমতা রাজার ছিল। এই অধিকারই রাজাকে সমস্ত জমির প্রকৃত মালিক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এ বিবৃতি মেগাস্থিনিসের এবং দিয়োদোরাস (নিষ্কর্ষ ৩.১) ও স্ট্যাবো যে তাঁর প্রতিধ্বনি করেছেন তাতে আমরা মোটেই বিস্মিত হই না। অর্থশাস্ত্রে এবং অন্যান্য ভারতীয় রচনায় শাসকের সপক্ষে এমন দাবি উচ্চারিত হয়নি। এতে নিঃসন্দেহে এই তথ্য প্রকাশিত হয় যে, যেসব সাধারণ ভূমি রাজ-করের আওতাভুক্ত ছিল না বা যাদের এর আওতায় আনা যায়নি, সেখানে উদ্বৃত্তের কোনো অংশের ভাগই রাজ-অধিকারে পৌঁছত না। দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণ ভূমির ক্ষেত্রে এই তুচ্ছ সম্পত্তির অধিকার যে টিকে আছে, বিষয়টি অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা এবং অন্যান্যেরা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সম্পত্তির প্রাচীন অধিকারীবৃন্দ বা করদাতা কৃষক, যাদের তুচ্ছ 'ইচ্ছাধীন-ভাড়াটিয়া' হিসাবে গণ্য করা যেতো না, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রশ্নে রাজ-ক্ষমতা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতকেও এমন চমকপ্রদ ঘটনা দেখা যায়। তখনও ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা প্রায় একবাক্যে মোগল সম্রাটকে তাঁর শাসনাধীন সমস্ত জমির মালিক এই মর্মে দৃঢ় ঘোষণা করেন। অথচ ওই শতকের সমগ্র ভারতীয় রচনায় এ দাবি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

কৃষি এবং পশুপালন-অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্কটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার

আধারে প্রতিষ্ঠিত। কৃষিকাজের জন্য যখন বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি পরিষ্কার করতে হয়, তখন অরণ্য এবং কৃষিজমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বা তার সীমান্তরেখায় পশুচারণের উপযুক্ত উন্মুক্ত জমি পাওয়া যায়। কৃষি এবং বাণিজ্যের অগ্রগতিতে, অর্থনীতির মধ্যে পশুপালক ক্ষেত্রের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। তথাপি, অন্তিম বৈদিক পর্ব অবধি গবাদি পশুর পরিমাণের ভিত্তিতে সম্পদের পরিমাণ নির্ধারিত হতো (বৈদিক যুগ, ১.১ এবং ২.১)। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়, সপ্তবর্ণের তৃতীয়টি হলো পশুপালক এবং রাখালের দল যাদের শহর ও গ্রামের বাইরে তাঁবুতে বসবাস করতে হতো (নিষ্কর্ষ ৩.১ দ্রষ্টব্য)। এরসঙ্গে স্ট্যাবো যোগ করলেন যে, এইসব লোকেরা টানবার কাজে প্রয়োজনীয় বলদ কৃষকদের বিক্রয় করত এবং বন্য প্রাণী শিকার করতো। আর আরিয়ানের বক্তব্য হলো (ইন্ডিকা, XI) যে, কর হিসাবে রাজাকে তারা গবাদি পশু দিত। গবাদি পশুর দেখাশোনার নিযুক্ত একজন অধ্যক্ষের (গোধ্যক্ষ) অধীনে বিশাল এক গবাদি পশুর জোতের কথা (মহিষ সহ) অর্থশাস্ত্রে (II ২৯.১-৪) কথিত আছে। একজন রাখালের ওপর (গোপাল) একশত প্রাণীর দায়িত্ব দেওয়া হতো। পশুজোত বিশাল হওয়ায় তাদের ওপর মালিকের নাম চিহ্নিত করার প্রয়োজন হতো (অর্থশাস্ত্র, II ২৯.৯-১১)। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসন এবং এরাটোস্থেনিসের রচনায় (আরিয়ান, আনাবেসিস, V. ৩)-এর সমর্থন পাওয়া যায়। টানবার-পশু এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য যখন গবাদি পশুর জোত পাওয়া গেল, তখন তাদের মাংসও খাদ্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। মেগাস্থিনিস এবং অন্যান্য গ্রিক রচনাকারেরা অবশ্য গো-হত্যা প্রসঙ্গে নীরব। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে (II ২৯.৪) নিধনের জন্য মহিষ চিহ্নিতকরণের উল্লেখ আছে। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, ছাগল, ভেড়া এবং শূকর মারা হতো এবং তাদের মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হতো। ওই অনুশাসনে বস্তুত এ বিষয়েরও উল্লেখ আছে যে, ছাগল এবং ভেড়ার পুং-প্রজাতির মতো পুং-শূকরও নির্বীর্য করা হবে। সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে মাংসের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য (সম্ভবত?) এটা করা হতো। অবশ্য শূকর যে তখন পুরোপুরি গৃহপালিত এই ঘটনায় তা পরিস্ফুট।

মুরগি জাতীয় প্রাণী যে গৃহস্থালীর অংশ ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ অশোকের পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে আছে। যজুর্বেদের বাজসানেয়ী সংহিতায় মোরগের (কুক্কুট) ডাকের উল্লেখ আছে বটে, তবে সে মোরগ বন্যও হতে পারে। কিন্তু এই সংহিতা ব্যতিরেকে, এই অনুশাসনে মোরগের নির্বীর্যকরণের যে উল্লেখ পাই তার অর্থ হলো, এরা বন্য কুক্কুট নয়। ডিমের জন্য না হলেও মাংসের কারণেই এখন মুরগি-পালন করা হয়। তবে প্রথম প্রস্তর অনুশাসন স্মরণ করলে বলা যায় যে, মাংসের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিলাসিতা ছিল ময়ূর এবং হরিণ— উভয়েই অবশ্য অর্ধ-বন্য।

অকৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা মৃৎশিল্প থেকে শুরু করতে পারি। কৃষিকাজ

এবং গোচারণে যুক্ত হবার পরেও বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পী সম্ভবত এই পেশায় যুক্ত ছিল। মৌর্যযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক মৃৎশিল্প, পশ্চিম পাঞ্জাবের, তক্ষশিলা থেকে উড়িষ্যার শিশুপাল গড় এবং মালওয়ার উজ্জয়ন পর্যন্ত অঞ্চলের মৃৎশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এরা উত্তরের কালো পালিশ-করা পাত্র। অবশ্য প্রকৌশলে তখন সামান্য পার্থক্য দেখা দিয়েছে, কারণ এসব ক্ষারীয় স্তরের সম্পূর্ণ বিনষ্টির জন্য সেগুলিকে উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়াতে হয়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই এর প্রারম্ভের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু মৌর্য যুগে এটি বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছিল এবং তারপর বস্তুত এই মৃৎপাত্রের স্থানগুলিতে প্রাচীনতর মৃৎপাত্র যেমন চিত্রিত ধূসর রঙের পাত্র এবং লাল-কালো মৃৎপাত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় (উভয় ধরনের পাত্রের জন্য বৈদিক যুগ, ৩.১ দ্রষ্টব্য)। মৃৎপাত্রের ব্যাপক বিস্তৃতির নিরিখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারা যায় না যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের সমকালে বা তার পূর্বে প্রকৌশলের যথেষ্ট ব্যাপ্তি ঘটেছিল আর এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিঃসন্দেহে হস্তশিল্পীরাও দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন।

ধাতু ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে, মৌর্য সময়কালে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের লবণাক্ত অঞ্চলে প্রস্তর থেকে লবণ নিষ্কাশন করতে আমরা পূর্বে দেখেছি (১.১ অধ্যায়)। তক্ষশিলার বীর স্তূপে প্রাপ্ত কর্ণেলিয়ান ও আজেট পাথরের প্রাচুর্যে বোঝা যায় যে এইসব মাঝারি-মূল্যের পাথরও এ সংক্রান্ত প্রাপ্তির সুবাদে বিশেষ পরিচিত দক্ষিণ গুজরাটের রাজপিপলায় পাওয়া যেত। একটি সামুদ্রিক উপজাতের কথাও আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি; পাণ্ডিয় রাজত্বের সমুদ্রতটে তুতিকোরিনে মৎস্য চাষের এলাকায় মুক্তা সংগৃহীত হতো (অধ্যায় ২.৫ দ্রষ্টব্য)।

ধাতুর ব্যবহার এবং খনিজ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে উন্নতির অনেক সাক্ষ্য চোখে পড়ে। সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের শাসক-প্রতিনিধির এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থানে স্বর্ণখনির প্রাচুর্য থাকায় তার শাসনের কেন্দ্রীয় নগরটির নাম হয়েছিল সুভন্নগিরি (সুবর্ণ-নগরী)। অতএব সম্ভাব্য স্থানটি মাস্কি (কর্ণাটকে) হতে পারে যার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্বর্ণ উত্তোলনের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঝাওয়ার, অগুচা ও দারিবা (সবকটি রাজস্থানের উদয়পুর জেলায়)-এর আরাবল্লীর খনিসমূহের সন্ধানকার্যে খনির সুড়ঙ্গপথ এবং ভূগর্ভস্থ কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের দণ্ড উদ্ধার করা গেছে। অতএব একটা বিষয় এক্ষেত্রে পরিষ্কার যে মৌর্যযুগে ভূগর্ভে প্রায় ১০০ মিটার গভীরেও খনিজ উত্তোলনের কাজ হতো। ব্রিটিশ জাদুঘরের প্রতিবেদনে এই খনিসমূহ 'প্রাচীনকালের পরিচিত অন্যান্যগুলি মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক এবং আধুনিক' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কার্বন নির্ণীত তারিখ অনুযায়ী খনিজ উত্তোলনের প্রাথমিক পর্বটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয়েছে এবং তৃতীয় শতকের মধ্যেই এই তারিখের সংখ্যা বেশ

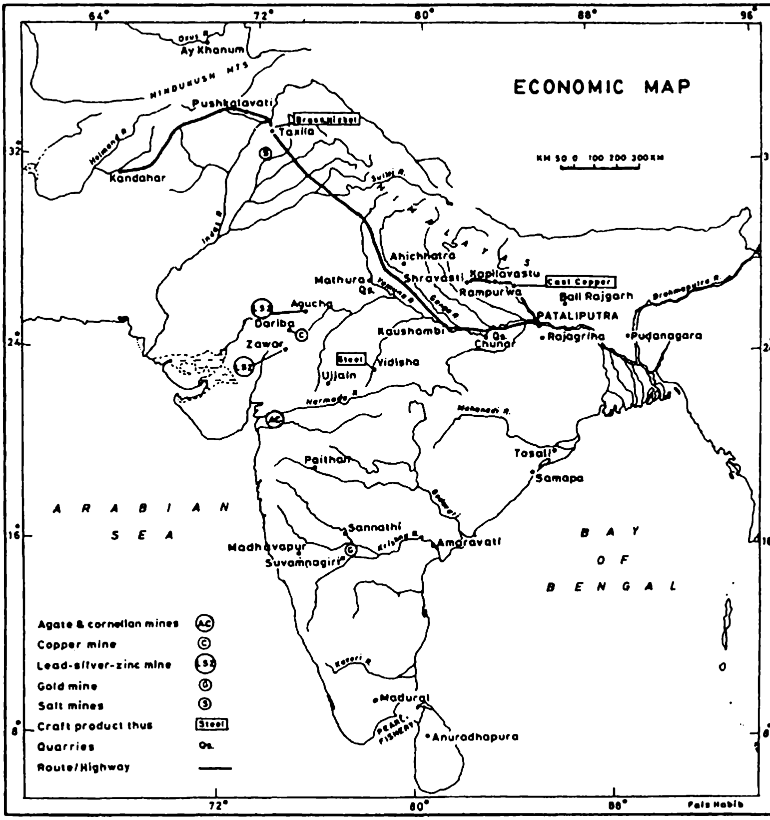

মানচিত্র ৩.১ অর্থনীতি

বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পর খনিজ উত্তোলনের কাছে বেশ দীর্ঘকালের একটি বিরতি দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকে দস্তা উত্তোলিত হওয়ার পূর্ব অবধি এই বিরতি অব্যাহত থাকে। মূলত রূপা এবং সীসা উত্তোলনের জন্যেই ঝাওয়ার খনি ব্যবহৃত হতো। ঝাওয়ার খনিতে প্রাপ্ত তৃতীয় ধাতু হিসাবে দস্তার প্রাচীনত্বের দাবি যদিও পুরোপুরি নস্যাৎ না করেও বলা যায় যে, নিষ্কাশিত ধাতুমলের মধ্যে স্বভাবতই কিছুটা দস্তা থাকতেই পারে।

সোনা এবং রূপার বিশুদ্ধতা অর্জনের প্রশ্নে অর্থশাস্ত্রে ঘনীভবন এবং ঝালাই করা উভয় কাজ সংক্রান্ত জ্ঞান দেখতে পাওয়া যায়। এই রচনার অংশবিশেষ হয়ত উত্তর-মৌর্য যুগে সংযুক্ত করা হয়েছে অথবা এ সংক্রান্ত জ্ঞান আরও বিস্তৃত হয়েছে। তবে অর্থশাস্ত্রের উল্লিখিত রচনার সিংহভাগই এমন বিচারে বাদ পড়বে। কিন্তু আরাবল্লীর খনি এলাকার খননকার্যে বোঝা যায় যে, মৌর্য যুগেও বিশুদ্ধতা বজায়

রাখতে অর্থশাস্ত্রের ওই দুই পদ্ধতি ব্যবহারের রীতি ছিল। তক্ষশিলার (বীর স্তূপ) খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের স্তরে তামা (৫৫ শতাংশ), দস্তা (৩৪ শতাংশ) এবং সীসা (৩ শতাংশ)-র মিশ্রণে প্রস্তুত একটি কাংস্য-দানি পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে পাওয়া কাঁসার প্রাচীনতম নিদর্শন এটি। দস্তা এবং সীসার উপস্থিতিতে খনিজ-উত্তোলনে আরাবল্লী খনির সঙ্গে সংযুক্তির ইঙ্গিত মেলে যেখানে ঘনীভবন পদ্ধতিতে রূপা নিষ্কাশনের পরে অবশিষ্ট গাদে সীসার সঙ্গে যথেষ্ট অনুপাতে দস্তা থেকে যেত। এরপরেই তামার সঙ্গে এই দস্তামিশ্রিত সীসার মিশ্রণে সংকর ধাতু কাঁসা উৎপন্ন হলো। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের মুদ্রা নির্মাণে রূপার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবার পরেই আরাবল্লীর খনিজ-উত্তোলনের কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কারণে তার স্বাভাবিক নিষ্কাশনে প্রাপ্ত দস্তা ও সীসার সংকরও আর পাওয়া গেল না। সে কারণেই প্রায় এক সহস্রাব্দ কালাবধি ধাতু মানচিত্রে কাঁসা উৎপাদনের বিষয়টি সম্ভবত অনুপস্থিত রয়ে গেল। তবে তামা-নিকেল-সংকর ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায় এর মধ্যে ছিল— মৌর্যযুগেই তার প্রথম আবির্ভাব। বীর স্তূপের প্রাপ্ত (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক) একটি অ্যান্টিমনি দণ্ড ও একটি বলয়ে যথাক্রমে ৯ এবং ১৯ শতাংশ নিকেল রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কয়েকজন ব্যাকট্রিয় শাসকের মুদ্রায় নিকেলের পরিমাণ ২০ শতাংশের বেশি ছিল। নিকেল যে কোথায় পাওয়া গেল সেটি এখনও একটা প্রহেলিকা। কেননা এর সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান যেমন ইউয়ান, চীন এগুলি নিশ্চিতরূপে অনেক দূরে।

অশোকের সময়কালেই, বিশাল দৈর্ঘ্যের তামা ঢালাই করার সক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল। রামপুরওয়াতে (চম্পারন জেলা, বিহার) ঢালাই তামার একটা 'বিশালাকার' বল্টু অশোকস্তম্ভের মূল অংশটিকে তার নালীপথের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। এই ঢালাই-করা খণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৭২.৩৩ সেমি. এবং এর মধ্যস্থল এবং দুই প্রান্তের পরিধি যথাক্রমে ৩৩.৬৬ সেমি. ও ২৭.৩১ সেমি। নিয়ারখুশের প্রতিবেদনে দেখা যায় (স্ট্রাবো XV ১.৬৭), ভারতীয়রা বেশ আনন্দিত চিত্তে পাত্রাদি ঢালাই করে বটে কিন্তু সেগুলি মৃৎপাত্রের মতই ভঙ্গুর। বীর স্তূপের (তক্ষশিলা) প্রাপ্ত উপাদানেই এগুলি নির্মিত হতো। সেই উপাদানে ব্রোঞ্জের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে টিন মিশিয়ে সংকর প্রস্তুত করা হলেও সেগুলি 'অস্বাভাবিক' ভঙ্গুর' ছিল। অন্যত্র ঢালাই-এর কাজে সীসাও যুক্ত করা হতো। শূন্য-গর্ভ ঢালাই (Hollow-Cast) পদ্ধতির সঙ্গে সম্ভবত মৌর্য-কারিগরদের পরিচয় ঘটেনি।

সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধাতুটি অবশ্যই লোহা। সৌভাগ্যক্রমে, ভারতবর্ষে ভূপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি ভূগর্ভে লৌহখনি ছিল। সে সময়ে লৌহ আকরিক গলিয়ে বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় অপর্যাপ্ত চারকোল সুবিশাল অরণ্যভূমি থেকে সহজেই পাওয়া যেত। বীর স্তূপে (তক্ষশিলা) ক্ষয়ের কারণে অনেক কিছু

রিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, লৌহ শিল্পকর্ম সংখ্যায় বিচার তামাকে হারিয়ে দিয়েছিল। ভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত বিভিন্ন আকারেও এগুলি তৈরি করা হতো যেমন, কচি, চামচ এবং ডিশ বা পিরিচ; বর্শা-ফলক, তীর-ফলক এবং অঙ্কুশ। এছাড়া শেষভাবে কুঠার, কুড়াল, বাটালি, ছুরি, সাঁড়াশি, নেহাই, পেরেক এবং নিড়ানি-র তা কাজের হাতিয়ার নির্মিত হতো (বীর স্তূপের কাজের হাতিয়ারের জন্য ৩.৩ নং ত্র দ্রষ্টব্য)। প্রধান প্রধান লৌহ হাতিয়ারকে কাঠের হাতলের সঙ্গে কোটর বা পের মধ্যে আটকানোই ছিল সাধারণ পদ্ধতি।

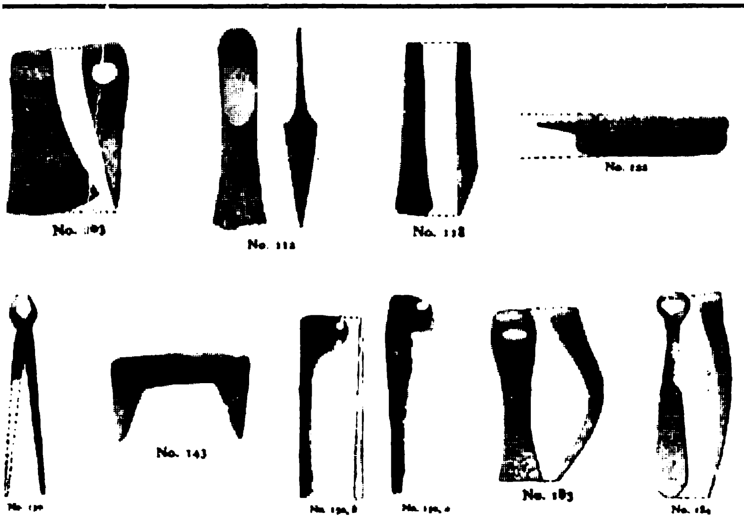

। ৩.৩ তক্ষশিলায় প্রাপ্ত লোহার যন্ত্রপাতি : কুঠার (১০৩ নং); বাটালি (১১২ নং); ছেনি ১৮ নং); ছুরি (১২২ নং); সাঁড়াশি (১৩০ নং); নেহাই (১৪৩ নং); পেরেক (১৫০ ক ং খ); নিড়ানি (১৮৩ এবং ১৮৪ নং), বীর স্তূপ, ২য় স্তর (ব্যতিক্রম ১১২ নং, এটি তৃতীয় র প্রাপ্ত)

Marshall-এর অনুকৃতি)

সম্ভবত মৌর্যযুগের ভারতবর্ষে ইস্পাত প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। গ্রিক পর্যটক সিয়াস (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) আকামেনেদীয় রাজসভা থেকে দুটি ভারতীয় পাতের তলোয়ার উপহার পেয়েছিলেন, এমন তথ্য প্রতিবেদনে রয়েছে। রতবর্ষের মধ্যে এই প্রাচীন ইস্পাতের টিকে থাকা নমুনা সর্বপ্রথম চোখে পড়ে নুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ অব্দে নির্মিত বেসনগরের (সাঁচীর নিকটে) হেলিওডোরাস স্তর তলদেশে যুক্ত লোহার পাতে। এই লোহার মধ্যে ০.৭ শতাংশ কার্বন রয়েছে। পাত দৃষ্টিতে মনে হয় এটি কোনো ভগ্ন তলোয়ার থেকে সংগৃহীত। এই ঘটনার

কারণে ইস্পাত-প্রস্তুতির সময়কাল মৌর্য-যুগের নিকটবর্তী কোনো সময় হওয়াই সম্ভব।

বয়নশিল্পের অবস্থা আলোচনায়, প্রথমেই আমাদের একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কার্পাস তখনও পর্যন্ত বার্ষিক ফসল হয়ে ওঠেনি। এর উৎপাদন ছিল সীমিত এবং পরিচ্ছদের একমাত্র উপকরণ এটি ছিল না। যে সমস্ত তন্তু থেকে নিশ্চিতরূপে সুতো কাটা হতো তাদের একটি তালিকা অর্থশাস্ত্রে (II ২৩.২) পাওয়া যায়; পশম (উর্না), বার্ক-তন্তু (অবল্ক), কার্পাস (কার্পাস), রেশম-কার্পাস (তুলা), শণ (শণ) তিসি (ক্ষৌমা)। তাছাড়া শণ এবং কার্পাসের সঙ্গে (II ২৩.৮) দুলুকা (সনাক্ত করা যায়নি), রেশম (ক্রিমিতন) এবং হরিণের লোম (রঙ্কভ)-এর উল্লেখ আছে। এদের থেকে সুতো কেটে কাপড় বোনা হতো। এখানে যে রেশমের কথা উল্লেখিত, সেটি সম্ভবত অর্ধ-বন্য তসর। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়কালে ভারতবর্ষের অরণ্যাঞ্চলে এটি ব্যাপক পরিমাণে সংগৃহীত হতো। কেবলমাত্র বৈরাট এবং রাইর্ (উভয় অঞ্চলই পূর্ব রাজস্থানে)-এর ছিদ্র-যুক্ত মুদ্রায় আচ্ছাদন-সামগ্রী হিসাবে সুতীর কাপড় পাওয়া যায়। অতএব মৌর্যযুগের অন্তিম সময়কালে কার্পাস-তন্তুতে বোনা কাপড়ের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বেশিরভাগ কাপড় তাদের জন্যেই বোনা হতো।

অর্থশাস্ত্র, (II ২৩.২, ১১) তার সুস্পষ্ট উল্লেখে জানায় যে, তকলিতে সুতো কাটা নারীর কাজ; বিশেষত যারা বিধবা, পঙ্গু, কুমারী, গৃহহীনা। জরিমানা-দণ্ডে দণ্ডিতা বারাঙ্গনার মাতা, রাজার বৃদ্ধা দাসী এবং মন্দিরের অবাঞ্ছিতা ক্রীতদাসী (দেবদাসী)—এটি এইসব সহায়সম্বলহীনাদের কাজ। কিন্তু বয়নের (II ২৩.৮) কাজ করার দায়িত্ব সম্ভবত পুরুষের ওপরই ন্যস্ত ছিল।

এক গুচ্ছ হস্তশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেছে তক্ষশিলার বীরস্তূপে, সেখানে 'ব্যক্তিগত অলংকার' সামগ্রী প্রস্তুত করা হতো। হাতের বালা, পুঁথি এবং শিলমোহরের জন্য নীল, সবুজ, কালো এবং লাল রঙের কাঁচ সাধারণত ব্যবহার করা হতো। বালা এবং পুঁথির উপাদান হিসাবে ঝিনুকের ব্যবহারও ছিল; পথিপার্শ্বস্থ একটি ঝিনুক-কারিগরের দোকান আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে কাটা ঝিনুকের খণ্ডাংশ এবং মুক্তাবাহী ঝিনুক ছিল। কিন্তু কমদামী যেমন কর্ণেলিয়ান বা অকীক জাতীয় পাথর থেকে পুঁতি কাটার কাজে এবং সেই পুঁতির সুচারু ব্যবহারে 'অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত' অলংকার নির্মাণে তক্ষশিলার মৌর্যযুগের কারিগরের দল অতীব দক্ষ হয়ে উঠেছিল। নানান 'পছন্দসই পাথর' তারা কাজে লাগাতো এবং সেগুলি কাটা ও পালিশের কাজে তাদের হাতর নিখুঁত কাজ ছিল 'প্রাচীন বিশ্বে অতুলনীয়'। নীলা, অম্বর, প্রবাল এবং চীনামাটি থেকেও পুঁতি প্রস্তুত হতো।

গৃহনির্মাণের উপাদান হিসাবে পোড়া ইঁট এবং কাদামাটির ইঁট জোড়ার কাজে

দীর্ঘকায় প্রস্তরখণ্ড, পাথরকুঁচি এবং কাঠের ব্যবহারে সে সময়ের গৃহনির্মাণ শিল্প পুরাতত্ত্বে অধিকতর দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। প্রায় ১,৫০০ বছরের ব্যবধানে সিন্ধু সভ্যতার সেই পোড়া ইঁট আবার ফিরে এল এবং কৌশাম্বী ও ভিটা (এলাহাবাদ জেলা) এবং অহিছত্র (বেরিলি জেলা, উত্তর প্রদেশ : ১৯৬৩-৬৫ খননকার্য)-এ মৌর্য সময়কালের কাঠামোয় এবং ভিত্তিতে এদের দেখতে পাওয়া গেল। একটি উপরিস্থ ছাদের (কাঠ ও খড়ের?) সাহায্যে তক্ষশিলার কাঠের স্তম্ভগুলি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু খননকার্যে পাটলিপুত্রে একটি বিরাট হলঘর আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে ৮৪টি পালিশ-করা বালি-পাথরের স্তম্ভের সন্ধান মিলেছে। প্রত্যেকটি স্তম্ভের দৈর্ঘ্য অন্তপক্ষে ৯.৬ মিটার ছিল এবং বর্তমানে তাদের দৃশ্যমান উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। এছাড়া গাঙ্গেয় অববাহিকার বিভিন্ন অঞ্চলে উন্মুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান এমন অনেক স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়; কয়েকটি আবার এর বাইরেও অবস্থিত। শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসাবে পরবর্তী ৩.৫ উপ-অধ্যায়ে এদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে যা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বোধ হয় তা হলো চুনার এবং মথুরার পাথরের খনি থেকে এদের আনা, প্রয়োজনমত কাটা, তারপর সেই বিশাল বিশাল পাথরের ফলকগুলিকে অন্তত কয়েকশ কিলোমিটার দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া— এইসব কাজে কত বিপুল শ্রমশক্তি প্রয়োজন হয়েছিল। চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে এমনই দুটি স্তম্ভ দিল্লিতে স্থাপনের জন্য ফিরোজ তুঘলককে কী পরিমাণ লোক নিয়োগ করতে হয়েছিল সে কথা আমাদের জানা। দড়ি-লাটাই, গরুর গাড়ি, নৌকা এসবও লেগেছিল সে কাজে (৩.৪ চিত্র)। অবশ্য অশোকের যন্ত্রবিদেরাও হয়ত লাটাই-এর ব্যবহার জানতেন। কেননা আলেকজান্ডারের অস্ত্রনিক্ষেপকারী যন্ত্রের সংবাদ সেইসব যন্ত্রবিদ বা তাদের পূর্বসূরীদের নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না অথবা মৌর্যদের আমলে যেসব গ্রিক বা মাসেডোনীয় আধিকারিকগণ ছিলেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তাতেও বিষয়টি তারা জানতে পারেন।

দুর্গবেষ্টিত নগর নির্মাণের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এবং অন্যান্য উপাদান প্রয়োজন হয়। পাটলিপুত্রের প্রতিরক্ষা প্রাচীর যদি মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে অত দীর্ঘই হয়, যদি তারা কাষ্ঠনির্মিত হয়, যে তথ্যের অংশত সমর্থন মেলে পুরাতত্ত্বে (পূর্বের ১.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তবে প্রারম্ভিক নির্মাণকার্য এবং পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয় বিপুল পরিমাণ কড়িকাঠ প্রয়োজন হয়েছিল। কৌশাম্বীতে অবশ্য দুর্গটি একটু স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নির্মিত। সেখানে বিশাল বিশাল কাদামাটিতে ঠাসা ঢিবি এবং প্রাচীরের সামনে পাথরের স্তূপ তৈরি করা হয়েছিল। এটিও মৌর্য সময়কালে নির্মিত। অনুরূপে অন্তিম মৌর্য পর্বে তোসালি (শিশুপালগড়, উড়িষ্যা)-তে চতুর্পার্শ্বস্থ পরিখার সামনে বিশালাকার কাদামাটির ঢিপি তৈরি করা হয়েছিল। উজ্জয়নেও ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি কাদা-ইঁটের প্রাচীর আছে। তবে এটি সম্ভবত প্রাক-মৌর্য যুগে নির্মিত। মৌর্য

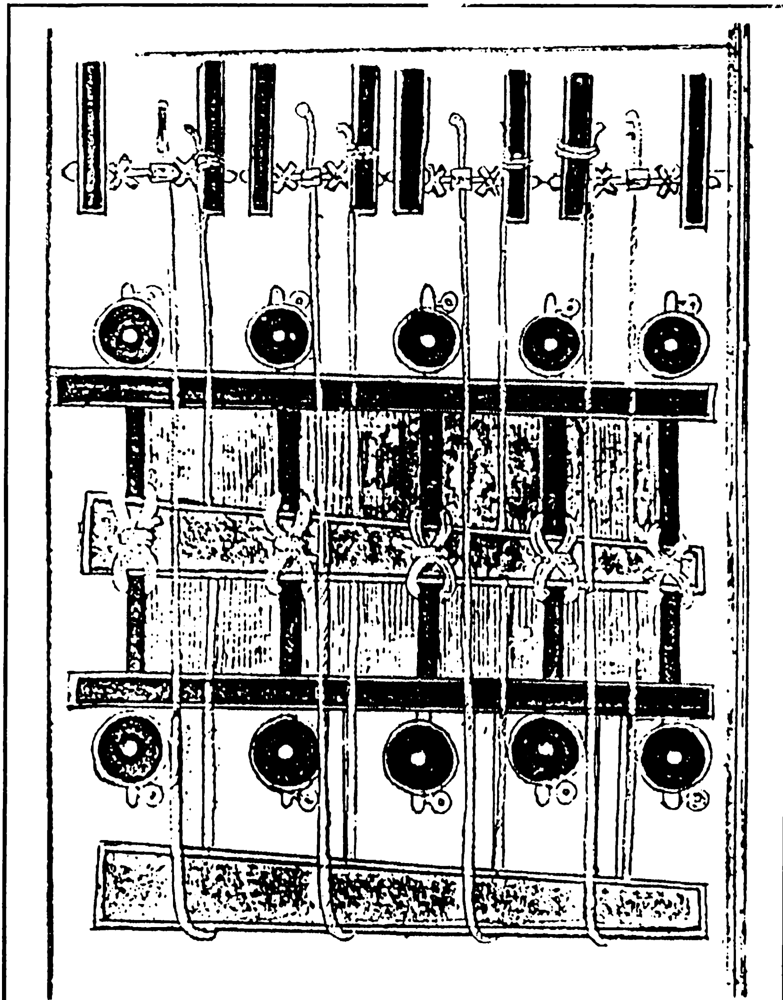

চিত্র ৩.৪ ভূমি থেকে একটি দশচক্রযান অবধি দড়ি এবং কাছিগুটানোর যন্ত্রের সাহায্যে অশোকস্তম্ভটি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিরাট-ই ফিরোজশাহী-এর চিত্র (সৌজন্যে : খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা) একই পাণ্ডুলিপিতে দশটি অন্য চিত্রও রয়েছে, চতুর্দশ শতকে তোপরা থেকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার বিবরণ সেগুলিতে উপস্থাপিত।

সাম্রাজ্যের বহিঃস্থ শ্রীলঙ্কায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২০০ (c.) অব্দের সময়কালে অনুরাধাপুর নগরে ১০০ হেক্টর ক্ষেত্রব্যাপী একটি বিশাল মাটির ঢিপি নির্মাণ করা হয়েছিল।

অশোকের অনুশাসনে সমস্ত শহর 'নগর' অভিধায় উল্লেখিত (প্রস্তর অনুশাসন ৫ম, পৃথক প্রস্তর অনুশাসন ১ম) এবং পাটলিপুত্র ব্যতিরেকে এমন সাতটি নগরের নাম সেখানে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সেগুলি অবস্থিত ছিল : তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, তোসালি, সমপা, সুভন্নগিরি এবং ইসিলা (পূর্বের ১.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মেগাস্থিনিস অবশ্য (আরিয়ান, ইণ্ডিকা, VIII) মেথোরা (মথুরা) নামটিও উল্লেখ করেছেন। মৌর্য যুগের অন্যান্য শিলালিপিতে (১.২ মানচিত্র দ্রষ্টব্য) আরো চারটি নাম আমাদের সামনে এসেছে : সাবিতি (শ্রাবস্তী), বারানসী (বেনারস), পুড়ানগর (মহাস্থান) এবং চিকাম্বরি (দেওতক)। এই বারোটি স্থানের প্রায় সবকটিতে এবং অন্যত্র যেখানে মৌর্য যুগের অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানেই খননকার্য চালানো হয়েছে যেমন, আফগানিস্তানের কান্দাহার, উত্তরপ্রদেশের অহিছত্র এবং শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুর।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতেই মূলত ত্রফ আর আলচিচ মৌর্য-যুগের শহরগুলির বসতি এলাকায় নিম্নলিখিত হিসাব পেশ করেছেন :

প্রথম শ্রেণী, ২৪০ হেক্টরের অধিক :	পাটলিপুত্র (আনুমানিক ক্ষেত্র : ৩৪০ হেক্টর)
দ্বিতীয় শ্রেণী, ১৮১-২৪০ হেক্টর :	রাজগৃহ, কৌশাম্বী, বিদিশা (বেসনগর)
তৃতীয় শ্রেণী, ১২১-১৮০ হেক্টর :	অহিছত্র, শ্রাবস্তী, তোসালি (শিশুপালগড়), পুড়ানগর (মহাস্থান)
চতুর্থ শ্রেণী, ৬১-১২০ হেক্টর :	উজ্জয়ন, সমাপা (জৌগড়া), পাইথান, অনুরাধাপুর (শ্রীলঙ্কা)
পঞ্চম শ্রেণী, ৩১-৬০ হেক্টর :	কান্দাহার, তক্ষশিলা, বালিরাজগড় (বিহার), সন্নাথি, মাধবপুর (কর্ণাটকে), ধান্যকাতাকা (অমরাবতী)
ষষ্ঠ শ্রেণী, ১৬-৩০ হেক্টর :	কপিলাবাস্তু (উত্তরপ্রদেশে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল), পুষ্কলাবতী (চারখাদ্দা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)

সিন্ধু সংস্কৃতির শহরগুলির ক্ষেত্রে আমরা জনসমষ্টির মান যেভাবে নির্ধারণ করেছি (২.৪ সিন্ধু সভ্যতা) অর্থাৎ এক হেক্টরে প্রায় ৪০০ জন মানুষ, সেইভাবে বাসিন্দাদের ওই একই অনুপাতে যদি আমরা এই ক্ষেত্রের হিসাবগুলি জনসংখ্যায় পরিবর্তিত করে নিই, তাহলে সাম্রাজ্যের বৃহত্তম নগরে নিশ্চয় প্রায় ১৪০,০০০ বাসিন্দা ছিল এবং সবচেয়ে কম যে নগরের এলাকা সেই কপিলাবাস্তুতে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬০০০ থেকে ১২০০০। এইভাবে বিভিন্ন আয়তনের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা নাগরিক জনসমষ্টির সংখ্যাও বেশ যথেষ্টই ছিল। অবশ্য যথেষ্ট

তথ্যের অভাবে সামগ্রিক জনসংখ্যায় নগরবাসীর অনুপাত এমনকি অনুমানও করা যায় না।

কৃষি, তৃণভূমি এবং অরণ্যানিতে উৎপন্ন কাঁচা মালের সরবরাহেই নগরগুলিকে পুষ্ট করার প্রয়োজন হতো। এটিই বাণিজ্যের আরেকটি অভিমুখের ভিত্তি। শহরগুলি ছিল হস্তশিল্পের কেন্দ্র, এখানকার উৎপাদিত সামগ্রীতে কেবলমাত্র নগর নয়, সমগ্র গ্রামীণ প্রয়োজনও পূরণ করা হতো। (যেমন কৃষি হাতিয়ারের জন্য লোহার সামগ্রী বা অস্ত্রশস্ত্র)। দূরবর্তী বাজারের চাহিদা পূর্ণ করতেও উৎপাদন করা হতো শহরে। এই সমস্ত কারণে নগরগুলি বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তক্ষশিলার বীর স্তুপে, পথ-অভিমুখী সারি দেওয়া ঘরগুলি সম্ভবত দোকান হিসাবে সনাক্ত করা যায়।

দূরগামী বাণিজ্যের প্রসঙ্গে, অর্থশাস্ত্র, (II ১১), যেসব স্থান থেকে এইসব মূল্যবান সামগ্রী পাওয়া যেত সেই সব অঞ্চলের হদিশ আমাদের জানায়। রচনার এই অংশটি উত্তর-মৌর্য যুগের বলে মনে হয়, কেননা এখানে শ্রীলঙ্কা পরসমুদ্র নামে উল্লেখিত, এছাড়া আলেকজান্দ্রীয় প্রবাল, 'নেপালা' পশম এবং 'চিনা' রেশমের কথাও চলা হয়েছে (টীকা ১.২ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আমরা দেখেছি, মেগাস্থিনিসের বিবরণে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভারতের পাণ্ডিয় রাজত্বে উৎপন্ন মুক্তার চাহিদা সমগ্র ভারতবর্ষেই ছিল। আর পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারে আমরা জানতে পারি, পুঁতি প্রস্তুতির জন্য দক্ষিণ গুজরাট থেকে কর্ণেলিয়ান আর অকীক জাতীয় পাথর এবং আরব সাগরের তট থেকে সামুদ্রিক ঝিনুক তক্ষশিলায় আনা হতো।

স্থল এবং সমুদ্র উভয় পথেই চলত দূরগামী বাণিজ্য। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী, স্ট্র্যাবো (XV. ১.১১) এবং আরিয়ান (ইন্ডিকা, III) তাঁর রচনা থেকে যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তদনুসারে, পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গার জলপথে সমুদ্রে (বঙ্গোপসাগর) পৌঁছানো যেত। তবে এখানে জলপথের দৈর্ঘ্য বলা হয়েছে ৬০০ স্টাডিয়া (বা ১,১১০ কিলোমিটার)। এ হিসাবটি একটু অতিরঞ্জিত। পশ্চিমে একটি রাজপথের সংযোগে রাজধানী সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই পথের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১,০০০ স্টাডিয়া (বা ১,৮৫০ কিলোমিটার)। গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে, স্থাপিত অশোক স্তম্ভের শিলালিপি সহ অথবা ব্যতিরেকেই) স্থান বিচারে পথের ব্যাপ্তি চিহ্নিত করা যায়— পূর্ব থেকে পশ্চিমে— প্রহ্লাদপুর, সারনাথ, এলাহাবাদ, কৌশাম্বী, সঙ্কিসা, মীরাট এবং তোপরা (শেষের দুটি পরবর্তী কালে দিল্লির বাইরে চলে গেছে)। আফগানিস্তানে, আরমীয় ভাষায় লিখিত লাঘমান পথ-শিলালিপি সেখানে এই রাজপথের উপস্থিতির কথা জানায় (করপথি, সেনাপথ)। অন্য আরেক সারি স্তম্ভ অপর একটি পথের সন্ধান দেয়— সম্ভবত এটা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের পথ— পাটলিপুত্র থেকে উত্তর অভিমুখে কোলহুয়ার মধ্য দিয়ে

(বৈশালীর নিকটে) লাউরিয়া আরারাজ, লাউরিয়া নন্দনগড়, রামপুরওয়া, রুম্মিনিদেই, নিগালিসাগর ছুঁয়ে সেই পথ অবশেষে শ্রাবস্তীতে শেষ হয়েছে। (স্তম্ভের উল্লিখিত স্থানের জন্য মানচিত্র ২.১-২.৩ দ্রষ্টব্য)। অশোকের অনেক স্তম্ভ অনুশাসন পথিপার্শে স্থাপিত এমন সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যে স্থানগুলি পরস্পরের থেকে অনেক দূরে তাদেরও যুক্ত করে সর্বদাই স্তম্ভের বিচারে মৌর্য রাজপথের ঠিকানা খোঁজা একটু অতিরিক্ত অনুমান হয়ে যাবে।

এই রাজপথগুলি তাদের বিস্তৃতির বেশিরভাগ স্থানে নিছকই ঝোপঝাড়, জঙ্গল পরিস্কার-কথা একটা সংকীর্ণ পথরেখা মাত্র এমন ভাবনার কোনো অবকাশই নেই। পথের সব অংশ হয়ত তেমন মসৃণ নয় কিন্তু নিয়মিত গাড়ি চলাচলের চিহ্ন আছে তার বুকে। ক্ষুদ্র কয়েকটি অংশ ছাড়া কোথাও এটি শান বাঁধানো নয়। বীর স্তূপের খননকার্যে শহরের মধ্যেও এমন কোনো পথের চিহ্ন নেই। অশোকের দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসন এবং সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.২ এবং ২.৭ [গ] দ্রষ্টব্য) দেখা যায় যে, সমগ্র পথ বরাবর দু-পাশে বৃক্ষসারি, বিশেষত বটবৃক্ষ রোপণ করা হবে এবং অল্প দূরত্বে জলের জন্য কূপ থাকবে। বিশ্রাম স্থলের (সম্ভবত ছাউনি) উল্লেখও রয়েছে সেখানে। সম্ভবত দূরতর যাত্রাপথেই এগুলি স্থাপিত। একটি আদর্শ পথের ক্ষেত্রে, তার শক্ত মসৃণ উপরিতল অপেক্ষা এইসব সুবিধা এবং এর সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটি হয়ত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো। প্রকৃতপক্ষে কতটা গমনাগমন যে এই পথে ছিল, তা আজ আমাদের কাছে একটি ‘বন্ধ কিতাব’ হয়েই রয়ে গেছে।

তবে ন্যায্য যুক্তিতেই অনুমান করা যায় যে, যেসব গবাদি-পশুর জন্য অশোক পথিপার্শ্বে তৃষ্ণা নিবারনী জলের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন সেগুলি মূলত ভারবাহী এবং গাড়ি ও রথ-টানা ষাঁড়। উটও কখনও কখনও একাজে ব্যবহৃত হতো। তবে উদয়গিরির অশোকের স্তম্ভ শীর্ষে তখনও দু-কুঁজ বিশিষ্ট ব্যাকট্রিয় উটের ভাস্কর্যই রয়েছে। এইসব লোমশ পশু ভারতের উষ্ণ সমতলভূমিতে মোটেই কোনো কাজে আসে না। এক কুঁজ বিশিষ্ট উটই এ কাজে অনেক বেশি সক্ষম। কিন্তু পরবর্তী প্রজাতিটি তখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে এসে পৌঁছতে পারেনি। অশোকের স্তম্ভশীর্ষে যে গরুর-গাড়ির ভাস্কর্য রয়েছে (যেমন সারনাথে, চিত্র ৩.১১), সেটি বেশ উন্নত দর্শন— তার অক্ষদণ্ডে চব্বিশ থেকে আটাশটি স্পোক বৃত্তাকারে সজ্জিত। এতে স্পোকের ঢাল বা পিরিচাকৃতির বেশ স্পষ্ট আভাস মেলে। আত্রানজিখেরার খেলনা-শকটেও ওই একইরকম চাকা। যেরকম অমসৃণ পথে রথকে চলতে হতো, সেখানে এই চাকা যুক্ত করলে আরো দ্রুতবেগে এবং মসৃণগতিতে অনেক দূরতর পথ অতিক্রম করা যায়। সমসাময়িক চীন এই চাকতি সদৃশ চাকার বিদ্যা জানত কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো না।

কর প্রদানে অর্থের ব্যবহার এবং টাকা হিসাবে ছিদ্রযুক্ত রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনের

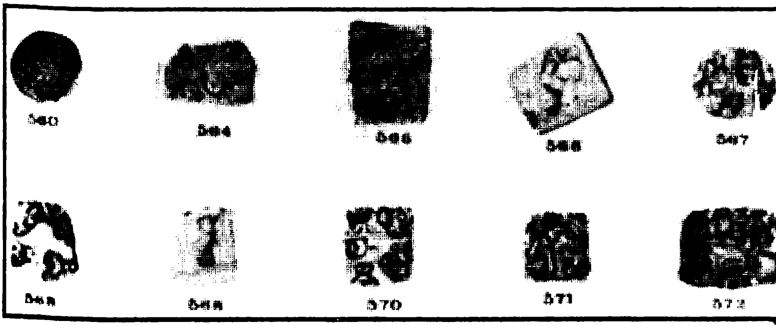

চিত্র ৩.৫ '৬ (খ) পংক্তিমালা'-র ছিদ্রযুক্ত মৌর্য মুদ্রা, (শ্রেণি বিভাজন, তালিকা নম্বর এবং অনুকৃতি, P. L Gupta এবং T. R. Hardaker)

বিষয়টি ১.৫ অধ্যায়ে আমরা সামান্য আলোচনা করেছি (চিত্র ৩.৫)। এই মুদ্রা বাণিজ্যেও কাজে লাগত। অতএব তাদের ব্যবহার প্রচলিত থাকায় এক শ্রেণীর মুদ্রা-বিনিময়কারীও নিশ্চয়ই উত্থিত হবে, যারা এইসব মুদ্রা যাচাই-পরীক্ষা করবে, এবং তাদের ওপর চিহ্ন (ব্যাঙ্কের চিহ্ন) অঙ্কিত করবে। মুদ্রার মজুত-ভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে ঋণদানের ব্যবসায় কোনো মহাজন শ্রেণী যুক্ত ছিল কিনা তা জানা যায় না। মৌর্য যুগে এইসব ব্যক্তিগত চিহ্নের স্থলে ক্রমশ ট্যাঁকশাল নির্গত সরকারি চিহ্ন দেখা দিল। সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্য তাদের নিজস্ব ট্যাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রার বিষয়ে বেশ কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। অন্যদিকে খাদ মিশিয়ে ওজনেও বেশ পরিবর্তন আনা হলো। মুদ্রার এক-চতুর্থাংশ ভাগে রইল তামা অথচ ব্যক্তিগত মুদ্রার ওজন ৩.৩ থেকে ৩.৫ গ্রামই রয়ে গেল। মৌর্য সাম্রাজ্যের টিকে-থাকা অর্থভাণ্ডারে মুদ্রা সংখ্যার বৃদ্ধিতে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই খাদ-মেশানোর ফলে মুদ্রার বর্ধিত দাবী মেটানোর পরেও মৌর্য তহবিলে বেশ ভালোই মুনাফা করতে পেরেছিল। কিন্তু মুদ্রায় এমন খাদ মেশানোর ফলে বাজারে মুদ্রার মূল্যও কমে যেতে বাধ্য। ফলে বাড়তি মুনাফার অধ্যায়টি ক্রমশ শেষ হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ট্যাঁকশালের সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানাধীন ট্যাঁকশালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটাতে অর্থশাস্ত্র (II ১২.২৬) ওইসব ব্যক্তি মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু মৌর্য যুগেরও কিছু জাল মুদ্রা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এদের আধুনিক উত্তরাধিকারীদের মত, এইসব জাল মুদ্রার কারবারীরা মাঝে মাঝে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির আশ্রয় নিত। এইভাবে অশোকের সময়কালের একটি জাল মুদ্রা প্রকৃতপক্ষে একটি তামার টুকরো যার উপরে রূপোর আস্তরণ দেওয়া আছে। জাল মুদ্রা নির্মাণ প্রযুক্তির এই প্রাচীনতম নিদর্শনটি ভারতবর্ষেই পাওয়া গেল।

মুদ্রার এই ব্যাপক ব্যবহারে ঋণদানের কাঠামো বিস্তৃতির পক্ষে সহায়ক হলো।

গুন্ডি-বিনিময়ের কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ অবশ্য আমাদের জানা নেই। অন্যদিকে, পাণিনি সরল হারে সুদ আদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। সেখানে তিনি গড় হিসাবে প্রতি দশ আসলে সুদের, সম্ভবত মাসিক সুদের পরিমাণ ১ এভাবে হিসাব দেন। (দশৈকাদশ; ১০.১১) আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে মাসিক ১.২৫ শতাংশ, বাণিজ্য ঋণের জন্য ৫ শতাংশ, অরণ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের জন্য ১০ শতাংশ এবং সমুদ্রযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের ২০ শতাংশ সুদের হার অর্থশাস্ত্র (III ১১.১) বৈধ ঘোষণা করেছে। সুদের হারের বিভিন্নতায় এখানে ঋণদানে ঝুঁকি নির্ধারিত হয়েছে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে (III ১১.৪) চাষের মরসুমে সুদের হার ৫০ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে আর অর্থ ফেরত না পাওয়া গেলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রযুক্ত হবে। পাণিনি যাকে সুদের হার হিসাবে গণ্য করেছেন এই হলো বস্তুত তার পরিমাণ।

৩.২ সমাজ

আমাদের প্রদত্ত মৌর্য প্রশাসনের বিবরণ (১.৫ অধ্যায়) এবং সেই সময়ের অর্থনীতির (৩.১) নিরিখে একটা চিত্র স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আর্থিক উদ্বৃত্তের বিশাল পরিমাণের দাবিদাব একটি শক্তিশালী শাসকশ্রেণী তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। যে শ্রেণীসমূহ থেকে এই শাসকশ্রেণীর উদ্ভব হতে পারে, তার একটি তালিকা অর্থশাস্ত্রের দুটি অংশে পাই। একটির নাম হলো পৌরজনপদ, আক্ষরিক অর্থে নগর বা প্রদেশসমূহের (জন) (II ১৪.১)। আমাদের রচনায় এই নামটির বিবরণে একটা বিষয় পরিষ্কার হবে যে, এই অভিধায় সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়নি, বরং দেশের স্থায়ী বসতি বা শাসিত অঞ্চলের প্রভাবশালী এবং বিত্তবান মানুষজনকেই বোঝানো হয়েছে। এদের মধ্য থেকে আধিকারিক নিয়োগ করা হতো এবং এদের দাক্ষিণ্যেই অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (অথবা শাস্তি প্রদান) দেওয়া হতো। অশোকের অনুশাসনে উল্লিখিত 'জনপদ' শব্দটি (পূর্বের ১.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমাদের স্মরণ থাকতে পারে। সেখানে এতে প্রদেশ বা অঞ্চল বোঝান হয়েছে। ঠিক তেমনি পৌরজনপদ (১৫০ খ্রিস্টাব্দের রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপি ব্যতিরেকে আর কোথাও উৎকীর্ণ লিপিতে এর সাক্ষ্য নেই) শব্দটিও মৌর্য যুগের পরে প্রাচীন হিসাবে বাতিল হয়ে যেতে পারে। অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত (XI. ১) দ্বিতীয় শব্দটি হলো সঙ্ঘ, আভিধানিক অর্থে অনুবাদকেরা একে কর্পোরেশন বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসিত সংস্থা (oligarchy) বলবেন; কিন্তু আমাদের আলোচিত প্রসঙ্গে এই শব্দটি সম্ভবত কোনো গোত্র বা গোষ্ঠীকে বোঝায়। দু-জাতীয় সঙ্ঘ ছিল: (১) কম্বোজ ইত্যাদি, সম্পদের সাহায্যে এবং যোদ্ধা হিসাবে জীবিকা নির্বাহী, এবং (২) লিচ্ছবি ইত্যাদি, শাসক গোত্রের দাবিদার। প্রতিটি গোষ্ঠীতে গোত্রনামের যে তালিকা তার থেকে বোঝা যায় যে, রচনার এই অংশটি অন্তত প্রাচীন সময়কালের (১.২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। অর্থশাস্ত্রে আরো জানা যায়, এই সমস্ত গোষ্ঠী পরস্পরের

সঙ্গে এমন সহজাত বন্ধনে আবদ্ধ যে তাদের বিচ্ছিন্ন করা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু রাজাকে এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন এই ঐক্য ভাঙবার চেষ্টায় সতত নিযুক্ত থাকেন এবং কয়েকজন গোত্র নেতাকে নিজের সপক্ষে এনে অন্যদের বিচ্ছিন্ন, নিরপেক্ষ বা ধ্বংস করে ফেলেন।

মৌর্য আমলাতন্ত্রে কর্মরত ব্যক্তিমানুষদের সম্পর্কে সামান্য যেটুক তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে আমাদের এই অনুমান নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পায় যে, স্থায়ী বসতির এলাকা এবং পেশাদার ও শাসক গোত্র, উভয় শ্রেণীভুক্ত অভিজাত মানুষজন থেকেই এই আমলা নির্বাচিত হতো। চিরাচরিত ঐতিহ্যের অনুরূপতার মধ্যেও এই অভিযোগ ধ্বনিত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী একজন ব্রাহ্মণ, চাণক্য বা কৌটিল্য। রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে ওই সম্রাটের সৌরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাজ্যপালকে 'বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত' নামে ডাকা হতো। তাঁর পরিচয়ে মনে হয় যে, তিনি সম্ভবত নাগরিক বা বণিক শ্রেণী (পৌরজনপদ) থেকে এসেছেন। অশোকের অধীনস্থ তাঁর উত্তরাধিকারী, হেলেনীয় ইরানী তুযাস্‌প, সম্ভবত কম্বোজ গোষ্ঠীর মানুষ। অর্থশাস্ত্রে যোদ্ধা গোত্রের (সঙ্ঘ) তালিকায় সর্বপ্রথমে এই অঞ্চলের নাম রয়েছে। মৌর্যদের আমলাতন্ত্রে উত্তর-পশ্চিমী উপাদানের অভিঘাতের অন্য প্রমাণও আছে, ইতিমধ্যেই ১.৫ অধ্যায়ে সেটি উপস্থাপিত হয়েছে।

এই শাসকশ্রেণী বিবিধ উপাদানে গঠিত ছিল এবং বর্ণ ব্যবস্থার তিনটি মূল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজের মধ্যে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যথা, জন্মসূত্রে স্তরবিভক্ত মর্যাদা বা ক্ষমতা, নির্ধারিত বংশানুক্রমিক বৃত্তি এবং সগোত্রে বিবাহ (বৈদিক যুগ, ২.১ টীকা দ্রষ্টব্য)। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির মূল এখন সমাজজীবনের অনেক গভীরে প্রোথিত। ভারতীয় বর্ণের বিবরণে মেগাস্থিনিস যা বলেছেন সেটি দিয়োদোরাস (নিষ্কর্ষ ৩.১), স্ট্রাবো (X. ১.৩৯-৪১, ৪৬-৪৯) এবং আরিয়ানের (ইন্ডিকা, XI-XII) রচনায় রক্ষিত। মেগাস্থিনিস যখন 'দার্শনিকদের' অত্যন্ত উচ্চ এবং সম্মানজনক পদে আসীন একটি বর্ণ গঠন করতে দেখেন, তখনই তিনি বর্ণ ব্যবস্থার স্তরবিন্যস্ত কাঠামোটি সনাক্ত করতে পারেন। একজন মানুষকে যে বর্ণের অন্তর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা হতো, সেই বর্ণটি পরিবর্তন করা অথবা সেই বর্ণের বাইরে বিবাহ করার সাধ্য যে তার ছিল না একথা তিনি বেশ দৃঢ়স্বরেই ঘোষণা করেন। এই বৈশিষ্ট্যকেই একবার যখন তিনি সাতটি ভাগে বিভাজিত করে বর্ণনা করেন, তখন সেই ভাগগুলিকে তিনি মূল গ্রিক শব্দ খাঁটি বা কুল যে অভিধায় বিশেষিত করুন না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না; এখানে যে অর্থ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বর্ণ।

বর্ণের সঠিক অভিধা ঠিক কী হবে তার সন্ধানে কেবল যে গ্রিকদেরই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল তার নয়; এ সমস্যা ভারতবাসীরও আছে। আর্য সমাজের চিরাচরিত

চতুর্বর্ণ-বিভাজন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র)-ব্যবস্থা এবং প্রাচীনকালের ধর্মসূত্র ও মনুস্মৃতিতে নির্ধারিত এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পদমর্যাদা আর ক্রিয়াকলাপ অর্থশাস্ত্র সর্বদাই অনুসরণ করেছে। অর্থশাস্ত্রে (I ৩.৪-৮ : নিষ্কর্ষ ৩.২) প্রতিটি বর্ণের জন্য বিবিধ দায়িত্বের (ধর্ম) ভার দেওয়া হয়েছে— শূদ্ররা প্রথম তিনটি 'দ্বিজ বর্ণ' যাদের সর্বোচ্চে আছে ব্রাহ্মণ সর্বদা তাদের পদানত থাকবে— সংক্ষিপ্তসারে এইভাবেই ব্যবস্থাটি রচিত। ওই একই উপ-অধ্যায়ে (I ৩.৯) বর্ণের সকল সদস্যকে গোত্রবিবাহ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য এটা পরিষ্কার যে চতুর্বর্ণের বাইরেও বর্ণ ব্যবস্থা বিস্তৃত ছিল। অসংখ্য বর্ণ ছিল যাদের এই প্রতিষ্ঠিত বর্ণ ব্যবস্থার ভেতরে আনা যেতো না। এই সব গোষ্ঠীদের নাম দেওয়া হয়েছিল অন্তরাল (মধ্যবর্তী)। এর মধ্যে চোদ্দটি নাম ওই রচনায় উল্লেখিত। অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন বর্ণ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যদের (নারী-পুরুষ) মিলনেই এই চোদ্দটি বর্ণের উৎপত্তি (III.৭.২০-৩৪)। এদের মধ্যে কয়েকটিকে শূদ্রদের ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে, কয়েকটি আবার শূদ্রদেরও নীচে চণ্ডালদের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক বর্ণ। এদের বংশানুক্রমিক পেশায় নিযুক্ত থাকতে এবং অন্তর্বিবাহের পথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (III. ৭.৩৬)। সচরাচর এইসব বর্ণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত শব্দটি হলো 'জাতি'। এই শব্দটি আবার পাণিনিতে গোষ্ঠী বা ভ্রাতৃত্ব এরকম একটা অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (V ৪.৯)। আর অর্থশাস্ত্রেও এ শব্দটির নানাবিধ প্রয়োগ। অর্থশাস্ত্রে (III. ৭.৪০ এবং III. ১০.৪৫) এর অর্থ অঞ্চলের বাইরে বসবাসকারী নিছকই একটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী, গোত্র (সঙ্ঘ), গ্রাম এবং পরিবার যারা একই আচার পালন করে। অর্থশাস্ত্রের I. ১২.২১ অংশে বিভিন্ন জাতি অর্থাৎ জাতি বা জনগোষ্ঠী, mlechchhas বা বিদেশীদের উল্লেখ আছে।

'মধ্যবর্তী' জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, যেসব গোষ্ঠী স্বীকৃত বর্ণের বাইরে অবস্থিত, তাদের ওপরেও বর্ণ ব্যবস্থার সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভার চেপে বসেছে। বর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন জাতিচ্যুতদেরও অনুরূপে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করছে। অন্তিম বৈদিক রচনার মতো অর্থশাস্ত্রেও এই জাতিচ্যুত শ্রেণীদের জন্য যে সাধারণ শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছে, তা হলো চণ্ডাল। অর্থশাস্ত্রের তালিকাবদ্ধ এই সমস্ত বর্ণ কেবল অসবর্ণ বিবাহের ফসল এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। চণ্ডাল নারী বা পুরুষের সঙ্গে সম্ভাব্য মিলনও পরিহার করা হয়েছে। অন্য অর্থে, এই বর্ণ যে চণ্ডালের চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের নয় সেকথা আবার অর্থশাস্ত্রে (III ৭.৩৬) স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিবৃত আছে যে, সমস্ত অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী চণ্ডালের নয়, শূদ্রের দায়িত্ব পালন করবে। চণ্ডালদের নগরের ভেতরে বসবাসের অনুমতি ছিল না। শ্মশানের খুব কাছেই তারা থাকতো (II ৪.২৩)। যে সামগ্রী একবার চণ্ডাল ব্যবহার করেছে

সেটি আর অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না-– এই বিবৃতিতে 'অস্পৃশ্যতা'-র প্রত্যক্ষ উদাহরণ পাই আমরা (I ১৪.১০)। যদি কোনো চণ্ডাল কোনো আর্য রমণীকে স্পর্শ করতো তাহলে তার ওপর বিরাট জরিমানার ভার চাপানো হতো (III. ২০.১৬)। চণ্ডালরা সম্ভবত পতিতদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নশ্রেণী। কিন্তু তাদের সঙ্গে জোট বাধার মতো আরো অন্য শ্রেণীও ছিল যেমন, ভাগুরিকা (ফাঁদ পেতে পশু ধরতো, শবর, পুলিন্দা এবং অরণ্যচারা (অরণ্যের মানুষ)— এদের ও'পর পাহারা দেবার দায়িত্ব থাকতো। চণ্ডালের মতো শ্বাপক নামটিও সমস্ত পতিতদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে (IV, ১৩.৩৪-৩৫)। কোনো শ্বাপক যেন আর্য রমণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না তোলে, নচেৎ তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। মনুস্মৃতিতেও (X ৫১-৫৬) চণ্ডাল এবং শ্বাপকদের অচিন্তনীয় অক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।

তাহলে, কেবলমাত্র এই চারটি বর্ণেই বর্ণসমাজ গঠিত হয়নি। মধ্যবর্তী বর্ণসমূহ এবং পতিত বর্ণও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব মেগাস্থিনিস যখন তাঁর বর্ণের গুণতিতে প্রচলিত চতুর্বর্ণের সংখ্যা অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব হিসাবে প্রধান বর্ণের সংখ্যা সাতটি স্থির করেন, তখন তাঁর এই বিচারে আমাদের বিস্মিত হবার কথা নয়। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগ যে সম্পূর্ণত পেশার ভিত্তিতে করা হয়েছে সেটি নিশ্চিত করে বলা যায়। তাই খুব সহজ হিসাবেই তাঁর প্রথম বর্ণ 'দার্শনিক' এবং পঞ্চম বর্ণ 'যোদ্ধা' যথাক্রমে 'ব্রাহ্মণ' এবং ক্ষত্রিয়ের পেশা হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যে কোনো বর্ণ থেকেই সমন (এরাও 'দার্শনিক') হওয়া যেতো; আর কেবল ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও যে সেনা হিসাবে যথেষ্ট যোগ্য সে কথা অর্থশাস্ত্র (IX. ২.২৪)-ও মেনে নিয়েছে।

বৈশ্য এবং শূদ্রের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক মর্যাদার বিভাজন বেশ সুস্পষ্ট; কিন্তু এদের পেশাগত বিভিন্নতার বিভাজন রেখাটি একেবারেই অস্পষ্ট। বিশ অর্থাৎ গণ-এর উত্তরাধিকারী হওয়ায় বৈশ্যরা তখনও তাত্ত্বিক বিচারে 'কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য'-এর সঙ্গে যুক্ত (অর্থশাস্ত্র, I ৩.৭); আর রথ-নির্মাতাগণকে (রথকার) তাদের কর্মের (কর্মন) জন্য 'বৈশ্য' শ্রেণীতে রাখা যাচ্ছে না। বস্তুত সমস্ত জমি এখন শূদ্র কৃষকেরা (কর্ষক) চাষ করবে— এই নিদান ঘোষণার ফলে অধিকাংশ কৃষকের 'বৈশ্য' মর্যাদা অস্বীকার করা হলো। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সংকলিত মনুস্মৃতিতে (X.৮০, ৮৪) বৈশ্যদের একটি কতৃত্বব্যঞ্জক পেশা হিসাবে বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে; কৃষিকাজ নিন্দিত হলেও, বৈশ্যদের একাজ করে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই গ্রাম্য-কারিগর এবং বণিকের সম্মিলনে গড়া মেগাস্থিনিসের চতুর্থ বর্ণ সম্ভবত বৈশ্য আর তাঁর দ্বিতীয় ও অবশিষ্ট যে অসংখ্য বর্ণ যাদের সকলেই কৃষক, সেটি হলো শূদ্র। এইভাবে অপনয়ন-পদ্ধতিতে এসে যায় তৃতীয় বর্ণ যারা যাযাবর গোপালক, মেষপালক এবং শিকারী, তারা চণ্ডাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইমাত্র আমরা

দেখেছি যে, অর্থশাস্ত্র (II ১.৬) নিজেই ফাঁদ পেতে পশুধরা শিকারী আর অরণ্যবাসীদের চণ্ডালদের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে; অন্যত্র (III ৪.২২) আবার গোপালক (গোপাল)-দের জেলে, পক্ষিশিকারী, শুঁড়ি ইত্যাদির সঙ্গে একই গোষ্ঠীতে জুড়ে দিয়েছে; অবশ্য এই গোষ্ঠীর স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে বর্ণ-নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এইভাবে এই সবকটি গোষ্ঠীকে একত্রে একটিমাত্র নিম্নবর্ণে একত্রিত করার যথেষ্ট ন্যায়সংগত কারণ আছে।

তাহলে এখন মেগাস্থিনিসের দুটি বর্ণ, ষষ্ঠ এবং সপ্তম, যেখানে তিনি যথাক্রমে অধ্যক্ষ এবং উপদেষ্টাদের চিহ্নিত করেছেন, সে দুটিই অবশিষ্ট রইল। মেগাস্থিনিসের এই বিচারে নিশ্চিতরূপে মৌর্য সাম্রাজ্যে আমলাতন্ত্রের বিশেষ গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু উপ-অধ্যায়ের প্রথম থেকেই আমরা দেখছি যে, এই প্রশাসনিক কাজে যারা যুক্ত তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে আসত। অতএব কেবলমাত্র পেশার ভিত্তিতে এদের একটি বর্ণের পংক্তিতে ফেলা যায় না। এই মিশ্রিত গোষ্ঠীই 'মধ্যবর্তী' বর্ণগুলিকে কিছুটা মর্যাদা দিতে পেরেছিল যেমন অম্বাস্থাদের কথা ধরা যাক, এরা ছিল সম্ভবত ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নারীর বৈধ মিলনে জাত গোষ্ঠী (III ৭.২১)।

বর্ণ ব্যবস্থার এই জটিলতার কারণে, এই কাঠামোর পরিকল্পনা কিছুটা তাত্ত্বিক বিচারের পর্যায়েই রয়ে গেছে এবং মেগাস্থিনিসের তালিকায় সাতটি বর্ণ হিসাবে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু বর্ণের প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য, স্তরবিন্যস্ত কর্তৃত্ব, অন্তর্বিবাহ এবং নির্দিষ্ট বৃত্তি, এর কোনো কিছুই অবাস্তব নয়; নিম্নবর্ণ এবং পতিত মানুষদের ক্ষেত্রে এর নিপীড়নের চেহারা ছিল চরম। অর্থশাস্ত্রে এবং সাধারণভাবে ধর্মশাস্ত্রের রচনাতেও, আইনের চোখে প্রত্যেকের সমতার কোনো চিহ্নই নেই। অসামরিক অপরাধের শাস্তিও অপরাধীদের বর্ণ অনুসারে বিভিন্ন হতো। একেবারে নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল যে, উচ্চবর্ণের অপরাধীদের শাস্তির মাত্রা কম হবে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শূদ্রের অপরাধে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। তদুপরি, মর্যাদার প্রশ্নটিও যেহেতু বর্ণের ভিত্তিতে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই জন্মসূত্রে যারা নিম্ন মর্যাদায় আবদ্ধ, তাদের কোনো শাস্তি না দিয়েও আর্থিক বাধ্যতা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাভাবে বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া যেতো। এইভাবে চণ্ডাল এবং অন্যান্যদের শূদ্র-কৃষক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা চিরকালের জন্য বাতিল করে তাদের শুধুমাত্র ক্ষেত-মজুরি এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজের জন্য মজুত রাখা হলো। অনুরূপে, পেশা এইভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবার অর্থ, শ্রমের যে মজুরি বা মূল্য দেওয়া হোক না কেন সেটাই গ্রহণ করতে নিম্নবর্ণের শ্রমিকেরা বাধ্য হলো কেননা অন্য কোনো কাজ তারা করতেই পারবে না। আর উৎপাদনের শ্রম আর পরিষেবা যখন এভাবে সস্তা হয়ে গেল, তখন এইসব বর্ণ-বিধিনিষেধের প্রধান সুবিধা অবশ্যই শাসক শ্রেণী এবং সমাজে উচ্চপদে আসীন গোষ্ঠীই ভোগ করবে এ তো বলাই বাহুল্য। আর

তারা যে কেবল ব্রাহ্মণ হবে তা নয়। যদিও সুবিধার প্রধান দাবিদার মূলত ব্রাহ্মণেরাই।

বর্ণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সামাজিক জঙ্গমতার এই অভাব আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় মাজঝিমা নিকায়া ৯৩-এর বয়ানে। মৌর্য যুগেই এটি রচিত, তবে কথাগুলি গৌতম বুদ্ধের মুখে বসানো হয়েছে। একজন ব্রাহ্মণ শ্রোতাকে বুদ্ধ বলছেন যে, ''ইওনা-কম্বোজ (মৌর্য সাম্রাজ্যের গ্রিক-ইরান সীমান্ত প্রদেশ) এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (জনপদ) কেবল দুটি মাত্র বর্ণ (বন্ন) আছে : প্রভু (আইয়া) এবং দাস (দাস)। প্রভু যিনি, তিনিও কখনো কখনো দাস হতে পারেন আর দাসও হতে পারে প্রভু।'' এখানে ইওনা, ইত্যাদিদের সমাজ যে দুটি বর্ণে বিভক্ত, এ কথাটি বিশেষ কিছু নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো সেখানে মর্যাদার পরিবর্তন সম্ভব। কেননা মুক্ত মানুষ হয়ে যাচ্ছে দাস আবার দাসও মুক্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষে যেখানে একজনের বর্ণ তার সারা জীবনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তারই বিপরীত দৃষ্টান্তে এই অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে।

বুদ্ধের এই কথার আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে। এই বিবৃতি এভাবেও পড়া যায় যে, ইওনা বা হেলিনীয় সমাজ যেভাবে প্রভু ও দাসে বিভাজিত, সে বিচারে ভারতবর্ষে এই নির্দিষ্ট বর্ণ-বিভাজিত সমাজের অবস্থান একেবারে স্বতন্ত্র এবং গ্রিক সমাজের মতো এখানে দাসত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বস্তুত মেগাস্থিনিস আমাদের একেবারে নিশ্চিত করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষে দাসত্ব নেই (দিয়োদোরাস, II.৩৯; স্ট্রাবো, XV ১.৪৩; আরিয়ান, ইন্ডিকা X)। আরিয়ান সম্ভবত তার নিজস্ব বিচারে আরো একটু যোগ করলেন। তিনি বললেন যে, ভারতীয়রা যাকে দৈমিনিদীয়দের মতো (স্পার্টার মানুষজন)— যাদের কোনো দাস নেই, অথচ জমির কাজে বাঁধা ভূমিদাস বা কৃষক রয়েছে; অবশ্য ভারতবর্ষে সেরকম ভূমিদাসও নেই। যাই হোক এ বিবৃতি স্পষ্টতই ভুল। মেগাস্থিনিসের এই নিশ্চয়তার একটিমাত্র যুক্তিসংগত কারণ হতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রে (III. ১৩.৪) ''কোনো আর্যকেই দাসে (দাসভব) পরিণত করা চলবে না'' এই মর্মে উচ্চারিত আইনী অনুজ্ঞাটি তিনি শুনেছিলেন। পূর্ববর্তী ধারাটিতে আর্য শব্দার্থে শুধুমাত্র 'দ্বিজ' বর্ণ নয়, শূদ্রদেরও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি আমরা যদি বিশ্বাস করে নিই যে, এই বৈধ নীতি সামাজিক আচার অভ্যাসেও অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হতো তবুও চণ্ডাল, অরণ্যবাসী ইত্যাদিদের মতো আরো যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ এই চতুর্বর্ণের বাইরেই ছিল, এ ঘটনা আমরা আগেই দেখেছি। আর এই বাইরে পড়ে-থাকা মানুষদের মধ্য থেকেই দাসের পর্যাপ্ত যোগান সমাজে সর্বদাই মজুত ছিল। অশোকের অনুশাসনে (প্রস্তর অনুশাসন, IX, XI, XIII; স্তম্ভ অনুশাসন VII) ভৃত্যদের (ভাটক) সঙ্গে পৃথকভাবে দাসের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করা উচিত। বৌদ্ধ পালি সাহিত্য, যাদের মধ্যে কিছু নিঃসন্দেহে মৌর্যযুগে রচিত, সেখানে

মনিব এবং মনিবানীদের হাতে গৃহস্থালীর দাস, বিশেষত দাসীরা, যে কিভাবে নির্যাতিত হতো সে কথা আমাদের বলা হয়েছে। অতএব আর্যশাস্ত্রের ওই উপধারায় দাস এবং শ্রমিকদের যে নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে (III. ১৩) সেটি সম্পূর্ণত সেইসব 'আর্য' নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত যারা কোনো বিশেষ অবস্থার কারণে কিছু সময়ের জন্য স্ত্রী-পুত্রসহ কোনো এক প্রভুর অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে— এ বিষযটি পরিষ্কার বুঝে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ধারাগুলিকে (III ১৩.৫-১৯) বাদ দিলে, আমরা দেখব যে একজন দাসকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়, তাকে বিক্রয় করা বা দাস করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রভুর আছে, এমনকি প্রভুর গৃহে সে দাস হয়েই জন্মগ্রহণ করে। অতএব প্রভুর ইচ্ছানুসারে দাস ও দাসী উভয়কেই বিক্রয় করা যায় যদি তিনি বৈধ উপায়ে তাদের মালিক হয়ে থাকেন (III ১৩.২০, ২৫)। অবশ্য দাসেরও যে কিছু নিজস্ব অধিকারের সামগ্রী থাকতো, যেগুলি তার আত্মীয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেত, একথা সত্যি (III ১৩.২২)। এছাড়া তাদের অন্য কোনো অধিকারের উল্লেখ নেই, এমনকি জীবন-জীবিকা অথবা শারীরিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার কোনো সঠিক প্রস্তাবনা নেই। দাসী যে তার মালিক বা প্রভুর ভোগ্য ছিল সেকথা বলবার অপেক্ষা রাখে না (III ১৩.২৩)। মালিকের ঔরসে সন্তানের জন্ম দিতে পারলেই একমাত্র সে মুক্তি অর্জন করতে পারতো। যোগিমারা গুহার (রামগড় পর্বত) মৌর্যযুগের গুহা শিলালিপিতে, বারানসি (বারানসি) থেকে আগত এক ব্যক্তি একজন দেবদাসীর প্রতি তার ভালবাসার কথা বলেছেন। অতএব বেশ দৃঢ়চিত্তে অনুমান করা যায় যে, পরবর্তীকালের মতো, সেই সময়কালেও দেবদাসীদের বারাঙ্গনা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। অর্থশাস্ত্রেও (II ২৩.২) দেবদাসীদের উল্লেখ আছে। এই পেশার ক্ষেত্রে তারা যখন বৃদ্ধা হয়ে যেত, তখন সুতো কেটে জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো। অতএব দাসেদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হতো তাকে কোনোভাবেই মানবিক বলা চলে না। অবশ্য পরিস্থিতি হয়ত এর থেকেও খারাপ হতে পারতো এমনও ভাবতে পারি আমরা। এই দাসশ্রেণীর মানুষেরা, তারা যদিও অস্পৃশ্য পতিত নয়, তবুও সংজ্ঞার বিচারে তারাও আর্য নয় কিংবা কোনো বর্ণের আওতাভুক্ত নয়, অথচ তাদের কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি।

মৌর্য যুগে নারীর অবস্থানের একটি চিত্রও উপস্থাপিত করা যায় না। দুটি গোষ্ঠীতে পুরুষের পাশাপাশি নানান পেশাগত কাজে এদের সমপর্যায়ী অংশগ্রহণ এমন ব্যাপক ছিল যে, এইসব নারীদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিধিনিষেধ যে লাগু করা যাবে না, এ বিষয়টি অর্থশাস্ত্রও (III ৪.২২) অনুমোদন করেছে। এদের প্রথমটি হলো ''নৃত্যশিল্পী এবং যাযাবর চারণ''-এর দল যেখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই একত্রে তাদের শিল্পকলা প্রদর্শন করতো এবং সর্বত্র ঘুরে বেড়াতো। দ্বিতীয়টি 'জেলে, পক্ষিশিকারী, গোপালক, শুঁড়ি এবং অন্যান্যরা' যাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজগুলিই নারীরা করত।

স্বীকৃত বর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে অবশ্য গমনাগমনের বিধিনিষেধ ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং নিষেধ ভঙ্গে জরিমানা-দণ্ডেরও প্রচলন ছিল (III ৪.১-২৩)। সম্মানের কারণেই অবশ্য নারীদের গৃহবন্দী করার প্রয়োজন হতো (অনিষ্কাসিনি) (II ২৩.১১); III. ১.৭)। অবশ্য দরিদ্র যেসব নারীরা সুতা কাটতো, তাদের সুতো সংগ্রহ করতে, সুতলির গাঁট দিতে এবং মজুরি সংগ্রহ করতে বাইরে বেরোতেই হতো। তাদের সম্পর্কে অবশ্যই কোনো বিচার বিবেচনার বালাই ছিল না। তারা যদি কোনো কারণে আর কাজ করতে না চাইত, তাহলে তাদের তর্জমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নষ্ট করে দেবার অধিকারও ছিল (II ২৩.১৪-১৫)।

নারী কেবলমাত্র দু-ধরনের সম্পত্তি (স্ত্রীধন) দাবী করতে পারতো : জীবিকার উপায় (বৃত্তি) এবং অলংকার (অর্থশাস্ত্র, III ২.১৪)। পুত্রসন্তান বর্তমান থাকলে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তিতে (III ৫.১-২, ৯-১১) এমনকি মাতার রেখা-যাওয়া স্ত্রীধনেও কন্যাদের কোনো অধিকার ছিল না (III ২.৩৬)। পুরুষ আধিপত্যের অধ্যাদেশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই অনুশাসন-বাক্যে যে, 'পুত্রার্থে স্ত্রীগণের প্রয়োজন' (III ২.৪২)। মোরাতে (মথুরা) পাওয়া অন্তিম-মৌর্য ইঁটে উৎকীর্ণ লিপিতে একজন প্রধানের (রাজ ভারা) স্ত্রী-র উল্লেখে বলা হচ্ছে যে, তার সবচেয়ে বড় গৌরব হলো তার সমস্ত পুত্রেরা জীবিত (জিতপুত্র)।

অর্থশাস্ত্রে বিবাহ একটি চুক্তিবদ্ধ লেনদেন যেখানে কন্যার পিতা পাণি-প্রার্থীদের নিকটে বরপণ (শুল্ক) পেতেন আর কন্যা পেতো স্ত্রী ধন (পত্নীর সম্পদ) (III ২.১০-১১, ১৫.১৪-১৫)। তক্ষশিলায় আলেকজান্ডারের সময়কালে প্রচলিত রীতির কথা আমাদের মনে পড়ে, যেখান দরিদ্র মানুষেরা তাদের কন্যাসন্তানকে 'কনে' হিসাবে বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসছে (স্ট্রাবো, XV. ১৬.২)। অবশ্য বরের অর্থপ্রাপ্তির কথাও অর্থশাস্ত্রে বিবৃত আছে (III ৩.১৭-১৮)। কন্যা বিক্রয়ের এই রীতি স্বামী মারা যাবার পরেও অব্যাহত থাকত এবং নারী পুনর্বিবাহ করতো। পুনর্বিবাহকালে তাকে শ্বশুরের অনুমতি অবশ্যই নিতে হতো, নতুবা পূর্ব বিবাহে প্রাপ্ত সমস্ত ধনসম্পদ তাকে প্রত্যার্পণ করতে হতো (III ২.১৯-৩০)। কেবলমাত্র বিধবার ক্ষেত্রেই নয়, কোনো স্ত্রী যদি স্বামী-পরিত্যক্তা হতো কিংবা তার স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো সেক্ষেত্রেও পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হতো। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে মৃত স্বামীর ভাই অথবা নিকট-আত্মীয়কে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (III ৪.৩৭-৪২)। এমনকি যেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং এছাড়া অন্য কোনো পরিস্থিতিতেও, যদি উভয়েই বিবাহে প্রাপ্ত অর্থ বা সামগ্রী প্রত্যর্পণ করে, তবে বিচ্ছেদও সম্ভবপর এমন মন্তব্যও অর্থশাস্ত্রে আছে (III ৩.১৫-১৯)। অন্যদিকে আবার, বহুবিবাহও অনুমোদিত, বিশেষত যেখানে পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা হচ্ছে (III ২.৩৮-৪১)। রানীর অনুশাসনে, অশোকের দ্বিতীয় স্ত্রীর নামের পূর্বে

াশেষভাবে যে তাঁর গর্ভজাত পুত্রের নাম লেখা হয়েছে, সম্ভবত এই রীতিই তার াংশিক কারণ। স্ত্রীর বয়স মাত্র বারো বছর হলেই যৌন মিলনের প্রত্যাশা করা হতো অর্থশাস্ত্র III ৩.১-২)। অতএব এর ফলে যে নারী স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অবনতি টিতো তা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়।

১.৩ ধর্ম

অশোক তাঁর অনুশাসনের সর্বত্র ধর্মীয় শ্রেণীকে ব্রাহ্মণ এবং সমন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ১.৪) তিনি এর অর্থ স্পষ্ট করেছেন : তিনি বলছেন, ইওনোদের অঞ্চল ছাড়া কোথাও এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে ব্রাহ্মণ এবং সমনের দেখা মেলে না; এবং কোনো দেশে, কোনো অবস্থাতেই, এমন কোনো স্থান নেই যেখানে মানুষ একটি পস্‌ম্‌দা বা অন্য কিছুতে যুক্ত নয়। এখানে, তাঁর সপ্তম এবং দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনে পস্‌ম্‌দা যদি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা আধিপত্য শব্দার্থে গণ্য করা হয়, তবেই তাঁর উপরোক্ত উচ্চারণের সঙ্গে সেটি প্রাসঙ্গিক হয়। সপ্তম অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ [২.৭]), ওই একই শব্দ বৌদ্ধ সঙ্ঘ, ব্রাহ্মণ, অজীবিক এবং জৈন সকলকেই এর ব্যঞ্জনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত, উভয় স্থানেই শব্দটি যে, ভাবার্থ বহন করে, সাধারণভাবে ব্যবহৃত নিরপেক্ষ অর্থটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সংস্কৃতে, দুর্বোধ্য শব্দতত্ত্বে, পস্‌ম্‌দা শব্দে অর্থ হলো, মিথ্যা মতবাদ বা তারই অনুসরণকারী অর্থাৎ শেষাবধি বৌদ্ধ বা জৈন; ধার্মিক ভণ্ড-ও (হিন্দুস্তানী, পাখণ্ড) আছে এ দলে। বৈদিক সাহিত্যে শব্দটি কখনো আসেনি, কিন্তু অর্থশাস্ত্রে এটি যত্রতত্র উপস্থিত (I ১৮.১২; II ৪.২৩)। অর্থের প্রয়োজনে কোনো রাজপুত্র পস্‌ম্‌দা-সঙ্ঘকে লুণ্ঠন করতে পারে (I ১৮.৯)। সঙ্ঘ শব্দটি বৌদ্ধ এবং জৈন্যরা তাদের ধর্মীয় নিয়ম অর্থে ব্যবহার করেছিল। অন্য একটি স্থানে (III ২০.১৬), অন্যান্য অনির্দিষ্ট যাযাবর ভিক্ষুক সহ বৌদ্ধ (শাক্য) এবং অজীবিকেরা (একইভাবে উচ্চারিত) কোনো আচার-উৎসবে খাদ্যদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধদের পালি সাহিত্যে আবার, পস্‌ম্‌দা ওই একই ভাবার্থে অর্থাৎ নিন্দিত অর্থে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। অশোক সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় বোঝাতে যে ওই শব্দটির আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সহজ কারণ হলো, ভাবনা প্রকাশের জন্য আর কোনো উপযুক্ত শব্দ তিনি পাননি। অশোক তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে প্রধানত উপস্থিত ধর্মসমূহের সহাবস্থানের বিষয়ে যখন বলতে চান, সেটি এমন এক নবতর অভিব্যক্তি যে তা প্রকাশের জন্য প্রচলিত ভাষা রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সংঘটিত ধর্মীয় বিপ্লবের ফলাফল যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একচেটিয়া আধিপত্যকে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিল। কিন্তু ফলাফলকে স্বীকৃতি দানের সমস্ত ধর্মীয়

সম্প্রদায়কে পস্‌ম্‌দা্‌ শব্দের ব্যঞ্জনায় যুক্ত করা অন্তত তাদের একই সমতলে স্থাপন— এসব অশোকেরই অতুলনীয় কৃতি।

সম্মুখসমরে আহুত হওয়া সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব তখনও সর্বাধিক বিস্তৃত মনে হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিবর্তন এবং বিরোধী ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভাবধারা ও রীতি-নীতির মধ্যেও তখন যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল সেটা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। একটা পরিবর্তন নিঃসন্দেহে হয়েছিল— বৈদিক প্রথার অবনমন। বিশেষত বলিদান প্রথাটি 'ব্রাহ্মণ'-এ যে মর্যাদায় ছিল, এখন তার অবস্থা ঠিক তেমন নয়। অর্থশাস্ত্র (I ৯.৯) রাজাকে বলছে যে, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হবেন একজন পুরোহিত। সেই পুরোহিত অথবা ব্রাহ্মণ পূজারীকে কেবলমাত্র বৈদিক আচারে দক্ষ হলেই চলবে না, অথর্ববেদের জাদুমন্ত্র তিনি জানবেন, অশুভ পূর্ব লক্ষণ নির্ধারণের ক্ষমতাও তাঁর থাকবে। সেই পুরোহিতকে বলিদানের যোগ্য নয় এমন ব্যক্তির (সম্ভবত নিম্নবর্ণের) জন্য উৎসর্গ-কর্মে (যাচনা) নিয়োজিত করাই সর্বাপেক্ষা অধার্মিক কাজ। এই উৎসর্গ-অনুষ্ঠানের আর্থিক মূল্যও অত্যন্ত সাবধানে নির্ধারণ করা হতো (III ১৪.২৮-৩৬)। বৈদিক দেবমূর্তি যেমন, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি এবং অন্যান্যদেরও উল্লেখ আছে (I ১৫.৫৫-৫৭; IV ১৩-৪৩; XIV ১.৩৮; ইত্যাদি)। কিন্তু অশোক তাঁর প্রথম প্রস্তর অনুশাসনে, উৎসর্গের (পোজোহিতবো) জন্যও প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত সমস্ত সমাবেশের বিরুদ্ধেও (সমাজ) নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। অর্থাৎ অনুশাসনের সময়কাল অবধি (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ c.) পশু বলি অব্যাহত ছিল। কেবল এইমাত্র নয়, অনুশাসনের এই আদেশ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই প্রথার সপক্ষে সাধারণ মানুষের সমর্থন নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, নতুবা একে নিষিদ্ধ করা যেত না। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য বিবেকেও এই অহিংসা হলো কর্তব্যের একটি অঙ্গ। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যেই, মনুস্মৃতির মতো গোঁড়া রচনাতেও এই মতবাদ এমনভাবে গৃহীত হয়েছিল যে, সেখানে উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে কৃষিকাজ একটি হীন পেশা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা ক্ষেতে লাঙল দেবার সময় এর লৌহফলকে পৃথিবীকে আঘাত করতে হয়, অনেক মৃত্তিকার প্রাণী এতে নিহত হয়।

অর্থশাস্ত্র, একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতিতে (I ২.১০) সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত ভাবনাকেও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছে (অনভিক্ষিকি)। যোগ বা সাংখ্য ভাবধারার টিকে-থাকা কোনো রচনাই মৌর্য সময়কালের নয়। আর লোকায়ত ভাবনার কোনো পুঁথিই কালাবর্তনে টিকে থাকতে পারে নি। কিন্তু বৈদিক যুগে ২.৫ আমরা দেখেছি যে প্রাচীন উপনিষদে উপস্থাপিত আত্মা এবং পুনর্জন্মের তত্ত্বটি সাংখ্যে পাওয়া যায়। আর এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সম্ভবত মৌর্য সময়কালে ব্যাপক স্তরে একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত মতবাদ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। একটি দার্শনিক ব্যবস্থা হিসাবে যোগ

সাংখ্য থেকেই উদ্ভুত এবং এই তত্ত্বেই যুক্ত। এছাড়া শরীর-মনের নিয়ন্ত্রণের ওপর এখানে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেকারণে এরই পরবর্তীকালে সাংখ্যের মতো হয়ত যোগেরও পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। যোগসূত্র-এর রচয়িতা এবং খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা পতঞ্জলিকে আমরা বৈয়াকরণ পতঞ্জলির (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে না এবং সেজন্য তাঁর সময়কালও অনির্ণীত। বলা হয়েছে, এ হলো অসুরদের (দৈত্য) মতবাদ যেখানে কেবল পার্থিব আনন্দের প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করে বেদের সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। মৈত্রী উপনিষদের একটি অনুচ্ছেদ যেটি অনেক পরবর্তীকালে রচিত হলেও সম্ভবত উত্তর-মৌর্য সময়কালের রচনা নয়, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মতবাদের শিক্ষা বৃহস্পতির কাছে। যাই হোক, এই লোকায়তকে অর্থশাস্ত্র এত গুরুত্ব দিল এবং তাকে ব্রাহ্মণ্য দর্শনের একটা অংশ হিসাবে গ্রহণ করে নিল, এটা সত্যিই বড়ো অদ্ভুত ঘটনা।

হয়ত মৌর্য যুগ ভক্তির সেই প্রাচীন আভাস কিংবা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনায় একান্ত নিবেদন সবই প্রত্যক্ষ করেছিল। সাঁচীর সন্নিকটে বেশনগরে (বিদিশা) হেলিওডোরাসের স্তম্ভে এর প্রথম নির্দিষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেখানকার খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ অব্দের (c) একটি শিলালিপিতে 'মহান ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যে গরুড়-পতাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে আর দাতা নিজেকে একজন 'ভাগবত' ভক্ত বলেছেন। এই তারিখটিকে শেষপ্রান্ত হিসাবে নির্দিষ্ট করে আরও প্রাচীন সাক্ষ্যের সন্ধান করা যায়। সম্মান প্রাপক হিসাবে একস্থানে বাসুদেব এবং অর্জুনের উল্লেখ পাওয়া গেছে পাণিনিতে (IV ৩.৯৮), খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের (c) রচনায়। অর্থশাস্ত্রে (XIV ৩.৪৪) কৃষ্ণ নামটি এসেছে কিন্তু আরো অনেক বিদেহীর সঙ্গে একটি জাদুমন্ত্রে তা হারিয়ে গেছে। অবশ্য সঙ্কর্ষণের (কৃষ্ণের অন্য নাম) পূজারির উল্লেখ আছে (দেবাত্যিয়া)। আরিয়ান উদ্ধৃত (ইন্ডিকা, VIII) মেগাস্থিনিসের বিবরণে বাসুদেবের জনপ্রিয়তার দৃঢ় আভাস আছে। তিনি একজন ভারতীয় দেবতার কথা বলেছেন, যার সঙ্গে তিনি হেরাকলস-এর তুলনা করেছেন। আরো বলেছেন যে, সৌরসেন (সুরসেনা), যাদের মূল নগর হলো মেথোরা (মথুরা) ও ক্লেইসোবোরা (?), সেখানে এই দেবমূর্তি অত্যন্ত সম্মানীয়। 'পানডাইয়া' নামে হেরাকল্স-এর এক কন্যা এসে পড়ায় কৃষ্ণের পরিবার আর পাণ্ডব এবং শেষোক্ত ও দক্ষিণ ভারতের পাণ্ডিয়া—এদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে একটি দ্বিবিধ সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তবে সন্দেহের মাত্রা যাই হোক না কেন, বাসুদেব-কৃষ্ণ ভক্তির প্রবল দাপটের কেন্দ্র হিসাবে মথুরা একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীনকাল থেকেই শিবের উপাসনা অব্যাহত ছিল। আরো নয়টি দেবতার মধ্যে শিবের অবস্থান। একটি শহরে এই মূর্তির পবিত্র মন্দির নির্মাণের কথা ছিল (অর্থশাস্ত্র, II ৪.১৭)। পতঞ্জলি অভিযোগ করেছেন (V ৩.৯৯) যে, মৌর্যরা শিব, স্কন্দ এবং

বিশাখের স্বর্ণমূর্তি অপহরণ করেছিল। শিবমূর্তির লিঙ্গরূপের বিষয়ে তেমন কোনো সাক্ষ্য মেলে না। কেবলমাত্র উজ্জয়ন থেকে পাওয়া লিঙ্গচিহ্ন সমৃদ্ধ কয়েকটি উৎকীর্ণ-লিপিহীন মুদ্রা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের সময়কালের হতে পারে।

আলেকজান্ডারের ঐতিহাসিকগণ যে উত্তর-পশ্চিমে মন্দিরের উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন, সেটি আমরা লক্ষ্য করেছি, (১.১ অধ্যায়)। অর্থশাস্ত্র (I ১৮.৯) একজন অভাবী রাজপুত্রকে জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে মন্দিরের অন্যান্য সব সম্পদ অপহরণ করার পরামর্শ দিয়েছিল। এর মধ্যে মন্দিরের গবাদি পশু (দেবপশু) (IV ১৩.২০) এবং মন্দিরের ক্রীতদাসীদের (দেবদাসী) (II ২৩.২) কথাও বলা হয়েছে। মন্দিরকে দেবগৃহ (II ৩৬.২৮) এবং এরকম অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করা হতো। মার্শাল বীর স্তূপে (তক্ষশিলা) একটি স্তম্ভসমৃদ্ধ বিশাল দরবার কক্ষ আবিষ্কার করেছিলেন। সম্ভবত এটি কোনো মন্দিরের কাঠামো। কেননা ভবনের আবর্জনা স্তূপে এবং নিকটস্থ অঞ্চলে অসংখ্য পরস্পর যুক্তপাণি দেব-দেবীর অসংখ্য যুগল মূর্তি টেরাকোটার ভাস্কর্যে পাওয়া গেছে। হেলিওডোরাসের স্তম্ভের নিকটে বেশনগরের খননকার্যে একটি মন্দিরের গম্বুজাকৃতি নকশা উন্মোচিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই স্তম্ভ নির্মাণের (খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ অব্দ c) পূর্বের কোনো সময়কালে মন্দিরটি নির্মিত। অতএব এটি সম্ভবত একটি মৌর্যযুগের মন্দির।

এই মন্দিরে যদি কোনো দেবমূর্তি থাকতো, তবে সেটি নিশ্চয়ই কাঠের হতো। কেননা এখনো পর্যন্ত কোনো পাথরের দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়নি। আর মূর্তিগুলি কাঠের হওয়ার কারণে এত দীর্ঘ সময় যাবৎ যেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। অর্থশাস্ত্রে একটি পবিত্র স্থানে (চৈত্য) দেবমূর্তি (দৈবতা প্রতিমা) আগুনে পুড়ে-যাবার উল্লেখ থাকায় কাষ্ঠমূর্তির সম্ভাবনা আরো প্রবল হয়।

অনেক প্রত্ন-স্থান যেমন, তক্ষশিলা, অহিছত্র, সোংখ, কৌশাম্বী, রাজঘাট (বারানসী) বক্সার এবং পাটনার মৌর্য স্তরে টেরাকোটার বা পোড়ামাটির অনেক নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। সাধারণত এগুলিকে 'মাতৃদেবী' নামে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র ৩.৬)। সম্ভবত বাড়িতে এবং কুঁড়েঘরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হতো। সম্ভবত নারীর প্রাত্যহিক জীবনে এই রীতির একটি নিজস্ব স্থান ছিল : অশোক তাঁর দশম প্রস্তর অনুশাসনে অনুযোগ করেছেন যে "নারীরা বিবিধ, স্থূল এবং অর্থহীন আচার (মঙ্গল)" পালন করে। এই মূর্তিগুলি সম্ভবত সেই জাতীয় উপদেবী। অর্থশাস্ত্রে (XIV ৩.৩৬) জাদুমন্ত্র আহ্বানের জন্য এদের নামকরণও করা হয়েছে : অমিলা, কিমিলা, বায়ুচারা, প্রয়োগ, ফাক্কা, বায়ুহভ, বিহালা এবং দন্তাকাতক। কোনো ব্রাহ্মণ্য রচনায় এই নামগুলি পাওয়া যায় না। কিন্তু এর পরে, পরবর্তীকালের দেবমূর্তির মধ্যে এই নারীমূর্তির কোনো চিহ্নই আমরা খুঁজে পাই না।

পুরুষরাও এইসব প্রথার কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিল। অশোক তাঁর নবম প্রস্তর

মনুশাসনে, অসুস্থতার নময়কালে, পুত্র বা কন্যার বিবাহে, শিশুর জন্মকালে অথবা কোনো দূরযাত্রার প্রাক্কালে তারা যে কতরকমের আচার (মঙ্গল) পালন করে তার উল্লেখ করেছেন। কোনো অশুভ শক্তি বা যাদুমন্ত্রের ভীতি এবং তাদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা, আচারের এই আসক্তিতে এসব কথাই লুকোনো আছে। রাক্ষস বা দৈত্যের সম্ভাব্য উপস্থিতি (অর্থশাস্ত্র, XIII ২.২৯-৩২) কল্পনায় সত্যিই ভয়ংকর ভীতির সঞ্চার হতো মনে হয়। অর্থশাস্ত্রের জাদুমন্ত্রের সাহায্যে অথবা ভোজবাজির মাধ্যমে, বৃক্ষ-উপাসনা করে এইসব অশুভ শক্তিকে সেই স্থান থেকে দূর করার প্রয়োজন হতো (IV ৩.৪০-৪১)। অর্থশাস্ত্রেও (IV ৪.১৪-১৫, V ২.৫৯-৬৩) প্রতিভাত হয় যে, কোনো আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য মানুষকে অদ্ভুত অথবা রহস্যময় সব আচার পালন করতে বাধ্য করে কীভাবে তাদের বিশ্বাস লুণ্ঠন করা হতো এবং সে কাজে এ জাতীয় সমস্ত জাদুমন্ত্রের সন্ধান করা হতো। এমনকি রাজাকেও উপদেশ দেওয়া হতো যে, তাঁর প্রশাসনে যেন, ভবিষ্যৎ-কথক, দৈবজ্ঞ এবং জ্যোতিষী থাকেন। মেগাস্থিনিসের বিবৃতি আমরা স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি বলছেন, মানুষজন প্রত্যাশা করতো যে প্রতি বছরের শুরুতেই তাদের 'দার্শনিকরা' এ বছরের কোনো দুর্ভাগ্য ঘটবে কিনা সে কথাটি পূর্বাহ্ণেই বলে দেবেন।

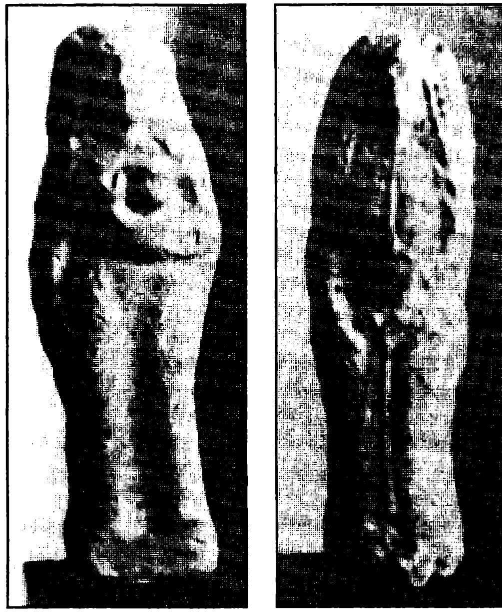

চিত্র ৩.৬ : 'মাতৃদেবীগণ' পোড়ামাটির মূর্তি, বীর স্তূপ, দ্বিতীয় স্তর, তক্ষশিলা (অনুকৃতি J. Marshall)

আমরা যদি দানের নথিপত্র এবং স্মৃতিস্তম্ভ যেগুলি এখনো টিকে আছে তাদের দিকে এক নজর দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো যে, অশোকের অনুশাসনে পরবর্তী আরো পাঁচশ বছরের এক যাত্রা শুরু হয়েছে, যে সময়কালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই সমস্ত চিরায়ত বৌদ্ধ রচনা অশোককে মনে

রেখেছে। তাঁর অনুশাসনে বৌদ্ধধর্মের বিশ্বাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাদি আমরা পাই এবং নিশ্চিত হতে পারি যে পালি ধর্মগ্রন্থে যেমনটি লেখা আছে ঠিক সেভাবেই ধর্মটি ইতিমধ্যেই উপস্থিত (পালি ধর্মগ্রন্থের জন্য পরের ৩.৪ দ্রষ্টব্য)। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ (বৈরাট প্রস্তর অনুশাসন)-এ প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিশ্বাসের সূত্রই তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন। সরাসরি চারটি মহান সত্যের কথা না উল্লেখ করে তিনি ন্যায় বা অসাধারণ অর্থে 'মাঝম' (মধ্য) শব্দটি ব্যবহার করেছেন (পৃথক প্রস্তর অনুশাসন, ১ম)। নিশ্চয়ই সেই চারটি সত্যে 'মধ্যম' অষ্টমার্গের সম্বন্ধে এই শব্দটি যে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটি তাঁর স্মরণে ছিল। প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসন, বৈরাট প্রস্তর অনুশাসন, সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসন এবং ধর্মীয়-উপদল সংক্রান্ত অনুশাসনে, সঙ্ঘ অর্থাৎ বৌদ্ধ আশ্রমিক শৃঙ্খলার উল্লেখ রয়েছে। শেষ অনুশাসনেও বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসী (ভিক্ষু) সন্ন্যাসীগণ (ভিক্ষুণী) তাদের চিরায়ত উপাধিতে (ভিখারি) উল্লিখিত।

সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত সন্ন্যাসীদের জন্য পরিচ্ছদের রং (হলুদ থেকে) সাদা হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। থেরাভাডা পরম্পরার সঙ্গে এই প্রস্তাবনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে যেমন মঠ বহির্ভূত সাধুদের (ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী নয়) জন্য উপাসক শব্দটিও প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসন এবং ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসনে (সারনাথ) ব্যবহৃত হয়েছে। রুম্মিনদেই অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ৩.৩) বৌদ্ধ পরম্পরা থেকে বুদ্ধের জন্মস্থান হিসাবে আমরা যে নামটির সঙ্গে পরিচিত সেই লুম্বিনী নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। সপ্তম প্রস্তর অনুশাসনে, অশোক সম্বোধির উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন পালি রচনায় বুদ্ধগয়াতে অবস্থিত পবিত্র বোধিবৃক্ষের এটিই নাম। একটি থুবা (স্তূপ) (পুতাস্থি কক্ষ) নির্মাণ করাই যে প্রতিষ্ঠিত রীতি, নিগালি সাগর স্তম্ভ অনুশাসনে কেবল একথাই বলা হয়নি, এরই সঙ্গে আমাদের নিশ্চিন্ত করে যে, কোনাকামানা যেটি যুদ্ধের জন্মান্তরের নাম, তাঁর সম্পর্কিত এই পুরাকাহিনী ইতিমধ্যেই অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে। এমনকি বৈরাট অনুশাসনটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কেননা এতে প্রতিভাত হয় যে, বুদ্ধের বাদ বিসংবাদের একটি সংকলন প্রচলিত ছিল আর সেই সংকলন থেকেই অশোক শিরোনামসহ সাতটি রচনা নির্বাচন করেছিলেন। এর থেকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পালি ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক আজ যে রূপে আমাদের কাছে পরিচিত তেমন কোনো একটি রূপ সে সময়েও পরিচিত ছিল।

অশোকের ধম্ম এবং বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কটি ২.২ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। একথা সত্য যে অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহীতাদের মধ্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘের গৌরবোজ্জ্বল স্থান চোখে পড়ে। তাই পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃত বিস্তার যে কতটা ছিল সে বিষয়ে অনুশাসনগুলি নীরব। কিন্তু থেরাভাডা এবং মহাযান, উভয় বৌদ্ধ

পরম্পরায় বর্ণিত তাঁর সেই দানের তালিকাটি অসম্ভব দীর্ঘ : দীপবংশ এবং অশোকবন্দনা, উভয় স্থানেই নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবার পর অশোক ৮৪০০০টি বৌদ্ধ পবিত্র স্থান (গ্রন্থদুটিতে ক্রমানুসারে বিহার এবং স্তূপ নামে অভিহিত) নির্মাণ করেছিলেন। এই সংখ্যাটি বাতিল করে দিলেও, একটা বিষয়ে সহমত পোষণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। এর ফল যা হয়েছিল সেটি শ্রীলঙ্কার চিরায়ত গ্রন্থে বেশ খোলাখুলি লেখা আছে : অসংখ্য 'ধর্ম-বিরোধী' আয়ের সহজ পথের সন্ধানে গায়ে হলুদ পোষাক চাপাল আর সঙ্ঘে যোগ দিল সেখানে তারা নিজেদের পুরোনো সব অভ্যাস সঙ্ঘে চালু করল আর বৌদ্ধ আশ্রমিক শৃঙ্খলায় চরম অরাজকতা দেখা দিল। গোলমাল যখন ব্যাপক স্তরে ছড়িয়ে পড়ল, তখন পাটলিপুত্রের ভিক্ষুদের (সাধু) একটি সম্মেলন আহুত হয় যেখানে এইসব 'ধর্ম বিরোধীদের' মতবাদের নিন্দা করা হয় এবং তারা সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হয়। অশোকের ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন, যেটির তিনটি ভাষ্য আছে সারনাথ (সবচেয়ে সভগ্নভূমি) এলাহাবাদ এবং সাঁচী স্তম্ভে, সেখানে এইসব ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যারা সঙ্ঘে বিভাজন সৃষ্টির (ভখতি) কারণ, তাদের একসঙ্গে মঠ থেকে বহিষ্কারের প্রসঙ্গে উদ্বেগ ব্যক্ত হয়েছে। এই ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন সম্ভবত ১ম-৬ষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসনের পরবর্তী সময়কালের, এতএব এরা অশোকের জীবনের শেষ কয়েক বছরে খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩-২৩৪ (c) অব্দে রচিত। এর অর্থ শ্রীলঙ্কার 'মহাবংশ' কালপঞ্জীতে এর যে সময়কাল চিহ্নিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই বহিষ্কারের ঘটনা তারও পরের, অশোকের রাজত্বের একেবারে শেষ পর্যায়ে সংঘটিত।

শ্রীলঙ্কার চিরায়ত রচনায় (মহাবংশ, V ২৬৮-২৮১) আমাদের এ কথাও বলে যে, যে ভিক্ষু সম্মিলন ওইসব ভিন ধর্মের সন্ন্যাসীদের বহিষ্কার করেছিল এবং সেখানে 'বিভাজ্য' (যৌক্তিক) মতবাদকে (থেরাভাডার মত) সঠিক ঘোষণা করেছিল। এরপরে ভিক্ষু মোগ্গালিপুত্ত তিস্যার নেতৃত্বে তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদ পাটলিপুত্রে একত্রিত হয়। এক হাজার ভিক্ষুর নয় মাসের কঠোর পরিশ্রমে ত্রিপিটকের আধারে সঠিক ধম্ম-এর একটি সংকলন তৈরি করা হয় এবং ভ্রান্ত মতবাদকে ধিক্কার জানানো হয়। মহাযানী পরম্পরায় অবশ্য এই পরিষদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু 'ভিন্ন ধর্মের সাধুদের' সঙ্গে মতপার্থক্যের সাধারণ ফলাফল হলো এই পরিষদ। অশোকের ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসনে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই। বর্তমানে ত্রিপিটকের যে রূপ সেটি সম্ভবত ওই পরিষদে সৃষ্ট। কেননা সেখানে ইওনদের শ্রেণী-সমাজ সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য আছে, যেগুলি আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরেই যুক্ত হতে পারে (পূর্বের ৩.২ দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে অশোকের পরেই যদি ত্রিপিটক সংকলিত হয় তবে এতে অশোকের প্রসঙ্গ কিংবা শ্রীলঙ্কা এবং ওইসব গোত্র এবং গোষ্ঠী যারা

মৌর্য যুগে বা তার পরবর্তী সময়কালে মঞ্চে অবতীর্ণ হলো, তাদের কথা কীভাবে যে বাদ পড়ল, তা খুঁজে বার করা কঠিন কাজ। একমাত্র অশোকের সময়কালের প্রাকৃত থেকে এর ভাষা এখন পালির অন্তিম পর্বের সাহিত্যিক ভাষা।

বৌদ্ধ ধর্মকে আন্তর্জাতিক করে তোলার জন্য পরিষদের পরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা অনুসরণ করতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে অথবা তার পূর্বে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ c) ধম্ম-এর বাণী প্রচারের জন্য অশোক দেশের বাইরে অনেক দৌত্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখানে, শ্রীলঙ্কার চিরায়ত সাহিত্যে (দীপবংশ, VIII ১০; মহাবংশ XII ১-৮) অনুসারে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু মোগ্গালিপুত্ত চতুর্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন দেশে সন্ন্যাসী পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এইসব সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ইওনা ভিক্ষুও ছিলেন, তাঁর নাম ধম্মরাখিতা; তাঁকে পাঠানো হয়েছিল পশ্চিম সীমান্ত দেশে (অপরান্তক); মহারাখিতাকে পাঠানো হয়েছিল 'ইওনো' দেশে; মজঝিমাকে হিমভাতা-য় (হিমালয়); সোনা এবং উত্তরা গেলেন (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া); শ্রীলঙ্কায় গেলেন অশোকের পুত্র মহেন্দ্র। সাঁচীর স্তূপের নিকটে একটি কক্ষে পুতাস্থির একটি ক্ষুদ্র কৌটা পাওয়া গিয়েছিল (এখন হারিয়ে গেছে)। এটি আসলে একটি শিলালিপি। কিন্তু অশোকের অক্ষরে রচিত। 'হেমাবন্তা', মাজঝিমা আর 'ধরিতিপুত্ত'-এর শিক্ষক কোষগুপ্তের অক্ষর হিসাবে এই লিপি যেন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করছে। শ্রীলঙ্কার চিরায়ত রচনায়, কোষগুপ্ত, অবশ্য মাজঝিমাকে হিমভাতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব হিমালয়ে দৌত্য পাঠানো একটি ঐতিহাসিক তথ্য। আমরা যেমন দেখেছি (২.৫ অধ্যায়) যে, শিলালিপির সাক্ষ্যেও অশোকের সময়কালে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের প্রথম পদার্পণের বিষয়টি অত্যন্ত দৃঢ়তায় সমর্থিত হয়। কেননা বৌদ্ধ সঙ্ঘকে অশোকের সাহায্যদানের কথা এই দ্বীপের গুহালিপিতে এর পরেই লিপিবদ্ধ হতে শুরু করল।

জৈনধর্মের ক্ষেত্রে, মৌর্য যুগই এর প্রসার এবং বিরোধ, উভয় ঘটনারই সময় হিসাবে প্রমাণিত। সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৭ [গ]) অশোক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিগামথাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; এই অভিধায় বিশেষভাবে (অর্থ বন্ধনহীন, মুক্ত) জৈনদেরই চিহ্নিত করা হয়। জৈনদের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের চিরায়ত কাহিনী অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কালে মগধে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তারই অভিঘাতে ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে অসংখ্য জৈন সন্ন্যাসী সে দেশ পরিত্যাগ করে কর্ণাটকে চলে যান। মাদুরাই-এর সন্নিকটে পাণ্ডিয় দেশে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষার্ধের এবং দ্বিতীয় শতকের তামিল ব্রাহ্মী গুহালিপিতেও দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম প্রবেশের ঘটনা সমর্থিত হয়। কেননা ওই শিলালিপিতে নথিবদ্ধ প্রায় সমস্ত দানই জৈন মঠ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে (পূর্বের ২.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ওই একই পরম্পরায় আমাদের বলা হয় যে, এই অভিবাসনের ফলে উত্তর ভারতের জৈন সাধু সম্প্রদায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাটলিপুত্রে আহুত পরিষদে জৈন সন্ন্যাসীদের প্রধান স্থূলভদ্র, ভগবান মহাবীরের শিক্ষার স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে আপন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই পরিষদের ব্যবস্থাপনায় দ্বাদশ অঙ্গে বিভক্ত জৈন ধর্মগ্রন্থটি সংকলিত হয়। ওই একই সময়কালে জৈন সন্ন্যাসীদের সাদা পরিচ্ছদ পরার রীতি প্রচলিত হলো। কিন্তু দক্ষিণে অভিবাসিত জৈন সন্ন্যাসীগণ উত্তরে প্রত্যাগমণের পর এই নবতর সংকলিত ধর্মগ্রন্থকে মেনে নিতে চাইলেন না এবং কাপড় পরিধান করতে তারা সম্মত হলেন না। এই গোঁড়া ভিন্নমতাবলম্বী সন্ন্যাসীরা দিগম্বর হিসাবে পরিচিত হলো। আর যারা পাটলিপুত্রের ওই সংকলিত ধর্মপুস্তককে স্বীকার করে নিল এবং পোষাক পরার অভ্যাস শুরু করল, তারা শ্বেতাম্বর আখ্যা পেল। এই কাহিনী দিগম্বর শ্রেণীর জৈনরা মোটেই গ্রহণ করে না একথা সত্য, কিন্তু এই কাহিনীর অন্তত কিছু অংশের ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে।

জৈনধর্ম, যেমন পরবর্তী সময়কালেও বিকশিত হয়েছিল এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয় সাহিত্যে আর শিল্পকলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সাক্ষর রেখেছিল, অজীবিক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি হয়নি। খুবই স্বল্পকালের অবস্থিতি এদের। বৌদ্ধ আর জৈনধর্মের সঙ্গেই ইতিহাসে এর আবির্ভাব, কিন্তু এদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই আমরা এদের বিরোধীদের কাছে শুনেছি। কেননা অজীবিকদের কোনো পরম্পরা বা রচনা কালের উদ্বর্তনে টিকে থাকেনি। এদের সম্পর্কে বৌদ্ধ এবং জৈন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এরা নির্জন গুহাবাসী; ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত; কঠোর আত্মসংযমের (নগ্নতা সহ) অভ্যাস এবং সমস্ত জীবে অনাঘাতে বিশ্বাস করত। মৌর্য সময়কালে, নিঃসন্দেহে এই সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উপস্থিতি ছিল। অর্থশাস্ত্রে (III ২০.১৬) এদের আমরা বৌদ্ধদের সঙ্গে একসঙ্গে জোট-বাধা দেখতে পাই। কিন্তু অশোকের অনুশাসন এদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের বলে।

দক্ষিণ বিহারে, গয়ার সন্নিকটে, বারাবার পর্বতের দুটি গুহা অশোক তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ c) অজীবিকদের দান করেন। রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫১ অব্দ c) আবার তৃতীয় একটি গুহা দান করা হয়। তবে শেষবারে দানের বিবরণের শেষ বাক্যে 'অজীবিকেহি' শব্দবন্ধটি উহ্য রয়েছে। রাজত্বের সপ্তবিংশতি বর্ষের খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ অব্দ c) সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে (নিষ্কর্ষ ২.৭ [গ] দ্রষ্টব্য) অশোক অজীবিকদের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করেছেন। শিলালিপির উল্লেখে এরা জৈনদের পূর্বে স্থান পেয়েছে। অশোকের অন্যতম উত্তরাধিকারী দশরথ তাঁর সিংহাসন লাভের বছরে ওই একই পাশ্ববর্তী এলাকায় নাগার্জুনি পাহাড়ের তিনটি গুহা অজীবিকদের উৎসর্গ করেছিলেন। শিল্পকলার দৃষ্টিতে এই তিনটি গুহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী অংশে (৩.৫ দ্রষ্টব্য) এ বিষয়টি আলোচিত

হয়েছে। খননকার্য, পাথর-কাটা এবং পালিশের কাজে যথেষ্ট দক্ষতা এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন; সে সময় সমাজে অজীবিকরা কী রকম মর্যাদা ভোগ করত, এটি তার একটা আভাস।

যাই হোক, কীভাবে এই সম্প্রদায়টি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলল, তারও ইঙ্গিত আছে এই গুহা-অনুশাসনে। পাঁচটির মধ্যে চারটি অনুশাসন যেখানে অজীবিকেহি শব্দবন্ধটি রয়েছে, তাদের উপরিভাগ অংশত বা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। যে বা যারা একাজ করে, তারা অবশ্যই মূল রচনাটি পড়তে এবং বুঝতে পারত। অশোক বা দশরথের সম্পর্কে তাদের মনে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা ছিল, যে কারণে সমগ্র অনুশাসনটি মুছে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে যা ঘটেছিল এই বিবেচনায় তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অজীবিকদের গুহা থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করা হয়েছিল। সম্প্রদায়টি যখন একেবারে ধ্বংসের মুখে তখনই সম্ভবত তাদের ওপর এই আঘাত নেমে এল। কেননা মৌর্য যুগের পর অজীবিকরা ইতিহাস থেকেই অদৃশ্য হয় গেলে। পরবর্তীকালে যখন শব্দটি দেখা গেল তখন যাদের উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহৃত হলো, তাদের সঙ্গে মূল গোষ্ঠীর কোনো যোগ আছে কি না তা বিচার করা হয়নি।

৩.৪ লেখন, ভাষাসমূহ, শিক্ষা সাহিত্য

যে কোনো সমাজেই লেখকের আবির্ভাব একটি নতুন যুগের সূচনা করে। খ্রিস্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দের ওই সিন্ধু বর্ণমালা ব্যাতিরেকে, অশোকের প্রস্তরে উৎকীর্ণ অনুশাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে লেখনের আর কোনো ভৌত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক রচনা এবং ব্রাহ্মণে লেখন সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ মেলে না। লেখনের সর্বাধিক প্রাচীন সাহিত্যিক প্রমাণ হলো পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (III ২.২১)। সেখানে লিপি এবং লিবি (পাণ্ডুলিপি) শব্দদুটি রয়েছে। পাণিনির সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ (c) এমন বিশ্বাস প্রচলিত হলেও, তার সময়কালের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ মেলে না। এ প্রসঙ্গে দাবি করা যায় যে, তিনি যেহেতু পাণ্ডুলিপির এবং সেইসঙ্গে ইয়াভানানি-র (পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করেছেন, অতএব তাঁর সময়কাল আরো একশ বছর পিছিয়ে দেওয়া যায়। বিকল্প বিচারে বলা যায়, আরমীয় পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গেই তিনি লিপি শব্দটি ব্যবহার করেছেন এমনও হতে পারে। কেননা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে তাঁর প্রতিবেশী রাজ্য গান্ধার মানুষজনের কাছে এ লিপি অবশ্যই পরিচিত ছিল। প্রাচীন পালি সাহিত্যে লেখনের যে উদাহরণ আছে তারও বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা এখানে নেই। কেননা নানান কারণে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, এই রচনাগুলি বুদ্ধের অনেক পরে মৌর্যযুগে এবং তার পরবর্তী সময়কালে সংকলিত হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাসে পালি ধর্মগ্রন্থটিই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষদিকে শ্রীলঙ্কায় তার লিখিত রূপটি পেয়েছে। আলেকজান্ডার এবং চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে

ভারতবর্ষে লেখনের উপস্থিতির বিরুদ্ধ সাক্ষ্য রয়েছে গ্রিক রচনাগুলিতে। স্ট্রাবো (XV ১.৬৭) বলছেন, যেকালে "অন্যান্য রচনাকারেরা বলেন যে তারা (ভারতীয়রা) লিখিত অক্ষর ব্যবহার করত না", সেখানে শুধুমাত্র আলেকজান্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ারখুশ তাঁর প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন যে, তাঁরা ঘনবুনটের কাপড়ের ওপর লিখত। পাণিনির মতো নিয়ারখুশের বিবৃতিকেও উত্তর-পশ্চিমে আরমীয় লিপি ব্যবহারের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। অন্যত্র স্ট্রাবো (XV ১.৫৩) এই মর্মে মেগাস্থিনিস থেকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন যে, ভারতীয়রা শুধুমাত্র অলিখিত আইন ব্যবহার করত কেননা তারা লিখতে জানতই না এবং সমস্ত বিষয়ে স্মৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। মেগাস্থিনিস যেহেতু পাটলিপুত্রে গিয়েছিলেন এবং অন্যান্য গ্রিক সূত্র অপেক্ষা ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর অধিকতর জ্ঞান ছিল, সে কারণে তাঁর নিরীক্ষাকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

তবুও ভারতবর্ষে লেখন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিবহাল ছিল (উত্তর-পশ্চিম অংশ ছাড়াও অন্যত্র) এই মতে যারা স্থির প্রত্যয়ী, তারা দুটি নেতিবাচক যুক্তির ভিত্তিতে সর্বদা সওয়াল করে থাকেন : (১) মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এ সমাজ এত জটিল হয়ে উঠেছিল যে লেখন ছাড়া সেটি পরিচালনাই করা যায় না। (২) প্রাচীনতর সময়কালে, ভারতবর্ষের মানুষ যেহেতু তালপত্র, ভূর্জপত্র এবং কাপড়ের মতো ক্ষয়িষ্ণু মাধ্যমে লিখত, সে কারণে প্রাক-মৌর্য যুগের লেখনের কোনো সাক্ষ্যই টিকে থাকেনি। কিন্তু নতুন পৃথিবীতে, মেক্সিকোর আজটেক এবং পেরুর ইনকা সভ্যতার মতো জটিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো সমৃদ্ধ সভ্যতাও লেখন ব্যতিরেকেই বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ ইনকাদের একটি পদ্ধতি ছিল যার নাম 'কুইপু' যেখানে বিভিন্ন ধরনের সুতো এবং গিঁট কোনো কিছু মনে রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করত। প্রাক-মৌর্য যুগে, ভগ্ন মৃৎপাত্রে এবং ছিদ্রযুক্ত মুদ্রায় নানান চিহ্ন এবং সংকেত পাওয়া গেছে যেগুলি একই কাজে লাগতে পারে। দ্বিতীয় যুক্তির আধারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, ভগ্ন মৃৎপাত্রে তাহলে দু-একটা অন্য চিহ্নও থাকতো, তাহলে আর মৌর্য-যুগের ভারতবর্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য লেখনের প্রমাণ রহিত হতো না। বস্তুত শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরে ভগ্ন মৃৎপাত্রে ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া গেছে, সেটি আমরা ২.৫ অধ্যায়ে দেখেছি। এই লিপি সাক্ষর নিশ্চিতরূপে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী না হলেও অন্তত সেই সময়কালের হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো প্রত্ন-স্থান থেকে ওই খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের সময়কালের অনুরূপ উৎকীর্ণ ভগ্ন মৃৎপাত্র পাওয়া যায়নি।

ভারতবর্ষে লেখনের প্রাচীনতত্ত্বের প্রশ্নটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মীলিপির আঙিনাতেই সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাক-মৌর্যযুগের ভারতবর্ষে লিপির অস্তিত্ব ছিল, এ কথায় বিশ্বাসীদের অধিকাংশই এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, উত্তর ভারতে চিহ্ন এবং

সংকেতের অভ্যন্তরীণ বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব। এমনকী অনেকে অশোকের আরো ১৫০০ বছর পূর্বেকার সিন্ধুলিপির সঙ্গে এর সম্পর্কের সপক্ষে সওয়াল করেন। অবশ্য, সিন্ধু ভাবলেখের মতো এমন সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু থেকে যদি ব্রাহ্মী অক্ষরের উদ্ভব সম্ভব হয়ে থাকে তবে তো যেকোনো ধরনের যেকোন লিপি থেকেই এ লিপির জন্ম হতে পারে। আমাদের জানা তথ্য থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়াই সবচেয়ে ভালো উপায়। খরোষ্ঠী লিপির জন্মবৃত্তান্ত কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত। অশোকের প্রাকৃতের সঙ্গে ব্রাহ্মীর সমন্বয়ে এই লিপিটি গড়ে উঠেছে। আরো অনেক পণ্ডিতের মত, খ্যাতনামা জি. ব্রাহলারও দেখিয়েছেন যে, সদৃশ্য উচ্চারণ-ধ্বনি সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে খরোষ্ঠী লিপির অনেক বর্ণের সঙ্গে আরমীয় লিপিচিহ্নের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন আরমীয় লিপির মতো এটিও দক্ষিণ থেকে বাম দিকে লিখিত হয়। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় গান্ধারায় যেখানে আরমীয় লিপিও একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল। ব্যাঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরবর্ণের অভিব্যক্তির অসুবিধা আরমীয় লিপির মতো খরোষ্ঠীতেও বিদ্যমান; এক্ষেত্রে আরমীয় ভাষায় কোনো স্বরবর্ণ ব্যবহারই হয় না এবং আপন যুক্তিতে স্বরবর্ণ সংস্থাপন করে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু খরোষ্ঠী ভাষায় প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণই সে স্থলে এক-স্বর যুক্ত একটি শব্দ এবং সংক্ষিপ্ত অ-স্বরবর্ণ এতে যুক্ত আছে ধরা হয়। বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক বিস্তৃতির সাহায্যে অন্যান্য সংক্ষিপ্ত স্বরবর্ণগুলি শেষে যুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মীতেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কা এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে অশোক ছাড়া অন্যান্য শিলালিপিতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপির মতো অশোকের খরোষ্ঠীতেও কোনো দীর্ঘ স্বরবর্ণ নেই। এবারে প্রশ্ন হলো প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিও কি আরমীয় থেকে উদ্ভূত, নাকি খরোষ্ঠীকে আদর্শ হিসাবে মেনে অথবা অন্য কোনো সমান্তরাল বিকাশে এর জন্ম। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে শ্রীলঙ্কায় প্রচলিত ব্রাহ্মীর সাক্ষ্য থেকে এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও মেলে যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রভাবে শ্রীলঙ্কায় এই লিপি তার প্রাথমিক রূপ পেয়েছিল এবং সেখান থেকে আবার খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে এটি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেছিল (২.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এখন শ্রীলঙ্কার প্রমাণটি যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে অশোকের সময়কালে গ্রিক (এবং যেহেতু অনুরূপ সাদৃশ্যে বাম থেকে দক্ষিণে লিখিত) এবং খরোষ্ঠীর প্রভাবে ব্রাহ্মীর প্রয়াসসাধ্য সৃষ্টির সম্ভাবনাও (সম্প্রতি এইচ. ফকের অনুমান) বস্তুত বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু অশোকের আধিকারিকগণ যে দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং অক্ষরের জন্য অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ যেমন 'শ', 'ষ', ন এবং ণ-এর সঙ্গে চিহ্ন যুক্ত করতেন, এ ধারণাটি সত্য হতেও পারে। সম্ভবত অনেক ক্ষেত্রেই বানানের একটি আদর্শ রূপও গড়ে উঠেছিল।

যাই হোক, যেভাবেই ব্রাহ্মীলিপি উদ্ভূত হোক না কেন, অশোকের রাজত্বকালের

অব্যবহিত পূর্বে অথবা আরো প্রাচীনতর কালপর্বে লেখনের কৌশলটি সম্ভবত অচিরেই ব্যাপ্ত হয়েছিল। নিজের অনুশাসনগুলি সমগ্র সাম্রাজ্য ব্যাপী বিভিন্ন স্থানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ করার জন্য অশোকের যে আগ্রহ তার অর্থ হলো যে, সর্বত্রই তিনি নিশ্চয়ই এমন কিছু মানুষের প্রত্যাশা করেছিলেন যারা তাঁর অনুশাসনগুলি অন্যদের পড়ে শুনিয়ে দেবে। আরো হাল্কা ওজনের কোনো উপাদানের ওপর লিখিত তাঁর অনুশাসনের প্রতিলিপিও তিনি অবশ্যই সর্বত্র বণ্টন করেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসনের সারনাথ স্তম্ভ ভাষ্যে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে এই অনুশাসনের একটি প্রতিলিপি (ইকা লিপি) যেন সমাবেশের একটি স্থানে (সম্‌সালনা) রাখা হয় এবং অন্যটি সাধারণ পূজারীদের (উপাসক) কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় : ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই নিশ্চয়ই এই উপরোধ প্রযুক্ত ছিল। লিপিকার চাপদা মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের ব্রহ্মগিরি শ্রেণীর ভাষ্যটি প্রস্তরে খোদাই করেছিলেন। এক্ষেত্রে এমন একজন মানুষকে আমরা পেলাম যিনি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী উভয় লিপিতেই সমান দক্ষ এবং সেখানে তিনি তাঁর পেশাগত 'লিপিকার' (লিপিকারেনা) উপাধিও লিখে রেখেছেন। মহাস্থান ফলক-লিপি এবং সোহাগৌরার ক্ষুদ্র ফলকে দেখতে পাওয়া যায় কীভাবে সমস্ত সরকারি কাজকর্ম তখন শুধুমাত্র লেখনের সাহায্যেই সংঘটিত হতো। পিপ্রাহওয়ার সাজিমাটির পাত্রদানের উৎকীর্ণ লিপি এবং ভাত্তিপ্রোলুর ক্ষুদ্র কৌটা-লিপিতেও অনুরূপ বৌদ্ধ সঙ্ঘে কীভাবে লেখন ব্যবহৃত হতো তার সাক্ষ্য মেলে। জৈন সাধুদের মধ্যে অথবা যারা তাদের কিছু উপহার দিত তাদের ক্ষেত্রেও লেখন ব্যবহারের অনুরূপ কাহিনী তামিল ব্রাহ্মী শিলালিপিতে ব্যক্ত। সেসময় সমাজে সাক্ষরতার মাত্রা যে কীভাবে প্রসারিত হয়েছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় যোগীমারা গুহায় (রামগড় পর্বত) উৎকীর্ণ লিপিতে। সেখানে বারাণসীর বাসিন্দা, 'চিত্রাঙ্গনে দক্ষ' (লুপদাসা = রূপদীক্ষা) দেবদীন প্রস্তর সাক্ষরে দেবদাসী সুতনুকার প্রতি তার ভালবাসা ব্যক্ত করেছিল (চিত্র ৩.৭ দ্রষ্টব্য)। উৎকীর্ণ লিপিটি অশোকের ব্রাহ্মীতে লিখিত। এ ভাষাটি অশোক ব্যবহৃত প্রথম কথ্যভাষা যেটি মৌর্যযুগের পরে আর প্রচলিত ছিল না। একজন নিম্নশ্রেণির শিল্পী ও এক ক্রীতদাসী-বারাঙ্গনার সম্পর্কের মধ্যেও লেখনের এমন অনুপ্রবেশ লক্ষিত হয়।

লেখন কৌশল ব্যবহারের এমন বিস্তারে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দূর প্রসারী ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবেই; এর কোনো বিকল্প প্রস্তাবনা থাকতেই পারে না। প্রসাশনিক আমলাতন্ত্রে লিপিকারেরা স্মৃতিধরের স্থান অধিকার করতে শুরু করল; তথ্য এবং হিসাবনিকাশ নথিভুক্ত করার পদ্ধতি সহজতর হওয়ায় প্রশাসন আরো সক্রিয় হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্য সহ অন্যান্য সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, তাদের পবিত্র রচনাসমূহ সংরক্ষণ এবং সংবহনের কাজে লেখন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়

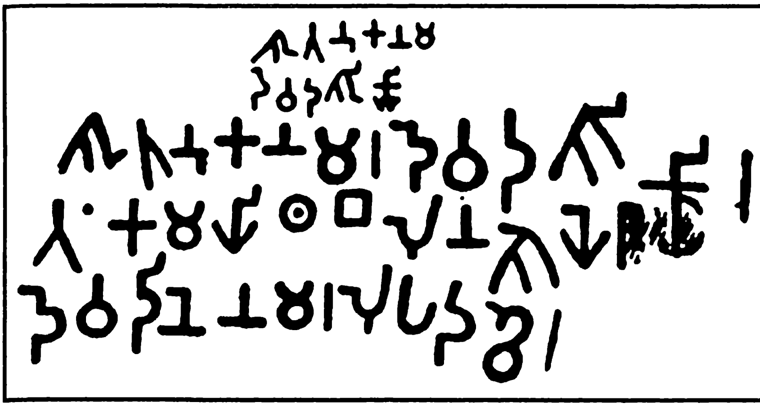

চিত্র ৩.৭ : শিলালিপি, যোগীমারা গুহা, রামগড় পর্বত (A Cunninghum অনুসরণে) "সুতনুকা, দেবদাসী! সুতনুকা, দেবদাসী!—আমি দেবদীন, বারানসীর শিল্পী তাকে ভালবাসি।" ভারতবর্ষের প্রথম রোম্যান্টিক শিলালিপি?

রূপে গণ্য হলো। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে লেখনের ব্যবহার সময় সাপেক্ষ ছিল। প্রাচীনকালে যখন শুধুমাত্র স্মৃতির ভরসাতেই সংরক্ষণ করতে হতো, তখন ধর্ম নিরপেক্ষ রচনাগুলির ক্ষেত্রে শুদ্ধতার দাবি করাই যেতো না। কিন্তু এখন লেখনের মাধ্যমে এদের সঠিক রূপে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। বিশেষত গদ্যরচনা যেগুলি স্মৃতিতে ধরে রাখা খুবই কঠিন এখন লেখনের সাহায্যে শেখার ক্ষেত্রে বা আইনী বিষয়ে সেই গদ্য বেশ প্রবল আত্মবিশ্বাসে কার্যকর হয়ে উঠল। লিখিত হিসাব-নিকাশ ও বার্তার কারণে বাণিজ্যে যে প্রভূত সুবিধা পাওয়া যাবে তা সহজেই অনুমেয়। একবার লিখনরীতি প্রচলিত হলেই ঋণপত্র বা হুণ্ডির ব্যবহারের পথ সুগম হয়ে যায়। অবশ্য এই সমস্ত উন্নতির সঙ্গেই মৌর্য যুগের নাম যুক্ত করা যায় না।

লেখনরীতি থেকে আমাদের মনোযোগ লিখিতরূপে প্রকাশিত ভাষায় স্থানান্তরিত করলে প্রথমেই যেটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের অনুপস্থিতি। বস্তুত প্রথম পরিচিত সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গেছে অযোধ্যার ধনদেবাতে। প্রাচীন হস্তলিপি বিজ্ঞানের বিচারে এই লিপিটি প্রাচীনত্বে অন্ততপক্ষে খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতকের প্রারম্ভকালের রচনা। এমনকি বেশনগরের হেলিওডোরাসের স্তম্ভে উৎকীর্ণ (খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ c.) ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যে একজন ভক্তের (ভাগবত) শ্রদ্ধাজ্ঞাপক রচনাটিও প্রাকৃতে লিখিত; যদিও এমন একটি ব্রাহ্মণ্য তীর্থস্থানে সংস্কৃতের ব্যবহারই প্রত্যাশিত ছিল। এই সমস্ত ঘটনার বিচারে একটি প্রস্তাবনায় উপনীত হওয়া যায় যে, মৌর্যযুগে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান এত ক্ষুদ্র একটি

গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল যে শিলালিপি সংস্কৃতে লেখা হলে খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষের কাছেই সেটি বোধগম্য হতো। অবশ্য এ প্রস্তাবনারও বিরোধী মতো আছে। সেখানে বৈয়করণ পাণিনির বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে c. পাণিনি সংস্কৃতের ক্ষেত্রে, প্রকৃত অর্থে মৌখিক কথোপকথনে যেটি প্রচলিত তাকেই তিনি 'ভাষা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন; দূরবর্তী সম্বোধন এবং স্বাভাবিক কথোপকথন, দুটি ক্ষেত্রে উচ্চারণের ভিন্নভিন্ন নিয়ম তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এ কাজে দৈনন্দিন জীবনের নানান অভিব্যক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন। কাত্যায়ন (খ্রিস্টপূর্ব তয় শতক) এবং পতঞ্জলির (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দ c.) ব্যাকরণেও এই সমস্ত অভিব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত আমাদের সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান উপস্থাপিত করে পতঞ্জলি আমাদের প্রভূত উপকার করেন। তিনি বলছেন, প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষা ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনে যাঁরা শুদ্ধ সংস্কৃত বলতে পারেন, তারাই হলেন শিষ্ট। আর শিষ্টেরা হলেন এমনই কিছু অনাগ্রহী (ধর্মীয় কাজে যুক্ত হবার ক্ষেত্রে) ব্রাহ্মণ যাঁরা আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতে বাস করতেন। অন্যভাবে বললে, সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মুখে নয়, স্বল্পসংখক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কথোপকথনে সজীব ছিল এই সংস্কৃত ভাষা। এই শ্রেণির মানুষ ব্যতিরেকে অন্যান্য মানুষজন এর অশুদ্ধ রূপটি হয়ত ব্যবহার করত। এদের মধ্যে কয়েকটি, পতঞ্জলিও এদের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি বস্তুত প্রাকৃত রূপ (যেমন কৃষি স্থলে কসি। আলোচনায় আরো একটু ভাবনা সংযুক্ত করে বলা যায়, ঠিক এই কারণেই প্রাকৃতেই লিখতে হয়েছিল এই সমস্ত অনুশাসন।

মৌর্য সময়কালের যে সমস্ত শিলালিপি কালের আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, তার বেশিরভাগই প্রাকৃতে রচিত। পরবর্তীকালের প্রাকৃতের থেকে পৃথক করার জন্য একে অশোকের প্রাকৃত বলা হয়। তখন নিশ্চিতরূপেই প্রশাসনিক ভাষা ছিল এটি এবং সম্ভবত শহরে এবং হাটেবাজারে মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলতো। অশোকের প্রাকৃতের প্রচুর শব্দ সংস্কৃত থেকে নেওয়া, তবে দুটি ভাষার ব্যাকরণ ভিন্ন। কিন্তু, শব্দরূপের পরিবর্তন এবং সন্ধির সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ—এ বিষয়ে প্রাকৃত সংস্কৃতের অনুরূপ।

আমাদের নিকটে অশোকের প্রাকৃত চারটি ভিন্ন কথ্যরূপে পরিচিত। আলোচনা সুবিধার্থে এদের কথ্যভাষা ক, খ, গ, ঘ এইভাবে চিহ্নিত করা হলো (টীকা ৩.১ এবং মানচিত্র ৩.২ দ্রষ্টব্য)। কথ্য ক এবং খ কে প্রকৃতপক্ষে পৃথক করা যায় না। পার্থক্যের একমাত্র চিহ্ন হলো, (ক) এর ক্ষেত্রে র ব্যঞ্জনবর্ণটি অনুপস্থিত এবং সমস্ত শব্দে এর স্থলে ল ব্যবহৃত হয়; কিন্তু (খ) ভাষায় 'ল' এবং 'র' উভয়ই ব্যবহৃত হয়। গাঙ্গেয় অববাহিকা এবং উড়িষ্যার অশোকের এবং অন্যান্য মৌর্যযুগের সমস্ত শিলালিপিতে কথ্য (ক) ভাষা ব্যবহৃত হতো এবং সরকারি আদর্শ রূপে এই ভাষাই উপস্থাপিত

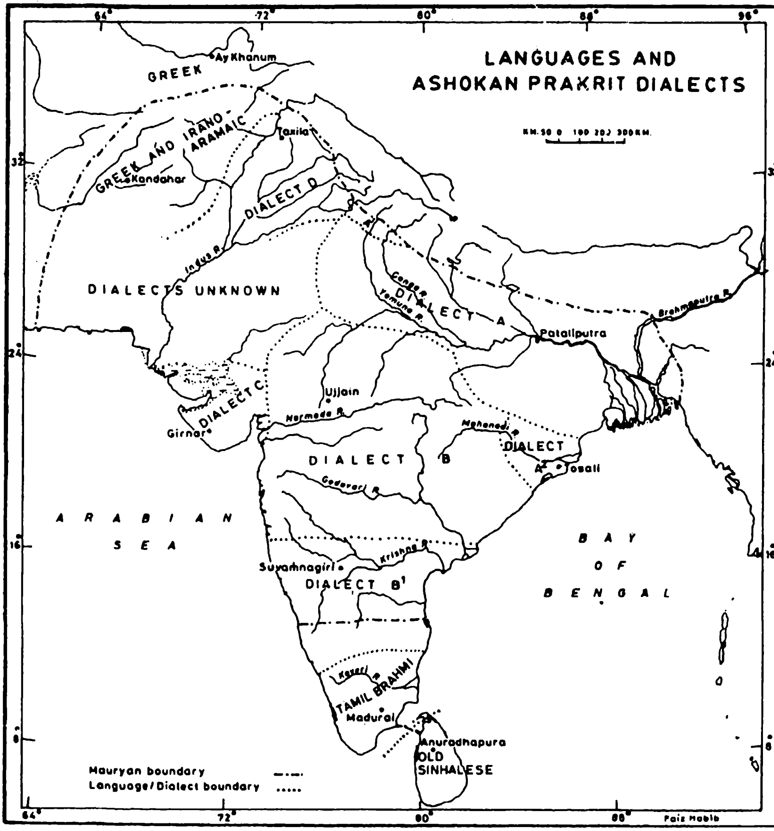

মানচিত্র ৩.২ বিবিধ ভাষা এবং অশোকের প্রাকৃত বাগধারাসমূহ

হতো। কথ্য মগধী ভাষা থেকেই সম্ভবত এটি উদ্ভুত এবং সেকারণেই একে প্রায়শই মগধী বলা হতো। মৌর্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশে এবং মধ্য ভারতে, (খ) কথ্য ভাষাটি পাওয়া যায়। প্রস্তর অনুশাসনের গিরনার ভাষ্যে, (গ) কথ্য ভাষাটি উপস্থাপিত এবং এই ভাষায় সংস্কৃতায়নের নির্দিষ্ট প্রবণতা আছে। শেষোক্ত প্রবণতাটি, (ঘ) কথ্য ভাষাতে আরো বেশি চোখে পড়ে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুটি খরোষ্ঠী শিলালিপিতে এই ভাষা উপস্থাপিত এবং সেকারণে একেই গান্ধারী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যায়।

এই দুটি ভাষাই ছিল অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা একথা বলা আর এইসব কথ্য ভাষার মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের ক্ষেত্র সন্ধান করে যে অঞ্চলে এটি বহুল প্রচলিত সেই অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা—মোটেই এক কথা নয়। এমনকি গাঙ্গেয় অববাহিকার যেসব স্থানে 'ক' কথ্য ভাষার রচনা বেশি সংখ্যায় পাওয়া গেছে,

সেখানেই যে এই ভাষায় অধিকাংশ মানুষ কথা বলতো এমন না-ও হতে পারে। যদি সেরকমই হয় তবে 'র' থেকে 'ল' এই স্থানবদল, যেটি এর সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য, তার নিরিখে এই কথ্যভাষাটি হয়ত একটু দীর্ঘতর আয়ু লাভ করেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ঐ অঞ্চলের অন্য কোনো ভাষায় ক্ষেত্রে কিন্তু একথা বলা চলে না। 'র'-এর ব্যবহারে স্থিরতা ব্যতিরেকে (খ) কথ্যভাষাটি ক-এর অনুরূপ—এই তথ্যের আধারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাধারণ মানুষ নয়, দুটি কথ্যভাষাই আধিকারিক শ্রেণীর মানুষেরা ব্যবহার করতো। কেননা বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষজন একই ভাষার এমন দুটি অত্যন্ত সদৃশ কথ্যভাষায় কথা বলতো, এটা অসম্ভব বলেই মনে হয়। বরং, 'খ' কথ্যভাষায় 'র'-এর অবস্থিতি এই তথ্য জানায় যে, প্রাকৃতের একটি রূপের প্রভাবে এই কথ্যভাষাটি অবন্তী রাজ্যে (মালওয়া) সরকারি কাজে ব্যবহৃত হতো এবং পরে অশোকের প্রাকৃত এর স্থলাভিষিক্ত হলো। আরো ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের 'গ' এবং 'ঘ' কথ্যভাষায় অনুরূপে দেখতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয় মানুষজন মোটেই এই দুটি ভাষায় কথা বলতো না, বরং প্রাকৃতের প্রভাবে 'ক' কথ্যের একটি রূপই তাদের কথার মাধ্যম ছিল। 'ঘ' কথ্যভাষাটি সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জ্ঞান, তার ভিত্তিতে স্থানীয় গান্ধারী ভাষাটিও আমরা পুনরায় নির্মাণ করতে পারি না। যদিও এই গান্ধারীর প্রভাবেই 'ঘ' ভাষাটি উদ্ভূত। কেননা এই দুটি ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে সম্ভবত 'ক' কথ্যভাষায় লিখিত মূল অনুশাসনের অধিকাংশ শব্দই অবিকৃত রয়েছে। শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে এদের উচ্চারণ এবং বানানের কিছু বদল ঘটে থাকতে পারে। অবশ্য 'ঘ' কথ্যভাষার শাহবাজগরহি শিলালিপি অন্য সবকটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে 'বারো' অর্থে দুভাদাক-এর পরিবর্তে 'বারায়া' শব্দটি ব্যবহার করেছে। সরকারি প্রাকৃতের ঐ দীর্ঘ শব্দটির পরিবর্তে গান্ধারের মানুষজন যে প্রাচীন হিন্দুস্তানী 'বারা' শব্দটি ব্যবহার করত সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। 'ঘ' কথ্যভাষা থেকেও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, 'ক' এবং 'খ' কথ্যভাষার থেকে গান্ধারীর ব্যাকরণ অনেক আলাদা ছিল এবং এদের তুলনায় সেখানে যৌগিক ব্যঞ্জনবর্ণ (সংস্কৃতের নিকটবর্তী রূপ)-এর ব্যবহার অনেক বেশি প্রচলিত ছিল। অতএব এইভাবে যুক্তি বিন্যস্ত করা সম্ভব যে, স্থানীয় শক্তিশালী একটি স্থানীয় সংস্কৃত পরম্পরার কারণেই সংস্কৃতের প্রতি এমন অধিকতর আত্মীয়তা দেখা যাচ্ছে। এই পরম্পরার অন্যতম প্রতিনিধি হলেন বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি। বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশিলার অবস্থিতিও এই পরম্পরার আর একটি কারণ। ইরানি ভাষায় এ ধরনের যৌগিক ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ না থাকায় তারই প্রভাবে উদ্ভূত প্রাকৃতের বিস্তার এখানে ব্যাহত হয়েছে এমনও হতে পারে।

এই ইরানীয় উপস্থিতির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো, তক্ষশিলা এবং আফগানিস্তানে অশোকের নিজস্ব আরমীয় শিলালিপি। আরমীয় ভাষায় উৎস হলো

সেমেটিক। কিন্তু সিরিয়া থেকে পূর্ব সীমান্তে আকামেনেদীয় সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকায় আন্ত-আঞ্চলিক এবং সরকারি যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হিসাবে এই ভাষা তার লিপিসহ বিস্তার লাভ করেছিল। অশোকের আরমীয় শিলালিপি যারা লিখেছিলেন তাঁরা এই ভাষার ব্যাকরণ জানতেন (প্রধানত সেটিই তাঁরা অনুসরণ করেছেন) এবং আরমীয় শব্দভাণ্ডারের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন (এভাবে রাজা বা মালিক অর্থে 'mlk')। কিন্তু এরই সঙ্গে তাঁরা এত বিপুলসংখ্যক ইরানীয় শব্দ এনেছিলেন (বিশেষত অবেস্তীয় কিন্তু প্রাচীন পারসিক) যে তাদের ব্যবহৃত এই ভাষাটিকে ইরানী-আরমীয় ভাষাও বলা চলে। জে. হারমাত্তা এই সমস্ত শিলালিপিতে ব্যবহৃত ইরানী শব্দের মধ্যে এত বেশি অবেস্তীয় উপাদানের প্রাধান্য আবিষ্কার করেছেন যে, পশ্চিম ইরান থেকে পাওয়া কয়েকটি মাত্র প্রাচীন পারসিক শব্দ ছাড়া, তৎকালীন আফগানিস্তানে প্রচলিত কথ্যভাষাটি মূলত বিশুদ্ধ অবেস্তীয় ভাষায় ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল এমন অনুমান করা যায়।

আফগানিস্তানে আরেকটি ভাষা প্রচলিত ছিল। সেটি গ্রিক ভাষা। আকামেনেদীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে গ্রিক মানুষজনের বসতি ছিল—গ্রিক রচনাকারদের এই বিবৃতি সত্ত্বেও আলেকজাণ্ডারের বিজয়-অভিযানের পূর্বে ঐ অঞ্চলে অর্থাৎ ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে গ্রিক ভাষার উপস্থিতির কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কান্দাহারে আবিষ্কৃত অশোকের গ্রিক ভাষায় লিখিত অনুশাসন থেকেই এই ভাষায় উপস্থিতির প্রাচীন এবং শক্তিশালী সাক্ষ্যটি পাওয়া যায়। মনোরক গ্রিক লিপিতে এটি রচিত এবং বস্তুত সমগ্র হেলেনীয় জগতে, বর্তমানে ব্যবহৃত এর সাধারণ যে রূপ সেই 'কোইনে' কথ্য ভাষা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনের গ্রিক অনুবাদটি অত্যন্ত আকর্ষনীয়। কেননা, এখানে দ্বাদশ প্রস্তর অনুশাসনের অনুবাদক তাঁর আত্তিয় (Attic) ভাষার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন আর ত্রয়োদশ অনুশাসনের অনুবাদে আবার 'কোইনে' ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উভয় অনুবাদকই অত্যন্ত পণ্ডিত এবং গ্রিক সাহিত্য এবং দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান এ কাজে তাঁরা প্রভূত ব্যবহার করেছেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের বাইরে অনুশাসনের মধ্যে দুটি দক্ষিণী ভাষার উপস্থিতি চোখে পড়ে (পূর্বের ২.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তামিল ভাষা যে তার বিশিষ্ট ব্যাকরণ এবং শব্দ ভাণ্ডারে সেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষের ভাষা ইতিহাসের বিচারে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তামিল-ব্রাহ্মী শিলালিপির সঠিক পাঠোদ্ধারের পর দেখা গেল যে, এটি প্রকৃতপক্ষে 'প্রাচীন তামিল ভাষা যেটি পরবর্তী যুগের তামিল অনুশাসন, এমনকি তামিল সাহিত্যের ভাষার থেকে উপাদানগত বিচারে মৌলিক রূপে, উচ্চারিত ধ্বনিতে এবং পদবিন্যাসে তেমন আলাদা কিছু নয়' (আই মহাদেবন)। অবশ্য তামিল-ব্রাহ্মী শিলালিপিতে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারের এক

চতুর্থাংশেরও অধিক তামিল শব্দের ঋণ স্বীকার করে নিলেও উপরোক্ত বিচারের কোনো রকমফের হয় না।

তামিল-ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন যখন শুরু হলো অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ অর্ধাংশে, তখনই শ্রীলঙ্কার গুহালিপি রচনার কাজ শুরু হয়। এইসব অনুশাসনের ভাষা হলো প্রাচীন সিংহলী। ইন্দো-আর্য শব্দের ব্যবহার এবং যৌগিক ব্যঞ্জনবর্ণের পরিহার—এই দুটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এই ভাষাকেও প্রাকৃত শ্রেণিতে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু এই ভাষার আরো অনেকগুলি একেবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন, দীর্ঘ স্বরবর্ণের অনুপস্থিতি, 'স' স্থলে 'হ' লেখার প্রবণতা এবং ঘোষ বর্ণের (গভীর পাদযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ) অভাব ইত্যাদি। সে কারণে আপন অধিকারেই এই ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

ভাষা থেকে এবার জ্ঞানের রাজ্যে দৃকপাত করলে, দুটি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি চোখে পড়ে—ব্যাকরণ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান। পাণিনির অষ্টাধ্যয়ীকে পৃথিবীর প্রথম যথাযথ এবং বিস্তৃত ব্যাকরণগ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করা যায়। প্রায় ৪০০০ সংক্ষিপ্ত সূত্র আটটি গ্রন্থে এমনভাবে সংকলিত যাতে সহজেই স্মরণ রাখা যায়। শব্দের গঠন, বিবিধ নিয়মাবলী এবং সঠিক উচ্চারণের নিয়ন্ত্রণে শব্দের বিভিন্ন পরিবর্তন, সমস্তই পাণিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে সংস্কৃত যে কোনো সাহিত্যিক রচনায় কোনোটি ঠিক এবং কোনোটি ভুল তা নির্ধারণের এমন চরম কর্তৃত্ব তাঁর বা তাঁর নিয়মাবলীর ছিল যে তিনিই পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্যের দ্বিধাগ্রস্ত অথচ সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্যে তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট কিছু শব্দভাণ্ডার অথবা শব্দ রূপের সাহায্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এটি তাঁর লক্ষ্য ছিল না; তাঁর অনুগামীদের কাছে তিনি শব্দ ব্যবহারের যেসব খবরাখবর জানতে পারতেন, যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যবহার সঠিক আর কোনটি সঠিক নয় সেই বিচারেই তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। একটি বিষয়ে সম্ভবত সমস্ত পণ্ডিতরা সহমত ছিলেন যে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে অর্থাৎ মৌর্য যুগের অনেক পূর্বে পাণিনির সময়কাল। কিন্তু তাঁর উদাহরণে (IV.১.৪৯) স্ত্রীবাচক ইয়াভানা (আয়নীয় এবং গ্রিক) শব্দের 'ইয়াভানানি' রূপটি থাকায় মনে হয় তাঁর জীবতকালের পরিসর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরবর্তী সময়কাল। পাণ্ডুলিপি অর্থে তাঁর লিপি শব্দের উল্লেখেও অনুরূপ সমর্থন মেলে। কিন্তু এটি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তও হতে পারে এবং সেকারণে প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়েই যায়।

কাত্যায়ন পাণিনির রচনাগুলিকে পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার করেছিলেন। তিনি ভার্ত্তিকা সমূহ বা বিশ্লেষণাত্মক টীকার রচয়িতা। সেখানে পাণিনির ১২৪৫টি সূত্র রয়েছে এবং পতঞ্জলি আমাদের জন্য মহাভারতে সেগুলি সংরক্ষণ করেছেন (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দ c.)। তিনি কালের নিরিখে পাণিনি ও পতঞ্জলির মধ্যবর্তী সময়কালের।

কিন্তু পাণিনির থেকে তাঁর সময়কালের দূরত্ব অনেক বেশি, কেননা কথ্য সংস্কৃত বিশেষত এর আঞ্চলিক বাচ্যে কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। দেবনামপিয় উপাধির ঘোষণায় তাঁকে মৌর্যযুগের সমসাময়িক মনে হয় (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক)। কাত্যায়ন ছিলেন পাণিনির সংযমী সমালোচক এবং তাঁর মতে ভাষাগত সাম্যে যেহেতু ঠিকমতো বিচার সম্ভব নয় সেকারণে তিনি শুধুমাত্র এই সমস্ত নিয়ম বা অনুশাসন বাক্য সংস্কার করতে চাইতেন। পাণিনির প্রতি সহানুভূতিশীল পতঞ্জলি তাঁর এই কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন এবং এক অর্থে তাকে সম্পূর্ণ করেছিল। তিনি অবশ্য কাত্যায়নের সমালোচনাকেও যথেষ্ট মূল্য দিতেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে রচনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, সেটি অর্থশাস্ত্র। ১.২ নং টীকায় এর তারিখের সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য হলো, গ্রন্থটি ৩০০ খ্রিস্টাব্দে (c) সম্ভবত তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলেও, নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী ভাষ্য থেকে নানান উপাদান এখানে সংকলিত হয়েছে এবং এর কিয়দংশ আরো প্রাচীন সময়কালে সৃষ্ট। পাঁচ বা ছয় শতাব্দী যাবৎ নানান উপাদানের এমত সংকলন থেকে মৌর্যযুগে তার প্রাচীনতর মূল রূপটি ঠিক কেমন ছিল, তার পুনর্নির্মাণ নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এর মধ্যে কী কী ছিল সে বিষয়ে কিছু কথা নিশ্চয়ই বলা যায়। ধর্মসূত্র, যার সমস্ত রচনা স্থূল অর্থে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-২০০ অব্দের, সেখানে রাজা ও আধিকারিকগণের দায়িত্ব, কর, সামরিক বিষয় এবং ন্যায়বিচার সমস্ত কিছুই আলোচিত হয়েছে। অতএব অর্থশাস্ত্রের প্রাচীনকালের অংশে নিশ্চয়ই অন্য কোনোভাবে এই বিষয়গুলি ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই পুরোহিত বিচারকদের তুলনায় এর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই পৃথক ছিল। একটি অনুশাসন-বাক্যে (I ৭.৬-৭) এই পার্থক্যের বিষয়টি বেশ স্পষ্ট বয়ানে বিধৃত : "পার্থিব লাভই (অর্থ) একমাত্র মহত্তম, সেকথাও কৌটিল্যও বলেছেন, কেননা ধর্মীয় কর্তব্য (ধর্ম) এবং যৌন আনন্দ (কাম) উভয়ের পরিপূর্ণতা অর্জনের সূত্র হলো অর্থ।" এই মৌলিক ভিত্তির আধারে, অর্থশাস্ত্রের প্রচেষ্টা হলো প্রতিটি পার্থিব ক্ষেত্রে, বস্তুত, রাজপুত্র বা রাজাকে তার উচ্চাকাঙ্খা পূরণে সফল হওয়ার পথ দেখিয়ে দেওয়া। অনুশাসন বাক্যের উদ্ধৃতিতে দেখা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব লাভ প্রতিষ্ঠিত বর্ণ ব্যবস্থা এবং বৈদিক আচারে রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত, ততক্ষণ এর সঙ্গে ধর্মের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই (নিষ্কর্ষ ৩.২); বরং পার্থিব লাভের ফলাফলে এদের আরো অনেক বেশি সুরক্ষিত করা যায়। যাইহোক, পার্থিব সাফল্য অর্জনের প্রক্রিয়ায় ধর্মের নীতিসমূহ যে লঙ্ঘিত হতে পারে, সেকথাও স্বীকার করা হয়। অর্থশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে এই নীতি অনুমোদন করে। কেননা কারো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, লুন্ঠন এবং হত্যার সপক্ষেও শান্তকণ্ঠে এই গ্রন্থে সওয়াল করা হয়েছে। অর্থকেই সর্বোত্তম গণ্য করা হয়। অর্থশাস্ত্রের মূল কথাটি অবশ্য নিছক

ষড়যন্ত্র এবং অপরাধে সীমাবদ্ধ নয়। নীতির সংস্কার এবং একটি শক্তিশালী ও প্রণালীবদ্ধ প্রশাসনের সুপারিশ এখানে করা হয়েছে : 'তৃপ্ত' শব্দটি এক্ষেত্রে একটু বেশি ইতিবাচক হয়ে যায়, কিন্তু নিজের অবস্থান এবং সম্পদ সুরক্ষিত রাখাই যে শাসকের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তার পক্ষে বিক্ষোভহীন জনসমষ্টি সর্বোত্তম। কালাবর্তনে রচনাটি তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এছাড়া কৃষি, সেনা সংগঠন থেকে শুরু করে আইনের বিশদ ব্যাখ্যায় শাসক, তার আধিকারিকগণ এবং বিচারকের সেসব তথ্যের প্রয়োজন হয়, তারই একটা স্পষ্ট সংক্ষিপ্তসার এখানে আছে। এর মধ্যে কয়েকটি তথ্য প্রাচীন অংশে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং যুক্তিসংগতকারণেই একে মৌর্য সময়কালের রচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দর্শন সংক্রান্ত আলোচনায় অর্থশাস্ত্রকে উচ্চতর আসনের দাবিদার হিসাবে গণ্য করা হয়ত একটু বাড়তি ভাবনা হবে কিন্তু সম্রাটশাসিত রাজ্য, তার সহজাত দ্বন্দ্ব ও প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মাবলীর রক্ষক হিসাবে নিজস্ব সুবিধার ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র স্থান, এই সমস্ত বিষয়ে অসাধারণ বোধ উপস্থাপিত করে অর্থশাস্ত্র—এ কথা অনস্বীকার্য। নিশ্চিতরূপে এটি আমাদের একটি অর্জন।

ঔষধের ক্ষেত্রে, প্রাচীনতর রচনায় কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পতঞ্জলি (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দ) বৈদক (ঔষধ)-কে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করেছেন। ১৭০ বছর পূর্বে নিয়ারখুশ তাঁর প্রতিবেদনে (আরিয়ান, ইন্ডিকা XV) জানাচ্ছেন যে, আলোকজান্ডার বলছেন, ভারতীয় চিকিৎসকরা সর্প-দংশন নিরাময় করতে পারেন। তাঁর বাহিনীর চিকিৎসার জন্য তিনি তাদের এনেছিলেন এবং তাঁরা অন্যান্য রোগ যন্ত্রণারও উপশম করেছিলেন। অশোকের দ্বিতীয় প্রস্তর অনুশাসনে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ অব্দ) মানুষজন এবং গবাদি পশুর চিকিৎসা এবং এইসঙ্গে ওষধি লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় এবং ফলমূল যোগান দেবার কথা বলা হয়েছে। তাঁর রাজত্বের সর্বত্র অশোক এই ব্যবস্থা করেছিলেন (নিষ্কর্ষ ২.২)। ঔষধ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে, আদিম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ঔষধ-প্রস্তুত-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের অস্তিত্বের কথাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

গণিতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি পাওয়া যায় শুলবাসূত্রে। বৈদিক আচারের জন্য পোড়া ইঁটের যজ্ঞবেদী নির্মাণ কৌশল এই সূত্রে রয়েছে। এই রচনাগুলি অনেক পূর্বে, প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত। কিন্তু মৌর্য যুগের পূর্বে পোড়া ইঁট ব্যবহারের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য আবিষ্কার করা যায়নি (পূর্বের ৩.১ দ্রষ্টব্য)। পোড়া ইঁটের বিভিন্ন আকার সংক্রান্ত আলোচনায় রত এইসব রচনাগুলি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-১৫০ অব্দে (c) হতে পারে। এই সমস্ত রচনায় যোগ এবং গুণ করতে প্রভূত পরিমাণে ভগ্নাংশ ব্যবহৃত হতো। এছাড়া ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে বর্গের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। যজ্ঞ-গহ্বরের পার্শ্বদেশের পরিমাপে পরীক্ষামূলকভাবে জ্যামিতিক সূত্র সমূহ আবিষ্কৃত হয়েছিল পিথাগোরাসের সেই বিখ্যাত সূত্র। শেষ সূত্রটি বৌধায়ন

বিধৃত করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, অতিভূজ ছাড়া অন্যদুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি পূর্ণ সংখ্যা হয়, তবে তাদের বর্গের যোগফলের সম পরিমাণ ক্ষেত্র অতিভূজের বর্গের সমান হয় যেখানে অতিভূজের দৈর্ঘ্যও একটি পূর্ণ সংখ্যা : এইভাবে ৩ এবং ৪ একক দৈর্ঘ্যের বাহুদুটির বর্গের যোগফল একত্রে অভিভূজের বর্গের সমান (অতিভূজের দৈর্ঘ্য অবশ্যই ৫ একক) ইত্যাদি। অবশ্য বন্ধনীর ভিতরে লিখিত সংখ্যা এখানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত নয়। অদ্ভুত যোগাযোগে সমসাময়িক চীনা গণনেও, ঝৌ বি (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ অংশে) অনুরূপ সংখ্যার ব্যবহারে প্রায় সদৃশ একটি সমীকরণ বিধৃত করেন : $৩^২ + ৪^২ = ৫^২$। উভয়ক্ষেত্রেই ইউক্লিডিয় জ্যামিতির মতো কোনো স্বাধীন যৌগিক প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় নি; বরং প্রকৃত পরিমাপেই নির্দিষ্টভাবে এই প্রমাণটি পাওয়া গেছে।

জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের পূর্বে বেদান্ত জোতিষ নামক ক্ষুদ্র একটি কাব্যগ্রন্থে, এই বিষয়ক জ্ঞান অথবা জ্যোতির্বিদ্যা এবং কালপঞ্জী সংক্রান্ত নানান তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের মতো (II২০.৪৬-৫০, ৬৬) এখানেও ৩৬৬ দিনে একটি সৌরবছর এবং ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বছর গণনা করা হয়। সে কারণে প্রতি আড়াই বছর অন্তর একটি অতিরিক্ত মান সংস্থাপিত করে সৌর বছরকে চান্দ্র বছরের সঙ্গে মেলানো হতো। উভয় রচনাতেই নক্ষত্রমণ্ডলীর (নক্ষত্র রাজি) সংখ্যা ধরা হয়েছে সাতাশ। অশোক তার পৃথক প্রস্তর অনুশাসনসমূহ এবং পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে দেখান যে, চান্দ্র মানেরই প্রচলন ছিল এবং রাত্রির নক্ষত্রমণ্ডলীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। এদের মধ্যে তিসা (তিস্যা) এবং পুনা বসু (পুন র্বসু) এই দুটি নক্ষত্রমণ্ডলী পবিত্র হিসাবে গণ্য হওয়ায় তিনি এদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। নব প্রতির্ষ্ঠিত সেলুকসীয় অব্দের প্রভাবে প্রতিটি বছরকে ক্রমপর্যায়ী সংখ্যায় চিহ্নিতকরণ অশোকের সময়কালের অন্যতম অগ্রগতি। বস্তুত অশোকের রাজত্বকালের বছরগুলিই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত প্রথম অব্দ হিসাবে পরিচিত।

হারিয়ে যাওয়া বিবিধ সাহিত্যিক রচনার কালনির্ণয়ে প্রভূত অসুবিধা থাকায় মৌর্য যুগে সংস্কৃত বা প্রাকৃত যে কোনো ভাষায় রচিত সাহিত্যের সন্তোষজনক চিত্র উপস্থাপিত করা কঠিন, সংস্কৃতের ক্ষেত্রে, আমরা অনুমান করতে পারি যে, মহাভারত মহাকাব্যটির চূড়ান্ত সংকলন আরো অনেক পরে করা হয়েছিল। তবে এর কিছু অংশের রচনাকৌশলে ভাষায় প্রাচীনত্বে মনে হয় যে এগুলি মৌর্যযুগে রচিত। রামায়ণ সম্ভবত মহাভারতের চূড়ান্ত সংকলনের অনেক পূর্বের রচনা। কিন্তু প্রথমটির মধ্যে মহাভারতের প্রাচীন উপাদানের একটিও উপস্থিত না থাকায় এবং একইসঙ্গে রচিত হওয়ায় এটি সম্ভবত উত্তর মৌর্যযুগের রচনা।

এমনকি পরবর্তীকালে, এই দুই মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গীভূত হলেও,

বৈদিক সাহিত্যে অপরিচিত নবছন্দোবদ্ধ কাব্য যে পরে সৃষ্ট তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেই (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দ c.) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি সীমিত যে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলিতে 'ছন্দের বিভব এবং জটিলতা'-এর এক আকর্ষণীয় প্রকাশে মৌর্য পরবর্তী সময়কালে কবিতার প্রভূত বিকাশ অনুমিত হয়। বস্তুত, পতঞ্জলির সাক্ষ্যে ছন্দের এই যে আধুনিক চরিত্র, সেটিকেও যুক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দের আরো অনেক পরবর্তী এমন দাবি উত্থাপিত করা হয়। পতঞ্জলির উদ্ধৃত স্তবকে (অধিকাংশ ভগ্নস্তবক) দেখা যায়, বীর-গাথা বা স্তুতি এবং রোম্যান্টিক ও কামোদ্দীপক কবিতার সঙ্গে বেদনা ভারাক্রান্ত স্তবকও তখন রচিত হচ্ছিল।

গদ্যে তখনও সূত্র (সংক্ষিপ্ত বাক্য) রূপটি যথেষ্ট পরাক্রমী। পতঞ্জলির বর্ণনানুসারে, এখানে এত বেশি সংক্ষিপ্ত রূপের সন্ধান করা হতো যে একজন সূত্র রচয়িতা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বরবর্ণ বাতিল করে যেন পুত্র প্রসবের আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতেন! কিন্তু প্রায়শই স্বচ্ছতার মূল্যে এই সংক্ষিপ্ত রূপটি পেতে হতো। আজকের দিনে কয়েকটি সূত্র থেকে গূঢ়ার্থ উদ্ধার করে তাকে পুনর্নির্মাণ করা অনেক সময়েই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

প্রাকৃতে অশোকের অনুশাসনে সর্বদাই একটি কথোপকথনের শৈলী অনুসৃত হয়েছে। অতিশয়োক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করে, বিশেষ গুরুত্ব দানের উপায় হিসাবে পুনরুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সাহিত্যিক পদবাচ্য হবার কোনো ছলচাতুরী বা ভণ্ডামী এইসব রচনায় একেবারেই নেই। পূর্বে ৩.৩ উপ অধ্যায়ে অনুমান করা হয়েছিল যে বৌদ্ধদের পালি ধর্মগ্রন্থের গুরত্বপূর্ণ এবং প্রধানতম অংশগুলি হয়ত তৃতীয় পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অশোকের সময়কালেই সংকলিত হয়েছিল; কিন্তু সে কারণে ত্রিপিটকের (তিনটি সাজি) বিবিধ অংশমালা কখনই ঐ সময়কালে রচিত হতে পারে না; এগুলি সাধারণভাবে অবশ্যই আরো অনেক প্রাচীনকালের সামগ্রী, এবং এর একটি ক্ষুদ্রাংশত বুদ্ধের সময়কালে রচিত নয়। একমাত্র প্রধান ব্যতিক্রম হলো খুদ্দাকর নিকায়া। এটি সম্ভবত পরবর্তীকালের সংযোজিত অংশ যেগুলি প্রাথমিক সংকলনে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। কিন্তু সেজন্য এর রচনাকাল খুব আধুনিক হবার প্রয়োজন নেই। এই সংকলনে রয়েছে বিখ্যাত নৈতিক কার্যবিধি, ধম্মপদ এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের গান থেরা-গাথা এবং থেরি-গাথা)। শেষের অংশটি তার বিশিষ্ট শৈলীতে এই ইচ্ছাকৃত হতদ্দশায় পরম আনন্দ এবং সন্তোষ উপস্থাপিত করে। কিন্তু পার্থিব জগতও একেবারে অনুপস্থিত নয়; খল-নুড়ি আর কুঁজো পিঠ স্বামী—এই তিন বিকৃত সামগ্রীর থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় একজন সন্ন্যাসিনী আনন্দে উচ্ছ্বাসিত।

বুদ্ধের পূর্বতন জীবন বা জন্মের কাহিনী, অর্থাৎ জাতকসমূহ খুদ্দাকা নিকায়ার একটি অংশ; কিন্তু এটি, বস্তুত, প্রায় ৫০০টি কাহিনী (পূর্বকালের ৫৪টি) সম্বলিত

একটি পৃথক গ্রন্থ। আপাতদৃষ্টিতে লোককাহিনী থেকে গৃহীত নানান গল্প এর অন্তর্গত এবং বৌদ্ধ ধর্মের সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে এদের ব্যবহার করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রে পুনরায় এদের কয়েকটির সন্ধান মেলে; আর অবশিষ্ট কাহিনীগুলির সমতুল (উদ্ভূত) জুড়ি সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই সাঁচী এবং ডারহুতে র (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতক) ভাস্কর্যে জাতকের গল্প উপস্থাপিত। অতএব মৌর্যযুগ অবসানের পূর্বেই যে এগুলি শুধুমাত্র সংকলিতই হয়নি, বৌদ্ধ পবিত্র কাহিনীর একটি অংশ হয়ে উঠেছিল, এমন অনুমান অবশ্যই করা যায়।

৩.৫ শিল্প এবং স্থাপত্য

অশোক এবং তাঁর বিস্ময়কর শিল্প ও স্থাপত্যে পাথরের ব্যবহার—এর সূত্রেই যে ভারতবর্ষে ললিত কলার শুভারম্ভ হলো, একটু ব্যাপক অর্থে এ প্রস্তাবনা সত্য বিবেচিত হয়।

অশোকের সর্বাপেক্ষা দৃশ্যমান মিনার সমূহ প্রধানত গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং মধ্যপ্রদেশে ভূপালের নিকটবর্তী প্রত্ন স্থানে দণ্ডায়মান কয়েকটি নিঃসঙ্গ স্তম্ভ। এগুলি একশিলা স্তম্ভ, কেননা এদের স্তম্ভ মূল একটিমাত্র খণ্ডে নির্মিত। এগুলি নিঃসন্দেহে বৃত্তাকার, বিশাল উচ্চতা বিশিষ্ট, উপরিভাগ সামান্য সংকীর্ণ এবং অদ্ভুত পালিশে উজ্জ্বল যার কোনো প্রতিকল্প নির্মাণের সন্ধান আমরা আজও পাই না। যে কোনো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—যেমন, এলাহাবাদের মিনারটির দণ্ড ১০.৭ মিটার দীর্ঘ, তলদেশের এবং শীর্ষের ব্যাস যথাক্রমে ৮৮.৮ সে.মি. ও ৬৬ সে.মি.। সমস্ত স্তম্ভের মধ্যে বিহারের কোলহুয়ার (বাসারহ্) লিপিহীন স্তম্ভটি দীর্ঘতম। প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে, জলের মধ্যে স্থাপিত স্তম্ভটি প্রায় ১৩.৭৫ মিটার উচ্চ, জলতলে এর ব্যাস ১.২৬ মিটার এবং শীর্ষভাগে .৯৭ মিটার। প্রায়িক হিসাবে এর ওজন ৫০ টনেরও বেশি। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে, অনুরূপ পালিশ বিশিষ্ট একটি পৃথক প্রস্তরখণ্ডে খোদিত 'মস্তক' স্থাপিত। প্রতিটি মস্তক এমনভাবে খোদাই-করা যে তার ঘণ্টাসদৃশ স্থূল নিম্নাংশ দৃশ্যমান; উপরিভাগে পাথর কুঁদে স্তম্ভ পীঠিকা বা পাটাতন নির্মিত যার বাইরের বেড়টি নানান পশুর মূর্তি বা ফুলের নকশায় সজ্জিত। সর্বোপরি কয়েকটি সিংহ, একটিমাত্র সিংহ বা অন্য কোনো পশু সম্বলিত স্তম্ভ-মস্তক। অনেক স্তম্ভ মস্তক আপাত বিচারে নিরুদ্দিষ্ট এবং অন্যগুলি দণ্ডের নিকটেই পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর বিহারে লৌরিয়া নন্দনগড়ের মতো শীর্ষভাগে নিজস্ব অবস্থানে অটুট স্তম্ভমস্তক সহ স্তম্ভ সংখ্যায় বিরল (চিত্র ৩.৮)।

তক্ষশিলা এবং অমরাবতীর স্তম্ভাংশ যেখানে অশোকের লিপির অংশবিশেষ উৎকীর্ণ সেগুলিকে এই মুহূর্তে বাদ দিলে, দশটি স্তম্ভে অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ রয়েছে (পূর্বের ২.১ দ্রষ্টব্য)। অখোদিত অশোক-স্তম্ভ এবং তাদের শীর্ষভাগ বা মস্তক

পাওয়া গেছে বিহারের কোলহুয়া (এইমাত্র বর্ণিত) এবং রামপুরওয়াতে, নেপালের তরাই অঞ্চলের গোটিহওয়াতে, উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী এবং সঙ্কিসে আর মধ্য প্রদেশের উদয়গিরি এবং বেশনগরে (শুধুমাত্র স্তম্ভশীর্ষ)। এরই সঙ্গে, স্তম্ভের অংশবিশেষ বা স্তম্ভশীর্ষ অন্তত ছয়টি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়া গেছে। পার্থিব ধ্বংসাবশেষ থেকে অন্তত পঁচিশটি অশোক স্তম্ভের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। অবশ্য যে স্তম্ভ সমূহ তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, হয়ত সেগুলিরই ভগ্নাংশ এরা, এমনও যে হতে পারে, সে কথাও আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

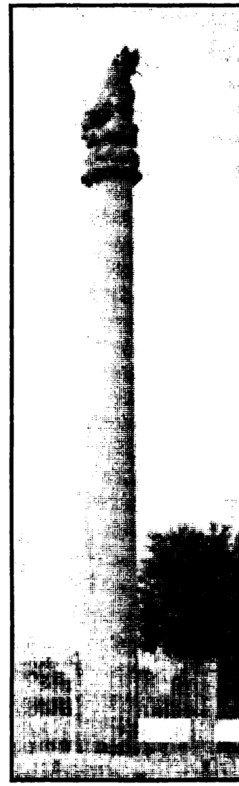

চিত্র ৩.৮ অশোক-স্তম্ভ, লৌরিয়া নন্দনগড়, (আলোকচিত্র : শামিম আখতার)

অশোক তাঁর প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনে, বলছেন, যেখানেই প্রস্তর স্তম্ভ (শিলাখণ্ড) থাকবে, সেখানেই সেই স্তম্ভগাত্রে তাঁর অনুশাসন উৎকীর্ণ করতে হবে। এই স্তম্ভগুলি কি তাঁর সময়কালের পূর্বে তাঁর পূর্বসূরীরা নির্মাণ করেছিলেন? দিল্লি-তোপরা স্তম্ভগাত্রের অনুশাসনটি যে স্তম্ভটি দণ্ডায়মান অবস্থায় খোদিত তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে (খোদিত রচনাটি স্তম্ভের চতুর্দিকে লিখিত এবং সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনের নীচের বাক্যগুলি এর চারদিকে রয়েছে)। কিন্তু অশোক স্বয়ং তাঁর সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে ঘোষণা করেছিলেন (নিষ্কর্ষ ২.৭(ক)) যে, তিনিই ধম্ম-স্তম্ভগুলি (ধম্মখণ্ড) স্থাপন করেছেন। তাঁর স্থাপিত রুম্মিনদেই স্তম্ভের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। লৌরিয়া নন্দনগড় স্তম্ভটি অবশ্যই তাঁর আমলে নির্মিত, কেননা স্থাপনের পূর্বে স্তম্ভটি যখন মাটিতে শোয়ান ছিল তখনই এই অনুশাসনটি খোদিত হয়েছে (শুধুমাত্র একই পার্শ্বে লিখিত)। অবশ্য অশোক যদি কয়েকটি স্তম্ভের নির্মাতা হন, তবে সবকটি স্তম্ভ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। কেননা, সমস্ত স্তম্ভগুলি এমনই সমরূপ নকশায় গঠিত। কাজেই এর মধ্যে দুই বা ততোধিক মানুষের ভাবনার স্পর্শ আছে, জে. আরউননের এই অনুমান অসম্ভব বলেই বোধ হয়।

প্রথম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। অশোকের স্ব-স্থাপিত উৎকীর্ণ লিপিহীন স্তম্ভ হিসাবে একে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু এর

অর্থ হলো, স্তম্ভগুলি তাদের গাত্রে অনুশাসন তাদের গাত্রে খোদিত অনুশাসন বহন করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে স্থাপিত হয়নি। অবশ্য সারনাথ, রুম্মিনদেই, নিগালিসাগর, গোটিহাওয়া, লৌরিয়া নন্দনগড় , সাঁচীর, এছাড়া বৌদ্ধদের অন্য অনেক পবিত্র তীর্থস্থানে বা স্তুপের সন্নিকটে এবং পাটলিপুত্র থেকে লুম্মিনি (বুদ্ধের জন্মস্থান) অভিমুখী তীর্থযাত্রাপথের বিভিন্ন স্থানে এইসব স্তম্ভ স্থাপিত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই এগুলি সংস্থাপিত হয়েছে। অনুশাসন লিপি সমৃদ্ধ ঐ বিশেষ দশটি স্তম্ভ সংস্থাপনের যথেষ্ট যুক্তিসংগত দেওয়া যায়। এদের প্রত্যেকটি হয়ত মূলত কোনো বৌদ্ধ মঠ বা স্তুপের নিকটবর্তী ছিল এমনও হতে পারে। অশোক যে কৌশাম্বী আর বেশনগরের মতো শহরে এবং প্রশস্ত রাজপথের পাশে, সঙ্কিসে যেমন রয়েছে, তেমন স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন সে কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। রাজকীয় প্রচার এবং ধম্ম উভয়ের কারণে স্থাপিত এই গণ-সংকেতে অশোক যে তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন, এ বিষয়টি নিশ্চয় আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। সেই অর্থে সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে কথিত ঐ দশটি স্তম্ভকেই সঠিকভাবে ধম্ম-স্তম্ভ বলা যায়।

দিল্লি তোপরার মতো কয়েকটি স্তম্ভ গোলাপী বালিপাথরে নির্মিত। এই বালি-পাথর সম্ভবত মথুরার প্রস্তর-খনি থেকে এসেছিল। এছাড়া অশোকের অধিকাংশ স্তম্ভই গঙ্গার দক্ষিণ প্রান্তে বারাণসীর নিকটে চুনার প্রস্তরখনি থেকে আনীত সূক্ষ, শক্ত দানার পীতাভ-বাদামী বালি পাথরে নির্মিত। পি. সি. পন্থ এবং ভি. জয়সোয়াল চুনার প্রস্তর-খনি অঞ্চলে খনন করিয়েছেন কিন্তু পাথরের এই দীর্ঘ খণ্ডগুলি কোথায় পাওয়া গিয়েছিল তার সঠিক স্থানটি এখনও ইতিহাসের পাতায় অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। ওখানে তিন মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের কোনো প্রস্তরখণ্ড তাঁরা পাননি। কয়েকটি খনিজ প্রস্তরখণ্ডের উপরে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত খরোষ্ঠী সংকেতের সময়কাল সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। মৌর্য ব্রাহ্মণীতে খোদিত সংকেতও পাওয়া গেছে এমন দাবী রয়েছে। এই খনিজ প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণত বেলনের আকারে (অশোকের স্তম্ভদণ্ডের মত) কাটা হতো। এরফলে নদীর ঢাল এবং নদীতীরের সংকীর্ণ গিরিখাদে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো। সেখানে এগুলি পরিবহনের জন্য নৌকায় তোলা হতো। এ কাজে যে কী পরিমাণ পরিশ্রম রয়েছে একটি সহজ উদাহরণেই তা বোঝা যায়, চুনারের বালিপাথরে নির্মিত, ১২ মিটারেরও অধিক দীর্ঘ এবং প্রায় ৪০ টন ওজনের সাঁচী স্তম্ভটি নিশ্চিতরূপে গঙ্গা, যমুনা ও বিতস্তা নদীর প্রবল স্রোতে পরিবাহিত হয়েছিল আর তারপর প্রায় ২ কিলোমিটার সাঁচীর এই কঠিন চড়াই পার করে অকুস্থলে আনতে হয়েছিল; এমনকি আধুনিক যন্ত্রশিল্পীর পক্ষেও সম্ভবত এ এক দুঃসাহসিক কাজ।

যদিও সে সময়ের পরিবহনের যে মাধ্যমগুলি ছিল তাদের বেশ দক্ষ হাতেই ব্যবহার করা হয়েছিল, তবুও প্রস্তর খনির অঞ্চলেই যদি স্তম্ভগুলির পালিশ ও খোদাই-

এর কাজ করা হতো, তবে পরিবহনকালে, এগুলি নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্থ হতো। সে কারণে, স্তম্ভ-স্থাপনের সম্ভাব্য যে স্থানে অমসৃণ প্রস্তর-স্তম্ভগুলি আনা হতো, সেখানেই সাধারণত এইসব কাজ কাজ হতো। অতএব পালিশ করিয়ে এবং প্রস্তর খোদাইকারের দলটি কোনো একটি নির্দিষ্টস্থানে কাজ না করে কাজের জন্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করতো। একটি স্তম্ভ বা মস্তকের সঙ্গে অন্যটির তুলনাকালে এই তথ্যটি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে : কেবলমাত্র ভাস্করেরাই সম্ভবত ভিন্ন ছিল তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই দূরবর্তী নির্দেশকের অধীনেই তাদের কাজ করতে হতো।

পরবর্তী অংশে মৌর্য স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় এইসব স্তম্ভ এবং তাদের শীর্ষদেশ প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাবে। তার পূর্বে মৌর্য স্থাপত্যকলার অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য যথা, স্তম্ভ বিশিষ্ট সভাঘর এবং খননে সৃষ্ট গুহা এদের প্রতি একঝলক দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

ইতিপূর্বেই পাটনার (পাটলিপুত্র কুমরাহারে অবস্থিত ৮৪টি স্তম্ভ বিশিষ্ট সভাগৃহের উল্লেখ করা হযেছে (পূর্বের ৩.১)। এর প্রতিটি স্তম্ভের উচ্চতা ৯.৩ মিটার। চুনার-বালিপাথরে নির্মিত স্তম্ভগুলি অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের মতোই পালিশ-করা। আকামেনিদীয় রাজধানী শহর পের্সেপোলিস-এ এমনই বিশাল একটি সভাগৃহ এর পূর্বসূরী (এবং সম্ভবত এর আদর্শ) হিসাবে দীর্ঘকাল পরিগণিত হয়। অবশ্য পাটলিপুত্রের সভাকক্ষটি কোনোমতেই প্রাসাদ নয় কেননা স্তম্ভগুলি কাঠের ছাদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কক্ষের পরিবেস্টনে কোনো প্রাচীর আবিস্কৃত হয়নি। পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদের সম্মেলন উপলক্ষ্যে অশোক এই সভাঘরটি নির্মাণ করেছিলেন এমন অনুমান করা যায়। এ কাজ তিনি করেও থাকতে পারেন কিন্তু এই তথাকথিত তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদ সম্পর্কেই এমন বিতর্কের ঝড় উঠেছে যে এমন অনুমানের চেয়ে এটি ‘প্রাসাদ’ হিসাবে মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

বুদ্ধগয়ার উত্তরে বারাবার পাহাড়ে অশোক তিনটি গুহা খনন করে সেগুলি অজীবিকদের দান করেছিলেন। এরই প্রতিবেশী নাগার্জুনি পর্বতে তাঁর এক উত্তরসূরী দশরথও ঐ একই কাজ করেন। অশোকের এই তিনটি গুহা অলংকরণ বর্জিত এবং কার্যাপযোগী। দুটিতে ধনুকাকৃতি ছাদ-বিশিষ্ট একটি সভাকক্ষ গোলগম্বুজযুক্ত একটি অন্তপ্রকোষ্ঠে শেষ হয়েছে। তৃতীয়টিতে অনুরূপ সভাকক্ষ রয়েছে কিন্তু অন্ত প্রকোষ্ঠটি নেই। প্রতিটি গুহার অভ্যন্তরভাগ সুন্দর পালিশ করা। দশরথের দান করা গুহাগুলি ধনুকাঙ্কৃতি ছাদ বিশিষ্ট একটি মাত্র কক্ষ। কিন্তু সমগ্র গুহাপাত্রে পালিশের কাজ রয়েছে। বারাবার পর্বতে লোমশ ঋষি নামক গুহাতে পালিশ করা গাত্র বিশিষ্ট একটি সভাকক্ষের প্রবেশপথে অবস্থিত দরজার উপরিভাগে হস্তী এবং স্তূপ খোদিত আছে। কিন্তু এর অন্ত প্রকোষ্ঠের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে (চিত্র ৩.৯)। সম্ভবত এই কারণেই

চিত্র ৩.৯ লোমশ ঋষি গুহা, বারাবার পর্বত
(সৌজন্য : আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে)

গুহাটি বৌদ্ধ সন্নাসীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে নির্মিত হলেও কোনো উৎসর্গপত্র গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ হয়নি। এছাড়া এটি অশোকের সময়কালে নির্মিত এমন অনুমান করা হয়। এইভাবে অশোক শুধুমাত্র যে ভারতবর্ষের স্থাপত্যে প্রস্তরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন তা নয়, তিনি পর্বত-খনিত গুহাও নির্মাণ করেছিলেন, ভারতীয় ঐতিহ্যে যার প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী।

অশোকের সময়কালের পূর্বে বস্তুত ভারতবর্ষে প্রস্তর ভাস্কর্য্যের কোনো সাক্ষর মেলে না। একমাত্র যদি সিন্ধু সভ্যতার কালে ফিরে যাই তাহলে প্রস্তর ভাস্কর্য্যের কয়েকটি ক্ষুদ্র সামগ্রী খুঁজে পাবো। অশোকের সূত্রে প্রস্তর ভাস্কর্য্যের কেবলমাত্র একটি নতুন ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাসে সংযোজিত হলো না, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রভূত দক্ষতা এবং বিশিষ্ট রুচিও আমরা অর্জন করলাম।

অশোক স্তম্ভের মস্তকেই আমাদের প্রধান অর্জিত বস্তুগুলি দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই যদিও মস্তকে স্থাপিত পশুমূর্তি আমাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে কিন্তু স্তম্ভপীঠের রিলিফের কাজগুলিও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। স্তম্ভশীর্ষে ত্রিমাত্রায় নিম্নলিখিত পশুগুলি মূর্তি হিসাবে স্থান পেয়েছে।

সিংহ (একক) : লৌরিয়া নন্দনগড়, রামপুরওয়া, কোলহুয়া, বংশী (কেবলমাত্র পিছনের পাদুটি সংরক্ষিত)

সিংহ (চারটি এক-ত্রে) : সাঁচি, সারনাথ
ষাঁড় : রামপুরওয়া (উৎকীর্ণ লিপিহীন স্তম্ভ)
হস্তী : সঙ্কিস
কুমীর : বেশনগর

স্তম্ভশীর্ষের বৃত্তকার পরিবেষ্টনে পাথর কুঁদে রিলিফের কাজে যে পশুমূর্তিগুলি সৃষ্ট, তাদের মধ্যে রয়েছে সিংহ, হস্তী, অশ্ব, ব্রাকট্রীয় উট, বৃষ এবং বন্য হংসী। পৌরাণিক পক্ষীরাজও একস্থানে দেখা গেছে (উদয়গিরিতে)।

শীর্ষভাগে স্থাপিত পশু ব্যতিরেকে, অশোকের অনুশাসনের নিকটে ধৌলীতে পাথর কুঁদে নির্মিত একটি পুর্ণাবয়ব হস্তীমূর্তি পাওয়া যায় (চিত্র ৩.১০ ক)। এছাড়া কলসীতে অশোকের প্রস্তরে উৎকীর্ণ অনুশাসনে একটি হস্তীর রূপরেখা চিহ্নিত আছে যার তলদেশে 'গাজাতামে' (সর্বশ্রেষ্ঠ পশু) শব্দটি খোদিত রয়েছে (চিত্র ৩.১০ খ)। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পশুর মূর্তিগুলি বাস্তবোচিত করে তোলার একটি স্থায়ী প্রচেষ্টা ছিল। এদের স্বাভাবিক দৈহিক মাপ এবং শরীরের উঁচুনীচু রেখাগুলির নিখুঁত অনুকরণেই এগুলি নির্মিত। নীহাররঞ্জন রায় কোলাহুয়া থেকে লৌরিয়া নন্দনগড় অবধি সিংহের আদর্শে নির্মিত মূর্তিগুলিতে প্রতিটি পর্যায়ে একটি স্থায়ী অগ্রগতি লক্ষ্য করেন। পরিশেষে সারনাথের খ্যাতনামা সিংহগুলির তুলনায় রামপুরওয়ার মূর্তিটি তিনি অধিক পছন্দ করেছেন। পাথরের বিশাল চাকাটি মূলত সারনাথের স্থাপিত

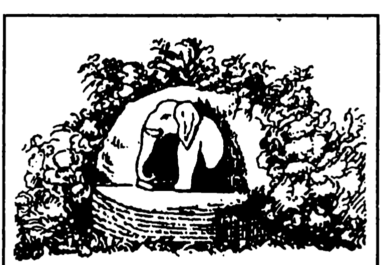

চিত্র ৩.১০ (ক) পাথর কেটে নির্মিত হাতি, ধৌলি (A Cunninghum অনুসরণে)

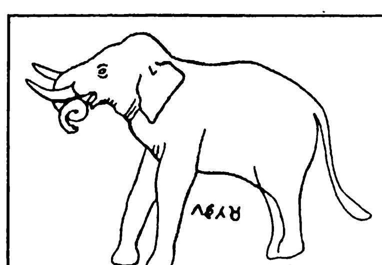

(খ) প্রস্তরে উৎকীর্ণ হাতি, কলসি (A Cunninghum অনুসরণে)

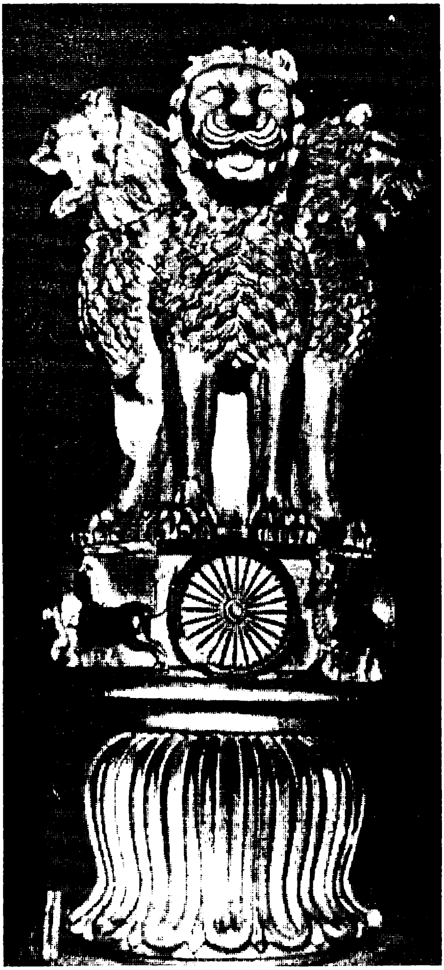

চিত্র ৩.১১ সিংহ-শীর্ষ, সারনাথ
(সৌজন্য : আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে)

ছিল। সেখানেই সেটি আবিষ্কৃত হয়। এর আয়তন-অনুপাতটি কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়ে থাকতে পারে (সাঁচী স্তম্ভের শীর্ষে এইরকম সিংহ-মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কোনো চক্র নেই)। অবশ্য সারণাথের সিংহগুলি এবং যে স্তম্ভপীঠে এগুলি স্থাপিত সেই ঘণ্টাকার পাদপীঠ তাদের বিশিষ্ট নকশা এবং নির্মাণের কারিগরী দক্ষতার কারণে সর্বোচ্চ প্রশংসার যোগ্য—জন মার্শাল বলছেন, প্রাচীন বিশ্বে এরকম কোনো বিশিষ্ট শিল্পকর্মে এদের কীর্তি অনতিক্রম্য চিত্র ৩.১১)।'

অন্যত্রও, নবতর বাস্তবতার পশ্চাতে সর্বদাই মানুষের বুদ্ধিমত্তা সক্রিয়া থাকে। ধৌলীর হস্তীটি নিশ্চিতরূপে অত্যন্ত অমসৃণ পাথর কুঁদে নির্মিত। কঠিন প্রস্তরের গভীর থেকে শক্তি এবং উদ্দীপনার স্থির চিত্র হিসাবে এটি প্রকাশিত। গৌণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে সমরূপ দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার স্পষ্ট সাক্ষর রয়েছে। পাদপীঠের বৃত্তে অলংকৃত ফুলের নকশার কাজটিও বিশিষ্ট নির্মাণ শৈলীর এক সুচারু প্রদর্শন; ঘণ্টাকার মস্তকশীর্ষের "নিম্নমুখী পদ্ম"-এর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

কিন্তু অশোকের ভাস্কর্যে আদর্শ বা রিলিফ হিসাবে একটিও যে মনুষ্যমূর্তি চোখে পড়ে না, যে বিষযটি যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। ভারহুত এবং সাঁচীর পরবর্তী ভাস্কর্যে মনুষ্যমূর্তির এমন উপচে পড়া প্রাচুর্য্যের বিচারে (অবশ্য বুদ্ধ তখনও সংকেত চিহ্নে উপস্থাপিত), অশোকের শিল্প অত্যন্ত সংযমী। সম্ভত প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের মূর্তি-

উপস্থাপন বিরোধী নীতির কারণেই এই সংযম, যদিও এর কোনো লিখিত প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। দিদারগঞ্জের (পাটনা) অসাধারণ যক্ষী (রথাকর্ত্রী উপদেবী) মূর্তিতে মৌর্যযুগের পালিশের কাজ এবং আবক্ষ মূর্তি নির্মাণে গ্রিক আদর্শ অনুপাতের সম্মিলিত উপস্থাপনা দৃষ্ট হয় (চিত্র ৩.১২)। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে নির্মিত এই মূর্তি মৌর্য শিল্প কী অর্জন করতে পারতো তারই একটি উদাহরণ। মনুষ্যশরীর ভাস্কর্যে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে প্রচলিত কোনো রীতি তাকে নিরস্ত করেনি।

চিত্র ৩.১২ যক্ষী, দিদারগঞ্জ, পাটনা, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক (সৌজন্য : পুরাতত্ত্ব বিভাগ, বিহার)

আসলে আর একটি অন্তর্গত বিষয় আছে যেটি একেবারেই রুচির সঙ্গে যুক্ত। অশোক স্তম্ভ সমূহের মসৃণ গাত্র উপর্যুপরি পালিশের কাজে অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু কোথাও কোনো অতিরিক্ত অলংকরণ নেই। একমাত্র স্তম্ভপীঠের শীর্ষদেশে অলংকরণ রয়েছে বটে তবে সেটিও অত্যন্ত সংযমী। এই বৈপরীত্যে সমস্ত স্তম্ভগুলিই অপূর্ব আভিজাত্য পেয়েছে। দীর্ঘদিনের বহুচর্চিত উচ্চ নান্দনিক বোধেই এমন নির্মাণ পরিকল্পনা সম্ভব। অর্থাৎ সম্ভবত অশোক যা কিছু স্পর্শ করেছেন তার প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য বিস্ময়ের উপাদান রেখে গেছেন।

কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনার নেপথ্যে নিঃসন্দেহে যে কিছু গ্রিক এবং আকামেনিদীয় শিলালিপি ছিল, আমাদের এই নির্ধারণ থেকে সরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভারতবর্ষে প্রস্তর এবং উজ্জ্বল পালিশের কোনো পূর্ব-দৃষ্টান্ত নেই। দুটিই আকামেনিদীয় মিনার-শিল্পের চিহ্ন বহন করে। আকমেনিদীয় স্তাপত্যে ঘণ্টাকৃতি স্তম্ভদেশেও এমন ঘণ্টাকৃতি মস্তকশীর্ষের আদর্শ দেখা যায়। মৌর্য পশুমূর্তির বাস্তবোচিত আকারে গ্রিক স্থাপত্যের নিশ্চিত সন্ধান মেলে। এরকম পাকানো দড়ি, পুঁতিকাঠির দীর্ঘ মালা এবং honey-suckle নকশার পূর্ব দৃষ্টান্ত আকমেনিদীয় এবং গ্রিক শিল্পকলায় বিদ্যমান। কিন্তু অ-ভারতীয় উৎসের প্রভাব এখানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হলেও মৌর্য শিল্পকলার সমগ্র উপস্থাপনার যে মুখ্য উদ্দেশ্য সেটি একেবারেই ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, পশুর এমন জীবন্ত এবং

মহানুভূতিশীল চিত্রণের মূল দায়ভাগ বৌদ্ধধর্মের। ভারতীয় কাঠ খোদাই শিল্পের প্রভাব হয়ত এই সব ভাস্করদের কাজে ছিল। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে উপাদানের ক্ষয়িষ্ণুতার কারণে এমন কোনো প্রাচীন শিল্পকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এইসব শিল্প সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি নি। সর্বোপরি ভাস্করদের নিজস্ব উদ্ভাবন যেমন, নিঃসঙ্গ দণ্ডায়মান মিনার, তাদের মসৃণ বেলনাকার অবয়ব, কোথাও ছেদ নেই, স্তম্ভদণ্ড, ভিত্তিমূল থেকে মস্তকশীর্ষে রূপান্তরিত ঘণ্টা সদৃশ আকার—এ সমস্তই রাজকীয় আভিজাত্য ও মর্যাদার বিভা বিচ্ছুরণে সহায়ক রূপে উপস্থাপিত।

রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যে শিল্প-শৈলীর নকশা রচিত হলো তারই ছায়ার আড়ালে সমকাজের একেবারে নীচতলায় আরেকটি শিল্প প্রচ্ছন্ন ছিল, আরো নিম্নমানের নানান পদ্ধতি তারা অনুসরণ করত। রামগড় পর্বতের যোগীমারা গুহায় বারানসী থেকে আগত একজন শিল্পী (লুপ দাখা) আমাদের জন্য যে উৎকীর্ণ লিপিটি রেখে গেছেন, সেটির কথাই উল্লেখ করতে চাইছি (উপরের ৩.৪)। আপাতদৃষ্টিতে ঐ গুহার মধ্যে আরো অনেক শিল্পকর্ম রয়েছে: মাথার ওপরে ছাদে দুরকমের লাল আর হলুদ, বাদামী, সবুজ ও কালো রঙে এককেন্দ্রিক বৃত্তের সারিতে আঁকা হয়েছে পাখী, মাছ, গাছ আর মানুষ। অন্য একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি রথ, হাতি এবং অনুচরের দলও ছিল। অবশ্য ১৮৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যে প্রত্নবিদ এগুলি দেখেছিলেন, এসব শিল্পকর্ম তাঁকে বিশেষ মুগ্ধ করতে পারে নি। তিনি বলেছিলেন অত্যন্ত স্থূল উপস্থাপনা আর নকশাও আড়ষ্ট।

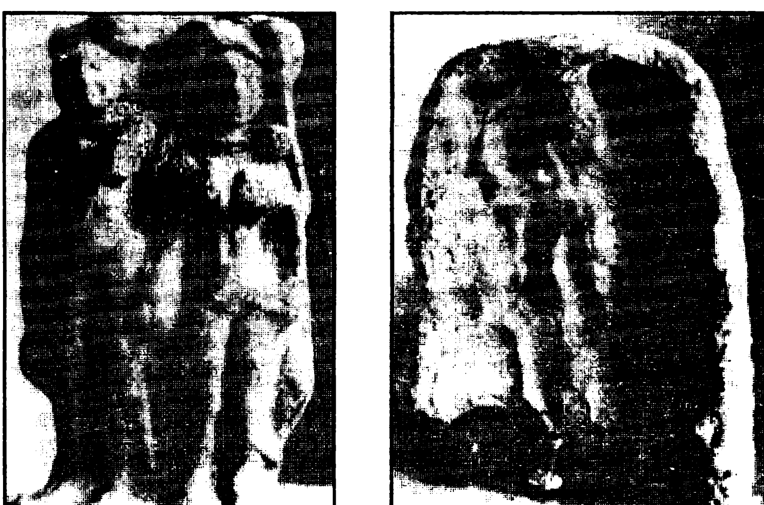

চিত্র ৩.১৩ পোড়ামাটির ফলকে যুগল মূর্তি এবং মূর্তিটি ঢালাই করার ছাঁচ, বীর স্তূপ, দ্বিতীয় স্তর, তক্ষশিলা (অনুকৃতি J. Marshall)

মৌর্য প্রত্নস্থানগুলিতে প্রভূত পরিমাণে পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে; বহু বিস্তৃত লোকশিল্পের উৎপন্ন সামগ্রী এইসব মূর্তি। পেশাদার মৃৎশিল্পীদের হাতেই সম্ভবত ঐসব স্ত্রীমূর্তি, পশু এবং খেলনার সামগ্রী তৈরি হয়েছিল। হয়ত নারীরাই গৃহভ্যন্তরে এইসব প্রস্তুত করতো। কয়েকটি স্ত্রীমূর্তি নিঃসন্দেহে হাতে-গড়া। কিন্তু কয়েকটি আবার পোড়ামাটির ছাঁচ থেকে ঢালাই করা। একটি ফলকে সংস্থাপিত নারীপুরুষের যুগল মূর্তির অনেকগুলি প্রতিলিপি থেকে এই তথ্যের সাক্ষ্য মেলে। একটি ছাঁচ সমেত এই ফলকগুলি বীর স্তূপের মৌর্য স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে (তক্ষশিলা) (চিত্র ৩.১৩ ক-খ)। প্রাচীনতর সময়কালে পাওয়া চীনামাটিতে প্রস্তুত অমার্জিত উপস্থাপনার সঙ্গে এই ফলকের বাস্তবতার বৈপরীত্য এক কথায় চমকপ্রদ। ছাঁচে ঢালাই করে আরো অধিক সংখ্যক সমরূপ মূর্তি নির্মাণে প্রতিভাত হয় যে, এদের প্রস্তুতকর্তার দক্ষতা আদৌ অপ্রশংসিত ছিল না।

সারণি ৩.২ কালপঞ্জী

খ্রীস্টপূর্ব

পাণিনি, বৈয়াকরণ	c. ৩৫০
অশোক কর্তৃক অখোদিত স্তম্ভ নির্মাণ কার্য শুরু	c. ২৬২-২৬০
তারিখযুক্ত প্রথম পর্বত-খনিত গুহা (অজীবিক, বারাবার পর্বত)	c. ২৫৮
কাত্যায়ন, বৈয়াকরণ	c. ২৫০
তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদ, পাটলিপুত্র	c. ২৪৪-২৩৪
পতঞ্জলি, বৈয়াকরণ	c. ১৫০

নিষ্কর্ষ সমূহ

নিষ্কর্ষ ৩.১

সপ্তবর্ণ

মেগাস্থিনিস: দিওদোরাসের সহজতম শব্দান্তর, II ৪০-৪১

ভারতবর্ষের জনসমষ্টিকে সাতটি বর্ণে (বিশুদ্ধ) বিভক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে প্রথমটি দার্শনিকদের (ফিলোজেফই) সম্মিলিত গোষ্ঠী। এই প্রথম বর্ণটি জনসংখ্যার বিচারে অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা ন্যূন হলেও, মর্যাদার নিরিখে শ্রেষ্ঠতম। কেনন' জনসাধারণের প্রদেয় সমস্ত কর থেকে দার্শনিকদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং এরা কোন অবস্থাতেই অন্য কারোর প্রভু বা ভৃত্য ছিল না। অবশ্য সাধারণ জনজীবনে দেবতার নামে অর্ঘ্য উৎসর্গ করা বা মৃতের অন্তেষ্ঠিক্রিয়া সম্পাদনের কাজে কোন

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিযুক্ত করতে পারতো। এইসব পরিষেবা সম্পাদনের বিনিময়ে তারা মূল্যবান উপহার এবং নানান সুযোগসুবিধা লাভ করত। ভারতবর্ষের মানুষের ক্ষেত্রে তারা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হিতসাধনের কর্তব্য সমাধা করত। বৎসরের প্রারম্ভেই সাধারণ মানুষ তাদের কাছে একত্রিত হত এবং সেই সম্মিলিত জনতার সামনে, খরা এবং বর্ষার মরসুম, সেইসঙ্গে অনুকূল বাতাস এবং রোগসমূহ ইত্যাদি নানান বিষয়ে ভবিষ্যদবাণী করে তারা শ্রোতাদের বিশেষ উপকৃত করত। এইভাবে সাধারণ জনতা এবং নৃপতি উভয়েই কী ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে পূর্বেই অবগত হওয়ায় আসন্ন অভাবের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারতো এবং প্রয়োজনের সময়ে এইসব উপদেশ প্রভূত সাহায্য করায় তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখে কখনোই অপ্রস্তুত হতো না। যেসমস্ত দার্শনিক এ জাতীয় ভবিষ্যত গণনায় ভুল করতো, তাদের কোন শাস্তি দেওয়া হতো না, শুধুমাত্র তাদের বদনাম হতো। আর এরপর থেকে তারা পরবর্তী জীবনে নীরব হয়ে থাকতো।

দ্বিতীয় বর্ণের সদস্যরা সবাই কৃষক (গেওরাগোই), যারা অন্যান্য বর্ণের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি। তদুপরি যুদ্ধ এবং অন্যান্য গণ-পরিষেবার কাজ থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার ফলে, তারা সম্পূর্ণভাবে চাষের কাজেই মনোনিবেশ করতো। কোন শত্রুও ক্ষেতে কর্মরত কৃষকের কোন ক্ষতি করতো না, কেননা এ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের জনসমষ্টির হিতকারীরূপে গণ্য করা হতো, সমস্ত আঘাত থেকে তাদের রক্ষা করা হতো। এইভাবে জমি কোনকারণেই ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় সর্বদাই প্রভুত ফসল উৎপাদন করতো এবং জীবনকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ বাসিন্দাদের যোগান দিত। কৃষককুল নিজেরাও স্ত্রী-পুত্র পরিজন সহ গ্রামেই জীবন কাটাত এবং শহরকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতো। সমগ্র ভারতবর্ষ যেহেতু ছিল নৃপতির সম্পত্তি সেকারণে তারা রাজাকে ভূমি-রাজস্ব দিত। কোন ব্যক্তিমানুষের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার অনুমতি ছিল না। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ খাজনা হিসাবে রাজ-তহবিলে প্রদেয় ছিল।

গোপালক (বৌকোলই) ও মেষপালক (পৈমেনেস) এবং তৎসহ সাধারণভাবে সমগ্র পশুপালক গোষ্ঠী, গ্রাম বা শহরে নয়, যারা বসবাস করতো তাঁবুতে, এদের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়েছিল সপ্তবর্ণের তৃতীয় বর্ণটি। শিকার করে বা ফাঁদ পেতে তারা সমস্ত ক্ষতিকর পাখির এবং বন্যপশুর থেকে গ্রামাঞ্চলকে মুক্ত করেছিল। অত্যন্ত আগ্রহে এবং পরিশ্রমে তারা, তাদের পরিভ্রমণকালে, ভারতবর্ষকে সমস্ত ক্ষতিকর প্রাণীর কবল থেকে মুক্ত করেছিল। এইসমস্ত বন্য পশুপাখিরা কৃষকদের রোপণ-করা বীজ নষ্ট করত এবং ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

চতুর্থ বর্ণে ছিল হস্তশিল্পীর দল (তেচুইটাই)। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিল অস্ত্রশিল্পী, এবং অন্যেরা কৃষকদের জন্য নানান যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করত। এছাড়া অন্যান্য

মানুষজনের বিভিন্ন নামের নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রীও প্রস্তুত করত এরা। কর প্রদানের ক্ষেত্রে এদের ছাড় দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু রাজ-তহবিল থেকে এদের ভরণপোষণের অর্থ দেওয়া হতো।

পঞ্চম বর্ণটি হল সামরিক কর্মচারী (পোলেমিস্টাই)। এরা ছিল সুসংগঠিত এবং যুদ্ধে পারদর্শী। সংখ্যার বিচারে বর্ণশ্রেণীতে এদের স্থান দ্বিতীয় এবং শান্তির সময়কালে এরা আমোদ প্রমোদে অবসর বিনোদন করতো। এই সমগ্র বাহিনী যথা, অস্ত্রধারী মানুষজন, যুদ্ধের ঘোড়া, যুদ্ধের হাতী ইত্যাদি— সকলেরই ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতেন স্বয়ং রাজা।

তত্ত্বাবধায়কেরা ছিল ষষ্ঠ বর্ণের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে কী ঘটছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও তত্ত্বাবধান করা এবং এসমস্ত বিষয়ে রাজাকে অবহিত করাই ছিল এদের কাজ। যেখানে রাজা নেই, সেখানে স্থানীয় প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এরা তাদের প্রতিবেদন পেশ করতো।

পরামর্শদাতা এবং শাসক বিচারপতিদের মধ্যে যারা সাধারণ জনতার বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করতো, তারা ছিল সপ্তম বর্ণের অন্তর্গত। সংখ্যার বিচারে এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম, কিন্তু এদের জ্ঞান এবং উচ্চ বংশমর্যাদার কারণে সমাজে এরা অত্যন্ত সমাদৃত ছিল। কেননা এদের মধ্যে থেকেই রাজার খাস পরামর্শদাতা নির্বাচন করা হতো। এছাড়া রাজ্য প্রশাসক ও বিচারপতিগণ যারা বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করত, তাদেরও এই শ্রেণী থেকেই নিযুক্ত করা হতো। সেনাধ্যক্ষ এবং প্রধান প্রশাসকেরাও সচরাচর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সেই সময়কালের ভারতবর্ষীয় সমাজ এমনই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাজিত ছিল। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নিজস্ব বর্ণের বাইরে বিবাহ করা কিংবা আপন বর্ণের পেশা ছাড়া অন্য কোন পেশায় যুক্ত হওয়া বা অন্য কোন নামে পরিচিত হওয়ার অনুমতি ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন সৈন্য কখনই কৃষক হতে পারত না; অথবা হস্তশিল্পী হতে পারতো না দার্শনিক।

(J.W. Maclindle কৃত অনুবাদ, সামান্য পরিমার্জিত)

নিষ্কর্ষ ৩.২

জাত ধর্ম

অর্থশাস্ত্র ১.৩

(৪) তিন বেদে যে নিয়মনীতি (ধর্ম) নির্দিষ্ট আছে তা মঙ্গলজনক, কারণ সেগুলোতে চতুঃবর্ণ ও জীবন-বিভাগের (আশ্রম) কর্তব্যগুলি (স্বধর্ম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৫) ব্রাহ্মণের নিজের ধর্মের অন্তর্গত হচ্ছে : অধ্যয়ন করা, যজ্ঞানুষ্ঠান করা, নিজের জন্য এবং যজমানের জন্য, দান করা এবং দানগ্রহণ করা।

(৬) ক্ষত্রিয়দের জন্য: অধ্যয়ন, নিজের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা, দান দেওয়া, অস্ত্রধারণ করা ও প্রাণীদের রক্ষা করা।

(৭) বৈশ্যদের জন্য: অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, কৃষিকার্য করা, পশুচারণ ও বাণিজ্য।

(৮) শূদ্রদের জন্য: দ্বিজদিগের মান্য করা, আজ্ঞাপালন করা, কারিগর এবং অভিনেতার (কুরুকুশীলবকর্ম) কাজ করা।

(৯) গৃহস্থদের জন্য : নিজের (জাতি) ধর্ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা; একই জাতের মধ্যে বিবাহ করে পরিবার গঠন করা, অবশ্যই এক গোত্রের মধ্যে নয়; স্ত্রী রজঃকালে সহবাস না করা; দেবতাদের, পূর্বপুরুষদের এবং অতিথিদের পূজা করা, ভৃত্যদের উপহার দেওয়া, অপরের খাওয়ার পর অন্নগ্রহণ করা (শেষাভোজন)।

(১৩) সকলের জন্য : যন্ত্রণা প্রদান না করা, সৎ, দৃঢ়চেতা, বিদ্বেষমুক্ত, পরদুঃখ কাতর ও ধৈর্যশীল হওয়া।

(১৪) আপন ধর্ম স্বর্গে নিয়ে যায় এবং অসীম আশীর্বাদ দান করে।

(Kangle-র অনুবাদ, সংশোধিত)

নিষ্কর্ষ ৩.৩
বুদ্ধের জন্মস্থান তীর্থযাত্রা

অশোকের রুম্মিনদির স্তম্ভ-অনুশাসন

রাজা দেবনামপিয় পিয়দশী রাজকীয় বিংশ বৎসরে শাক্যমুনি বুদ্ধ এখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং এসেছিলেন এবং পূজা নিবেদন করেছিলেন। তিনি একটি বৃহৎ প্রস্তর প্রাচীর নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং (এই) স্তম্ভটি স্থাপন করিয়েছিলেন; তিনি লুম্বিনী গ্রামকে করমুক্ত (উবলিকে) করেছিলেন এবং (কেবল উৎপাদিত দ্রব্যের) এক-অষ্টমাংশ দেবার অধিকারী করেছিলেন।

টীকা ৩.১
অশোকের সময়কালের প্রাকৃতের বাচনভঙ্গি

অশোকের অনুশাসনগুলির বিষয়বস্তু এক হলেও বিস্তৃত ভৌগোলিক বিভাজনের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হওয়ায় তাদের ভাষায় নানান বৈচিত্র দেখা যায় এবং আমাদের কাছে তারা প্রাকৃতের নানান আঞ্চলিক বাচনভঙ্গির সাক্ষ্য উপস্থাপিত করে। E. Hultzch, R. Basak, P.C. Sircar এবং অন্যান্যদের করা সুবিধাজনকভাবে পঙ্ক্তিকৃত পাঠের তুলনামুলক আলোচনা থেকে পাঠগুলির ব্যাকরণগত এবং অন্যান্য বৈচিত্র নির্দেশ এবং দৃশ্যমান ঐক্যমানতার স্থান নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে সারাক্ষণ এই যে ভাষা (অশোকের সময়কালের প্রাকৃত) নিয়ে আমরা কাজ

করেছি, যদিও সেখানে একই বাক্য গঠন ও একই শব্দসম্ভার (কয়েকটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও) আছে, তবুও সেখানে বানান এবং ব্যাকরণগত নিয়মের পার্থক্য বর্তমান। তাই যখন আমরা আঞ্চলিক বৈচিত্রগুলো চিহ্নিত করি তখন আঞ্চলিক ভাষা নয় আঞ্চলিক বাচনভঙ্গীর কথাই বলি। এছাড়া সকল বাচনভঙ্গীর মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় তারা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এড়িয়ে চলতে চায় (বর্তমানে ব্যাপকভাবে সংস্কৃত), যদিও ক এবং খ বাচনভঙ্গীতে এটা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় এবং 'গ' ও 'ঘ' বাচনবঙ্গীতে কম।

'ক' বাচনভঙ্গী যাকে অধিকাংশ পণ্ডিতরা বলেন 'মাগধি', সেটি হচ্ছে সরকারি মান্য বাচনভঙ্গী। মূল অনুশাসনগুলো সম্ভবত ঐ ভাষায় পাটলিপুত্র থেকে প্রচারিত হত। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং উড়িষ্যায় প্রাপ্ত সমস্ত অনুশাসনেই এই বাচনভঙ্গীতে পাওয়া গেছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রাপ্ত স্তম্ভ অনুশাসন I-VI-এর পাঠ এত অভিন্ন এবং তাদের বানানে এত প্রকৃতিগত মিল যে আমরা ধরে নিতে পারি, এই বাচনভঙ্গীতে একইরকম বানান ও ব্যাকরণরীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্তত সরকারী স্তরে। 'ক' বাচনভঙ্গীর কয়েকটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) যুক্ত ব্যঞ্জন (যেমন ক্ষ, স্ল, প্র, ম্র, স্ট) কদাচিৎ দেখা যায়। হয় তা উহ্য থাকে (যেমন প্রজা-র বদলে পজা) বা শ্বাসাঘাত সহ হসন্তধ্বনি উচ্চারণে (যেমন ক্ষ-এর বদলে খ)। (২) যদিও দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হয়েছে তবে তার ঝোঁক সংক্ষিপ্ত করার দিকে। যেমন সংস্কৃতের রাজা হচ্ছে লাজা। (৩) র ধ্বনি আদৌ ব্যবহৃত হয়নি, সারাক্ষণ তার বদলে বসেছে ল, যেমন উপরে উল্লিখিত লাজা-তে। (৪) একটি স-কার ধ্বনি কেবল (সাধারণত স) সংস্কৃত শব্দের স,শ এবং ষ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (৫) নাসিক্যধ্বনির মধ্যে কেবল 'ন' ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কৃতের 'ণ' এবং 'ঢ়' এর পরিবর্তে। (৬) 'হ' ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়, যেমন সংস্কৃতে 'ইবম' এর বদলে 'হেবম' ব্যবহার করা। (৭) পুংলিঙ্গ এবং ক্লিবলিঙ্গ সূচক নামবাচক একবচনের শব্দরূপে -এ হয়ে যায়-ই।

বাচনভঙ্গীর যে প্রচলিত রূপ উপরে বর্ণিত হয়েছে সমস্ত স্তম্ভ— অনুশাসন ও অন্যান্য স্তম্ভ-লিপিতে (সাঁচির ধর্মীয় উপদল সংক্রান্ত অনুশাসন ব্যতিরেকে), বাহাপুর (দিল্লী), বৈরাট, আহরৌরা এবং সাসারামের বৈরাট প্রস্তর অনুশাসন-এ তা অনুসৃত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে কলসির প্রস্তর অনুশাসনে ('ক' বাচনভঙ্গী) এবং উড়িষ্যার ধৌলি আর জৌগড়ার পৃথক প্রস্তর অনুশাসনে (ক বাচনভঙ্গী) সামান্য ছোটখাটো কিছু বদল দেখা যায়। ওদিকে এরাগুডি এবং সান্নথির লেখায় পুরোপুরি মান্য 'ক' বাচনভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে। যদিও শিলালিপিগুলি দক্ষিণ অন্ধ্র ও উত্তর কর্ণাটকে অবস্থিত। মহাস্থান, পিপরাওয়া, সোহগৌরা এবং যোগীমারা শিলালিপিগুলি 'ক' বাচনভঙ্গীকে মেনে নেয়।

অশোকের অনুশাসনে 'খ' বাচনভঙ্গী (যাকে বলা হয় 'অবন্তি' বাচনভঙ্গী) পাওয়া গেছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। প্রচলিতরূপে এটা 'ক' বাচনভঙ্গীর অনুরূপ, কেবল র এবং ল ব্যবহার করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি সংস্কৃতের অনুরূপ, যদিও ভুলকরে সোপরোতে ল-এর বদলে র বসানো হয়েছে (যেমন ফলা-র বদলে ফরা)। মান্য 'খ' বাচনভঙ্গি পাওয়া যায় ১ম মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের রূপনাথ, গুজ্জর এবং পাঙ্গুরারিয়ার সংস্করণে, প্রস্তর অনুশাসনের সোপারা সংস্করণে এবং সাঁচিস্তম্ভের শিলালিপিতে। আরো দক্ষিণে কর্ণাটকের সান্নথির পৃথক প্রস্তর অনুশাসন এবং এরাগুডির প্রস্তর অনুশাসন 'খ' বাচনভঙ্গীতে রচিত। কিন্তু কর্ণাটকের অন্যান্য মাইনর প্রস্তর অনুশাসনের বিভিন্ন সংস্করণে কদাচিৎ ষ এবং ণ-এর ব্যবহার দেখা যায়। তাই এগুলোকে 'খ'-এর উপ-বাগধারা হিসাবে ধরা হয়।

'গ' বাচনভঙ্গি বা পশ্চিমী বাচনভঙ্গী প্রস্তর অনুশাসনের গিরনার (গুজরাট) সংস্করণে। এটা 'খ' বাচনভঙ্গির অনুরূপ। নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। যেমন এখানে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ প্রায়ই দেখা যায়। তাছাড়া লেখা হয়েছে প্রিয়দশী, পিয়দশী নয়। সংস্কৃতের স্ম এবং ক্ষ এখানে লেখা হয়েছে চ্ছা, কখনো কেবল খ। রাজা-তে দীর্ঘস্বর ব্যবহার করা হয়েছে। ক এবং খ এর মতো হেবম-এর বদলে লেখা হয়েছে ইবম। শেষোক্ত কারক -ই র বদলে ব্যবহার হয়েছে -ও/-আম। এর ফলে কয়েকটি শব্দও বদলে গেছে : খ-বাচনভঙ্গির 'রাজিনে', গিরনারে হয়েছে 'রানো'।

অশোকের খরোষ্ঠী ভাষায় লেখা দুটি অনুশাসন হল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানসেহরা এবং শাহবাজগরহি-তে প্রাপ্ত চতুর্দশ প্রস্তর অনুশাসন। এইগুলো 'ওয়া' বাচনভঙ্গি যা গান্ধারির প্রাথমিকরূপ বলে মনে করা হয়। পরেরগুলোর মধ্যে শাহবাজগরহি সংস্করণটি মনে হয় মানসেহরা সংস্করণ অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধিমূলক। এই বাচনভঙ্গিতে কোন দীর্ঘ স্বর নেই, স্বরধ্বনি ঐ এবং ঔ নেই, যদিও আরমীয় ভাষায় পাঠক এই স্বরধ্বনিগুলো দরকার মত উচ্চারণ করতে চায়। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 'গ' বাচনভঙ্গির চেয়ে এখন অনেক বেশী এবং তা সংস্কৃতের কাছাকাছি যাচ্ছে। এই বাচনভঙ্গিতে তাই ধর্ম আছে ধম্ম নেই (তুলনীয় সংস্কৃত ধর্ম) এবং প্রিয়দ্রশী ('ক' এবং 'খ' বাচনভঙ্গির পিয়দশি-র তুলনায় সংস্কৃতের প্রিয়দর্শিন এর কাছাকাছি)। সেখানে প্রায়ই র, ণ, ঢ়, শ এবং ষ এর ব্যবহার দেখা যায় এবং 'গ' বাচনভঙ্গির মত পূর্ণ শ্বাসাঘাতসহ 'হ' ধ্বনি উচ্চারণের প্রবণতা নেই (সর্বত্র ইভাম দেখা যায়)। 'গ' বাচনভঙ্গির মত কারক -ই-র বদলে এখানে যথাক্রমে-ও/-আম ব্যবহৃত হয়েছে। (ক এবং খ বাচনভঙ্গির মত সবসময় -ই নয়)।

৩.৪ অধ্যায়ে আলোচিত অশোকের সময়কালের প্রাকৃত এবং তার বাচনভঙ্গি বুঝতে এই আলোচনা কাজে লাগবে।

টীকা ৩.২
গ্রন্থপঞ্জি

এই অধ্যায়ের জন্যেও প্রয়োজনীয় প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি। মৌর্যযুগের মনুষ্যকৃত শিল্পকর্ম সম্পর্কে John Marshall-এর 'Taxila : An Ilustrated Account of Archaeological Excavations, 3 volumes' (কেম্ব্রিজ ১৯৫১) এই প্রসঙ্গের শ্রেষ্ঠ কাজ। প্রচুর পরিমাণে মৌর্যযুগের (N.B. PW Culture) শিল্পকর্মের বর্ণনা ও চিত্র পাওয়া যাবে R.C. Gaur-এর 'Excavations at Atranjikhera' (দিল্লী ১৯৮৩)-য়; G.R. Sharma-র 'The Excavations at Kausambi, 1957-59" (এলাহাবাদ ১৯৬০) গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ অনেককিছু আছে, যদিও লেখকের দেওয়া কালপঞ্জী বিতর্ক জাগায়।

বর্ণ বা জাত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : Ram Sharan Sharma-র 'Sudras in Ancient India' (দিল্লী, ১৯৫৮) এবং Suvira Jaiswal-এর 'Caste : Origin, Function and Dimensions of change' (নতুন দিল্লী ১৯৯৮)। দাসত্ব সম্পর্কে দেখতে হবে Dev Raj Chanana-র Slavery in Ancient India (নতুন দিল্লী ১৯৬০)

মৌর্য যুগের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গিকতা আছে V.S. Agrawala-র India as known to Panini (লক্ষ্ণৌ ১৯৫৩)। পাণিনির Ashtadhyaya পুরাতন সংস্করণ ও অনুবাদ করেছেন Srisa Chandra Vasu। ১৮৯১-১৮৯৩ সালে প্রকাশিত প্রস্থটি পরে নতুনভাবে দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে (দিল্লী ১৯৯০)।

বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে অশোক সম্পর্কে যেসব উল্লেখ করা হয়েছে টীকা ২.২ তে বস্তুত তার সবটাই আছে Richard F. Gombrich-এর 'Theravāda Buddhism' (লন্ডন ১৯৮৮ পেপারব্যাকে পাওয়া যায়) গ্রন্থে। অজীবিকদের সম্পর্কে মান্য কাজ : A.L. Basham-এর 'History and Doctrines of the Ajivikas' (লন্ডন ১৯৫১; সংশ্লিষ্ট ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী) বৈষ্ণববাদ সম্পর্কে দেখতে হবে Suvira Jaiswal-এর 'The Origin and Development of Vaisnavism.' (দিল্লী ১৯৬৭)।

Maurice Winternitz-এর 'History of Indian Literature Vol.' (কলকাতা ১৯২৭)-তে রয়েছে বৈদিক পাঠসমূহ, আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহাকাব্য এবং পুরাণগুলি, আর Vol II-তে আছে বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্য। পাণিনি ও পতঞ্জলির মধ্যবর্তী কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের উন্নয়ন Winternifz-এর Vol III-তে এবং Hartmut Scharfe-এর 'Grammatical Literature' গ্রন্থে। পাণিনি থেকে শুরু করে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একটি বিশ্বাসযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ

হচ্ছে A Berriedale Keith-এর 'A History of Sanskrit Literature' (অক্সফোর্ড ১৯২০)

শিল্প সম্পর্কে গভীর নিরীক্ষণ পাওয়া যাবে Niharranjan Ray-এর 'Maurya and Post-Maurya Art' গ্রন্থে। S.P. Gupta-র 'The Roots of Indian Art' গ্রন্থে মৌর্যশিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিস্তৃত তথ্য সংকলন করা হয়েছে। সাঁচীর স্থাপত্য সম্পর্কে জানতে হলে দেখতে হবে Alfred Foucher এবং N.G. Majumdar এর The Monuments of Sanchi, তিন খণ্ড (দিল্লী ১৯৪০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮২)।